হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

২৪

সম্পাদনা

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ॥ কলকাতা সাত

সূচিপত্র

মানুষের গড়া দৈত্য

শ্রীযুক্ত দেবকুমার সেন
কল্যাণবরেষু

আগের কথা

'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' হচ্ছে একখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজি উপন্যাস এবং আধুনিক চলচ্চিত্রের দৌলতে তা অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে!

এ খানি রচনা করেছেন মেরি ওলসট্রোনক্রাফট শেলি। তিনি গত শতাব্দীর অমর কবি শেলির সহধর্মিনী।

মেরি তাঁর স্বামী শেলি ও কবি লর্ড বাইরনের সঙ্গে তখন চিরতুষারময় পার্বত্য প্রদেশে বাস করেছিলেন। বাইরে অন্ধকারকে সমাচ্ছন্ন করে ঝরছে আর ঝরছে তুষার বাদল, কেঁদে কেঁদে বইছে তুষার ঝটিকা, চারিদিকে বোবারাত্রির নির্জনতা। এই ভূতুড়ে আবহ সকলকেই করলে অভিভূত। বাইরন, শেলি ও মেরি স্থির করলেন, কোনও অবাস্তব ঘটনা নিয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি কাহিনি রচনা করবেন। সেই সংকল্প থেকেই 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'র জন্ম। এবং এই একখানি মাত্র পুস্তকই মেরির নামকে আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। বাইরন ও শেলির সংকল্প কার্যে পরিণত হয়নি।

বাঙালি পাঠকদের উপযোগী করবার জন্যে আমি ঘটনা, স্থান ও পাত্র-পাত্রীদের নাম পরিবর্তিত করতে বাধ্য হয়েছি এবং সর্বত্রই মূল রচনার অনুসরণ করতে পারিনি।

ইতি—লেখক

২৩০/১, আপার চিৎপুর রোড
বাগবাজার, কলিকাতা

॥ প্রথম ॥

সুন্দরবাবুর কথা

তুষার, তুষার, তুষার! ওপরে অনন্ত নীলিমার উচ্ছ্বাস, নীচে অনন্ত শুভ্রতার উৎসব! আকাশছোঁয়া শিখরের পর শিখরের নৈবেদ্য সাজিয়ে বিরাট হিমাচল নিশ্চল-নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে যোগাসনে, কোনও পরম দেবতার উপাসনায়। এই আশ্চর্য তুষার-সমারোহের একমাত্র দর্শক হচ্ছি আমি। আমার সঙ্গীরা এখনও পাহাড়ের অনেক নীচে পড়ে আছে।

আমি বাঙালি। কিন্তু 'ঘরমুখো বাঙালি' বলে প্রবাদে যাদের কুখ্যাতি আছে, আমি তাদের দলের লোক নই। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদের মতন আমি বাঙালি হয়েও ঘরছাড়া পথের পথিক।

ছেলেবেলা থেকেই আমার আদর্শ হচ্ছেন ডা. লিভিংস্টোন, ন্যানসেন, রবার্ট পিয়ারি ও কাপ্তেন স্কট প্রভৃতি দুঃসাহসী মহাজনরা—নতুন-নতুন বিপদসঙ্কুল অজানা দেশে নতুন-নতুন অভিযানে বেরিয়ে যাঁরা অকাতরে প্রাণদান করেছেন বা বিপদজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন। সুখশয্যাশায়ী বিলাসীকে আমি ঘৃণা করি, আমার শ্রদ্ধা জাগে কণ্টকশয্যাশায়ী হঠযোগীকে দেখলে।

পিতামাতার পরলোক গমনের পর প্রথম যখন স্বাধীন হলুম তখনই স্থির করলুম, এতদিন ধরে যে দিবাস্বপ্নের সাধনা করে আসছি সর্বাগ্রে তাকেই সফল করে তুলব।

পৈত্রিক সম্পত্তির অভাব ছিল না। মস্ত জমিদারের ছেলে আমি, আমাদের বংশে কেউ গতরে খেটে পেটের ভাত জুটিয়েছেন বলে শুনিনি। আমার কাছে টাকা হচ্ছে সবচেয়ে সুলভ জিনিস।

পৃথিবীর সব ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষার দরকার। প্রথমভাগ বর্ণ পরিচয়ের পরই আরম্ভ হতে পারে দ্বিতীয় ভাগের পাঠ। 'শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্'। অতএব স্থির করলুম, সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে কোনও দূর দুর্গম দেশে যাত্রা করবার আগে ভারতবর্ষেরই কোনো বন্ধুর প্রদেশের যাত্রী হয়ে নিজের শরীর ও মনকে তৈরি করে তুলতে হবে।

ভাবতে ভাবতে প্রথমেই মনে পড়ল হিমালয়কে। হিমালয় হচ্ছে বাংলার প্রতিবেশী এবং বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট মুকুট। কিন্তু আমরা তাকে হাতের কাছে পেলেও সে সহজলভ্য নয়। যে-দেশের লোক আকাশ ও পাতাল এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে জয় করেছে, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর আজও আছে তাদের নাগালের বাইরে।

প্রথমেই হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরের দিকেও দৃষ্টিপাত করতে চাই না। আপাতত মানস সরোবর পার হয়ে তিব্বতের দিকে এগিয়ে নিজের সামর্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

যাত্রার তোড়জোড় আরম্ভ করলুম।

অল্পবয়সে পিতার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছি, কাজেই 'বন্ধু' নামে খ্যাত অনেকগুলি লোক আমার চারপাশে এসে জড়ো হয়েছিল। হাতের শিকার ফসকে যায় দেখে তারা সচমকে বললে, 'সর্বনাশ! তুমি পাগল হয়েছ নাকি?'

শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়েরা নানাবিধ উপদেশ দিয়ে বললেন, 'ডানপিটের মরণ গাছের আগায়। অমন কাজও কোরো না।'

এখনও বিবাহ করিনি। কাজেই অন্তঃপুরের অশ্রুনদীতে আর সাঁতার কাটতে হল না।

কারুর মানা না মেনে বেরিয়ে পড়লুম।

মানস সরোবর পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছি।

এ চলার আনন্দ যে কত গভীর, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কোনও কবিও আজ পর্যন্ত এ আনন্দ ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারেননি। এ আনন্দ প্রকাশ করবার নয়, উপলব্ধির জিনিস। এ আনন্দের মর্যাদা বুঝেছিলেন বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য ও চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষরা, সংকীর্ণ ঘর তাই তাঁদের বন্দি করে রাখতে পারেনি।

আমি বুদ্ধদেবও নই, চৈতন্যও নই। কিন্তু এ আনন্দ আমাকেও মাতিয়ে তুললে।

॥ দ্বিতীয় ॥

আশ্চর্য দৃশ্য

বরফের পর বরফের পাহাড়!

কিন্তু এদের পাহাড় না বলে বলা উচিত প্রকৃতির তুষারে গড়া দুর্গ-নগরী! কোথাও যেন সুদূর বিস্তৃত প্রাকার, কোথাও যেন সুগভীর পরিখা, কোথাও যেন মেঘচুম্বী গম্বুজওয়ালা প্রাসাদ, কোথাও যেন মন্দির-চূড়া বা প্রশস্ত অঙ্গন! সমস্তই করছে সাদা ধবধব। যেখানে ছায়া পড়েছে সেখানেও কালিমা নেই। যেখানে সূর্যের আলো পড়েছে সেখানে চোখ অন্ধ করে জ্বলছে যেন পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ!

দৃষ্টিসীমা ও আকাশপ্রান্ত জুড়ে বিপুল এই দুর্গ-নগরী, কিন্তু সে যেন মৃতের শহর, তার কোথাও জীবনের কোনও লক্ষণই চোখে পড়ে না। আমি যেন এক পৌরাণিক ও পরিত্যক্ত দানব-রাজধানীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—একদা এর সিংহদ্বার খুলেই যেন অসুর-সৈন্যদল হিমালয় কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসত দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গপুরীর দিকে যাত্রা করবার জন্যে।

চিন্তার কোনও মূর্তি আছে কি না জানি না, কিন্তু দানবের কথা মনে হতেই চোখের সুমুখে জাগল এক আশ্চর্য ও কল্পনাতীত দৃশ্য!

আকাশ-প্রান্তে আঁকা সেই বিরাট দুর্গ-নগরীর তলায় রয়েছে প্রকাণ্ড এক তুষার প্রান্তর। তার ধু ধু শূন্যতার মধ্যে শুভ্রতা ছাড়া আর কোনও রঙেরই খেলা নেই।

আচম্বিতে সেই শুভ্রতার এক কোণে ফুটে উঠল যেন একটা কালির বিন্দু! সে বিন্দু হয়তো আমার চোখেই পড়ত না। কিন্তু বিন্দুটা ছিল চলন্ত!

নিশ্চলতার রাজ্যে এই সচল জীবনের লক্ষণ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সবিস্ময়ে দূরবিনটা তুলে নিয়ে যা দেখলুম, তাতে আরও বেড়ে উঠল আমার বিস্ময়।

একজন মানুষ বরফের ওপর দিয়ে হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু না—না, সেটা কি মানুষের মূর্তি? তার আশেপাশে গাছগাছড়া থাকলে তুলনায় মূর্তিটার উচ্চতা সম্বন্ধে কতকটা ঠিক ধারণা করতে পারতুম, কিন্তু সেই অসমোচ্চ তুষার-মরুক্ষেত্রের কোথাও সামান্য ঝোপঝাড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

তবে এইটুকু আন্দাজ করতে পারলুম, মূর্তিটা মোটেই সাধারণ মানুষের মতন নয়—এমনকি মাথায় সে যে-কোনও অসাধারণ দীর্ঘ মানুষেরও চেয়ে ঢের উঁচু! একালে অতিকায় দৈত্যদানবের অস্তিত্ব কল্পনা করাও অসম্ভব, কিন্তু আকারে সে হয়তো উপকথায় কথিত দৈত্য, দানব বা রাক্ষসের মতোই ভয়াবহ!

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, মূর্তিটা হঠাৎ একটা বৃহৎ তুষার-স্তূপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কী দেখলুম? চোখের ভ্রম, অপচ্ছায়া? না সত্যিকার কোনও মনুষ্যমূর্তি? কিন্তু এই চিরতুষারের মৃত্যু-রাজ্যে কোনও মানুষ যে একাকী ভ্রমণ করতে পারে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর বলে মনে হল না।

এমন সময়ে নীচে থেকে আমার সঙ্গী মালবাহী লোকজনদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। তারা চিৎকার করে আমাকে ডাকছে।

তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে দেখি, তাদের সকলেরই মুখ ভয়ে কেমনধারা হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করাতে তারা উত্তেজিতভাবে বরফের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

তুষার-কর্দমের ওপরে রয়েছে অদ্ভুত কতকগুলো পায়ের ছাঁচ!

সেগুলো দেখতে অবিকল মানুষের পায়ের দাগের মতন, কিন্তু প্রত্যেকটাই সাধারণ মানুষের পায়ের ছাপের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো! ...যার পায়ের ছাপই এমন বড়ো, তার মাথায় উচ্চতা যে কতখানি, সেটা ভাবতেও মন শিউরে ওঠে!

তবে কি এই পায়ের দাগ তারই, একটু আগে তুষার-প্রান্তরে যাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি?

পাছে আমার লোকজনরা ভয় পায়, তাই মুখে কিছু ভাঙলুম না, কেবল বললুম, 'এটা

কোনও পাহাড়ে-জন্তুর পদচিহ্ন, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সূর্য পশ্চিম দিকে নামছে, আজ এইখানেই তাঁবু ফেলবার ব্যবস্থা করো।'

তারা আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না, তবে আর কোনও গোলমাল করলে না।...

পরের দিন সকালে তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। কী ভীষণ কনকনে শীতের হাওয়া বইছে, জামার ওপর জামা পরেছি, হাতে পুরু চামড়ার দস্তানা, পশুচর্মের র‍্যাপারে সর্বাঙ্গ ঢাকা, দুই চক্ষে ঠুলি-চশমা—শীতে তবু ঠকঠক করে কাঁপছি। যারা দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়েই শীতে কেঁপে মরে তারাও এখানকার শীতলতার মর্ম বুঝতে পরবে না। এখানকার তুলনায় দার্জিলিঙ হচ্ছে প্রায় গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা।

দূরে হঠাৎ দেখা গেল, তুষার-প্রান্তরের ওপরে এক মনুষ্যমূর্তি!

কালকের দৃশ্য ভুলিনি। প্রথমটা চমকে উঠলুম। তারপর ভালো করে লক্ষ করে বুঝলুম, না, এ মূর্তিটাকে সাধারণ মানুষেরই মতন দেখতে।

লোকটি এগিয়ে আসছিল মাতালের মতন টলমল করতে করতে। দুই-একবার পড়ে গেল, তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। খানিকদূর এসেই আবার পড়ে গেল।

আমি দৌড়ে তার কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, তখন সে আবার ওঠবার চেষ্টা করছে।

তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

রক্তহীন মুখের স্তিমিত দৃষ্টি আমার দিকে ফিরিয়ে সে বলল, 'মশাইকে মনে হচ্ছে আমারই মতন বাঙালি। আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন জানতে পারি কি?'

প্রায় মৃত্যুকবলগ্রস্ত এই ব্যক্তির মুখে প্রথমেই এমন প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়ে বললুম, 'আমি হচ্ছি পর্যটক। চলেছি তিব্বতের দিকে।'

তার পথশ্রান্ত শীতাক্রান্ত ভেঙে-পড়া দেহ আবার সিধে হয়ে উঠল। আনন্দিত স্বরে সে বললে, 'ভগবানকে ধন্যবাদ! আমিও তাহলে আপনার সঙ্গী হতে চাই!'

তার হিমস্তম্ভিত হাত-পা-মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে বললুম, 'সে শক্তি কি আপনার আছে?'

লোকটি মৃদু হেসে বললে, 'আমার দেহ দুর্বল বটে, কিন্তু আমার মনের শক্তি আছে! দেহ তো মনের দাস।'

বললুম, 'সবসময়ে নয়।'

হঠাৎ উদভ্রান্ত স্বরে সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ—সবসময়েই—সবসময়েই! দেহ তো অনেকদিন ধরেই, আমাকে বহন করতে রাজি নয়—কিন্তু আমার মনই তাকে এত দূরে চালনা করে নিয়ে এসেছে! দুর্বল আমার দেহ, কিন্তু প্রবল আমার মন!'

তার উত্তেজনা দেখে প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে তাড়াতাড়ি আমি বললুম, 'আপনার নাম বলতে আপত্তি আছে?'

তখনই শান্ত হয়ে সে বললে, 'একটুও নয়। আমার নাম অজয়কুমার চৌধুরি।'

'নিবাস?'

'হালিশহরে। কিন্তু এখন আমি ভবঘুরে।'

উঃ, কী চেহারা অজয়বাবুর! মানুষের দেহ যে এমন শীর্ণ, এমন রক্তহীন হতে পারে আগে আমার সে ধারণা ছিল না। কেবল দুটি সতেজ চক্ষু তাঁর মানসিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছিল।

বললুম, 'আমার তাঁবুর ভেতরে আসুন। আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে মনের জোরেও আপনি বাঁচতে পারবেন না।'

যা ভেবেছিলুম তাই! তাঁবুর ভেতরে এসেই অজয়বাবু অচেতন হয়ে পড়লেন। দৈবগতিকে আজ যদি আমি এখানে উপস্থিত না থাকতুম, তাহলে হিমালয়ের তুষার সমাধির মধ্যেই তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত।

এই রহস্যময় লোকটিকে দেখে মনে বড়ো কৌতূহল জাগল। কে ইনি? এই মৃত্যুর দেশে কেন তিনি এসেছেন?

॥ তৃতীয় ॥

আধুনিক আরব্য উপন্যাস

দিনকয় আর তাঁবু তুলতে পারলুম না।

সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যের গুণে তিন দিনের মধ্যেই অজয়বাবু আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ভদ্রলোকের জীবনী শক্তি অদ্ভুত!

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যার সময়ে তাঁবুর ভেতরে আমরা দুইজনে বসে আগুন পোয়াচ্ছিলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'অজয়বাবু, একাকী পথিকের পক্ষে এ হচ্ছে মহাপ্রস্থানের পথ। এখানে কেন আপনি এসেছেন?'

তাঁর মুখের ওপরে ঘনিয়ে উঠল বিষাদের কালিমা। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'একজন পলাতকের সন্ধানে।'

'কে সে?'

'তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।'

দেখলুম, অজয়বাবু সহজে কোনও কথা ভাঙতে রাজি নন। কথাটা ঘুরিয়ে জানবার জন্যে বললুম, 'যার খোঁজে এতদূর এসেছেন সে-ও কি আপনারই মতো একলা?'

'হ্যাঁ। তার সঙ্গী হতে পারে, দুনিয়ার এমন দুঃসাহসী মানুষ কেউ নেই।'

'সে কি এমন ভয়াবহ?'

'ভয়াবহ বললেও তার সঠিক বর্ণনা করা হয় না। সে ভয়ানকেরও চেয়ে ভয়ানক!'

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের দিনে এখানে আমি দুঃস্বপ্নের এক মূর্তি দেখেছি।'

সচমকে সোজা হয়ে বসে আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অজয়বাবু বললেন, 'দুঃস্বপ্নের মূর্তি?'

'বীভৎস দুঃস্বপ্নের মূর্তি। যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে হচ্ছে চোখের ভ্রম, অপচ্ছায়া।'

'না, না, চোখের ভ্রম নয়, আপনি দেখেছেন এক দানবকে! সত্যি করে বলুন, সেই দৈত্যটা কোনদিকে গিয়ে...

'দানব? দৈত্য? চোখের ভ্রম নয়? বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে আরব্য উপন্যাসের দৈত্য? অজয়বাবু, আপনি কী বলছেন!'

অজয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। চারদিকে একবার পায়চারি করে এসে উত্তেজনায় কম্পিত স্বরে বললেন, 'বলুন—দয়া করে বলুন, সে কোনদিকে গিয়েছে? জানেন, তারই খোঁজে আজ আমি মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এখানে এসেছি?'

'অজয়বাবু, শান্ত হোন, উত্তেজিত হবেন না—এখনও আপনার শরীর সুস্থ হয়নি।'

অজয়বাবু আগুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বসে পড়লেন, আর কোনও কথা বললেন না।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে শুনতে লাগলুম, তাঁবুর বাইরে ধু ধু তুষারপ্রান্তরের ওপর দিয়ে হা-হা রবে কাঁদতে কাঁদতে বয়ে যাচ্ছে শীতার্ত বাতাস। তাঁবুর কোন ফাঁক দিয়ে সেই অশান্ত বাতাসের দুই-একটা তুষার-শীতল দীর্ঘশ্বাস ভেতরে ঢুকে আমাদের বুকেও শিহরণ জাগিয়ে আগুনের শিখাদের করে তুলছিল অস্থির।

ধীরে ধীরে বললুম, 'অজয়বাবু, আপনি আমার মনে কৌতূহলকে জাগিয়েছেন। চিরদিনই আমি হচ্ছি রহস্যের সন্ধানী। আমি জানতে চাই প্রকৃতির বিচিত্র সত্যকে। আমি করতে চাই অজানা-জ্ঞানের উপাসনা। আমি চাই গোপনীয়তাকে প্রকাশ করতে। এই সাধনায় জীবন দিতেও আমার আপত্তি নেই।'

বেদনাবিকৃত কণ্ঠে অজয়বাবু বললেন, 'আপনিও কি আমার মতন উন্মাদগ্রস্ত হয়েছেন? তাহলে দেখছি, আপনিও আমার মতন হতভাগ্য।'

'হতভাগ্য! আপনি নিজেকে হতভাগ্য বলে মনে করছেন কেন?'

'সত্যই আমি হতভাগ্য! প্রকৃতির রহস্য হচ্ছে বিষের পাত্রের মতোই মারাত্মক! আমার কাহিনি যদি শোনেন, তাহলে এ বিষের পাত্র এখনি ছুড়ে ফেলে দেবেন!'

তাঁর কাহিনি! ....শোনবার জন্যে আমার কৌতূহল আরও বেশি জাগ্রত হয়ে উঠল, বললুম, 'প্রকৃতির রহস্যের সঙ্গে আপনার কাহিনির কী সম্পর্ক, বুঝতে পারছি না। কারণ, আপনার কাহিনি এখনও আমি শুনিনি।'

অজয়বাবু বললেন, 'আপনার সম্বন্ধেও আমি কিছু জানি না। আগে আপনার কথাই বলুন।'

আমার জীবন দীর্ঘ নয়; অভিজ্ঞতাও অল্প। তাই বলবার কথাও বেশি নেই। তবু আমার বাল্য ও প্রথম যৌবনের কথা, আমার আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা এবং আমার শিক্ষা-দীক্ষা ও ভ্রমণের কথা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করলুম।

সমস্ত শুনে অজয়বাবু বললেন, 'যার জীবনের আদর্শ আর উদ্দেশ্য নেই, সে মানুষই নয়। আপনি সে শ্রেণির অন্তর্গত নন জেনে সুখী হলুম। কিন্তু মানুষ হচ্ছে তুচ্ছ অসম্পূর্ণ জীব, আদর্শের কাছে কোনওদিন সে পৌঁছতে পারে না।'

আমি বললুম, 'তবু আদর্শের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা আর আগ্রহের মধ্যেই থাকে মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা।'

অজয়বাবু দুঃখিত স্বরে বললেন, 'সে পরীক্ষায় আমি বিফল হয়েছি। আমার চেষ্টা আর আগ্রহের অভাব ছিল না। কিন্তু তবু আমি আদর্শের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারিনি। আমার কাহিনি শুনুন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।'

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে অজয়বাবু তাঁর কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

অদ্ভুত, বিচিত্র ও আশ্চর্য সেই কাহিনি। আরব্য উপন্যাসের মতন অবাস্তব ও ছেলেভোলানো নয়, অথচ অবাস্তবও তার মধ্যে হয়েছে সম্ভবপর! সে কাহিনি যেমন করুণ, তেমনি ভয়ানক!

হিমালয়ের অন্তঃপুরে বসে নিঃশব্দ অন্ধ রাত্রির বুকে তুষারার্ত ঝোড়ো হাওয়ার কান্নার সঙ্গে সেই কল্পনাতীত কাহিনি শুনতে শুনতে আতঙ্কে ও বিস্ময়ে মাঝে মাঝে আমার হৃদয় স্তম্ভিত ও নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যেতে লাগল!

চতুর্থ ॥

অজয়বাবুর কথা শুরু

আমার জন্ম হালিশহরে বটে, কিন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকে আমি মানুষ হয়েছি ভারতের মধ্যপ্রদেশে।

আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার। মানুষের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে ছিল তাঁর কারবার এবং ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে তাঁকে গভীর অধ্যয়ন ও আলোচনা করতে। বাবার পাঠাগারে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর কঙ্কাল সাজানো ছিল। খুব অল্পবয়স থেকেই কৌতূহলী হয়ে সেগুলি নিয়ে আমিও নাড়াচাড়া ও তাদের অর্থ বোঝবার চেষ্টা করতুম। বাল্যকালের এই কৌতূহলই ক্রমে দৃঢ়তর হয়ে আমার জীবনকে চালনা করেছিল একেবারে এক নতুন পথে।

বাড়ির ও আমাদের সংসারের কথাও কিছু কিছু বলা দরকার। সংসারে ছিলেন বাবা, আমার ছোটোভাই অশোক এবং আর একটি মেয়ে। মা মারা গিয়েছিলেন অশোকের জন্মের পরে।

মেয়েটির নাম মমতা। সে যখন শিশু, তখনই তার মা ও বাবাকে হারিয়েছিল। তার বাবার সঙ্গে আমার বাবার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল—তেমন বন্ধুত্ব সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই মমতা যখন পিতৃহীন হল, তার ভারগ্রহণ করলেন আমার বাবাই। কেবল তাই নয়, একথা আমাদের আত্মীয়স্বজন সবাই জানত যে, ভবিষ্যতে মমতাই হবে আমার সহধর্মিনী!

পরিবারের বাইরে আর-একজন ছিল আমার নিত্যকার সঙ্গী। সে হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু প্রণব। শিশুবয়স থেকেই আমি বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতুম না। কারুর সঙ্গে অশিষ্টতা করতুম না বটে, কিন্তু উঠতুম-বসতুম খেলাধুলো করতুম একমাত্র প্রণবেরই সঙ্গে। আমাদের দুজনেরই প্রাণে জাগত একই ছন্দ, একই আনন্দ।

কেবল এক বিষয়ে প্রণবের সঙ্গে আমার পার্থক্য। তার আদর্শ ও আমার আদর্শ এক ছিল না।

প্রণবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কলেজ থেকে বেরিয়ে সে হবে অধ্যাপক। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, আমি হব বৈজ্ঞানিক। অধ্যাপকের কাজ নিয়ে গাধাকে ঘোড়ায় পরিণত করবার ব্যর্থ চেষ্টায় সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া—আমার কাছে এ চিন্তাও ছিল অসহনীয়। আমি জানতে চাই এই বিপুল বিশ্বের গুপ্তকথা—কেন মানুষ জন্মায়, কেন মানুষ বাঁচে, কেন মানুষ মরে?

বাবার পাঠাগারে তন্ত্র সম্বন্ধে কতকগুলো বই ছিল। সেগুলো একে একে পাঠ করে দেখলুম যে, তান্ত্রিকরা বিশ্বাস করেন, মন্ত্রের প্রভাবে মৃতদেহেও জীবন সঞ্চার করা যায়। যদিও ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্রশক্তির ওপরে আমার এতটুকু শ্রদ্ধাও ছিল না, তবু মৃতদেহে এই যে জীবনসঞ্চার করবার কল্পনা—এটা আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল আলেয়ার আলোর মতন।

বাবার কাছে একদিন এই প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি উচ্চহাস্য করে উঠলেন। তারপর বললেন, 'অজয়, বিজ্ঞানচর্চার দিকে তোমার ঝোঁক আছে, এটা আমি লক্ষ করেছি। কিন্তু যদি যথার্থ বৈজ্ঞানিক হতে চাও তাহলে সেকেলে তন্ত্র-মন্ত্রের কথা ভুলে যাও, কারণ ওসব হচ্ছে গ্রিমের লেখা পরির গল্পের মতো।'

কিছুদিন পরেই হাতে পড়ল আমেরিকায় প্রকাশিত একখানি মাসিকপত্র, তার নাম 'তন্ত্র'। কাগজখানির নাম দেখেই বিস্মিত হলুম, কারণ এটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান লীলাক্ষেত্র আমেরিকাতেও তাহলে সেকেলে ভারতীয় তন্ত্রের প্রভাব আছে?

কাগজখানির আগাগোড়া পাঠ করে বিস্ময় আরও বেড়ে উঠল। দেখলুম, অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তার প্রভৃতি ভারতীয় যোগীদের সমাধি বা যোগনিদ্রা নিয়ে মাথা

ঘামিয়েও আসল রহস্যের চাবি খুঁজে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। এমনকি অনেকে তান্ত্রিক সাধকদের মড়া জাগানোকেও সত্য বলে মানতে বাধ্য হয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান-প্রিয় একেলে আমেরিকানরাও এসব কথাকে পরির গল্প বলে মনে করে না।

প্রকৃতির রহস্যসাগরে ডুব দেওয়ার জন্যে আমার আগ্রহ আরও প্রবল হয়ে উঠল।

আমার সাধারণ পাঠ্য-জীবন নিয়ে এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার দরকার নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আমার প্রধান আলোচ্য হল, রসায়নবিদ্যা। বিশেষ করে রসায়ন বিদ্যাবলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতির বহু অজানা-শক্তির অধিকারী হয়েছেন এবং এইজন্যেই এই বিশেষ বিভাগেই হল আমার কার্যক্ষেত্র।

এখানে আমি যে পরম জ্ঞানী অধ্যাপকের সাহায্য লাভ করলুম, তিনি আমার দৃষ্টি খুলে দিলেন নানা দিকে।

প্রথম দিনেই তিনি বললেন, 'এ বিভাগের প্রাচীন পণ্ডিতরা অসম্ভবকে সম্ভব করবেন বলে আশা দিতেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে করতে পারেননি কিছুই। আধুনিক পণ্ডিতরা বিশেষ কিছু করবেন বলে আমাদের আশান্বিত করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে পৃথিবীতে পরশ পাথরের অস্তিত্ব নেই এবং মৃত সঞ্জীবনী সুধা হচ্ছে অলস কল্পনা মাত্র। কিন্তু নিজের গুপ্ত ভাণ্ডারে বসে প্রকৃতি কেমন করে কাজ করেন, সেটা তাঁরা আবিষ্কার করতে ছাড়েননি। তারই ফলে আজ তাঁরা হয়েছেন অনন্ত শক্তির অধিকারী।'

এই অধ্যাপকটিকে পথপ্রদর্শকরূপে পেয়ে দিনে দিনে আমি জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেলুম। অধ্যাপকের নিজের একটি পরীক্ষাগার ছিল, সেখানকার সমস্ত দুর্লভ যন্ত্রপাতি নিয়ে আমি কাজ করবার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হলুম না।

কেবল দিনের বেলায় পরীক্ষাগারে নয়, নিজের ঘরে বসেও প্রায় সারারাত ধরে আমি রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ ও গভীর চিন্তা করতুম। রসায়ন বিভাগে আমার দ্রুত অগ্রগতি দেখে অন্যান্য ছাত্ররা যেমন বিস্মিত হত, তেমনি আনন্দিত হতেন আমার অধ্যাপক। এইভাবে দুই বৎসর কেটে গেল।

আমার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দেশান্তরে। দুই বৎসরের মধ্যে বাড়ি ফেরবার কথা একবারও আমার মনে হয়নি—এমনি একান্তভাবে আমি নিমগ্ন হয়েছিলুম গভীর সাধনায়! এমনকি, ছুটির দিনেও আমি ছুটি নিতুম না।

একটা বিষয় সর্বদাই আমাকে আকৃষ্ট করত। সেটা হচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর দেহের কাঠামো। মনে ক্রমাগত এই প্রশ্ন জাগত, জীব-জীবনের উৎস কোথায়? এমন প্রশ্ন কত লোকেরই মনে জাগে, কেউ কিন্তু সদুত্তর খুঁজে পায়নি। অথচ আমার বিশ্বাস, মানুষের মিথ্যা ভয়, কাপুরুষতা বা অবহেলা যদি তাকে বাধা না দিত, তাহলে হয়তো সে এক প্রশ্নের উত্তর লাভ করত অনেকদিন আগেই।

ভেবে দেখলুম, জীবনের কারণ অন্বেষণ করতে গেলে আগে আমাকে পরীক্ষা করতে

হবে মৃত্যুকে। শরীর-সংস্থান বিদ্যা বা অ্যানাটমি সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম। কিন্তু কেবল সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। সেইসঙ্গে হাতেনাতে মানব দেহের ধ্বংস ও স্বাভাবিক বিকৃতিও লক্ষ করা উচিত। মনে মনে একটা সংকল্প করলুম। এ সংকল্পের কথা শুনলে সাধারণ মানুষ হয়তো শিউরে উঠবে। কিন্তু কোনওরকম অলৌকিক আতঙ্কই কোনওদিন আমাকে অভিভূত করতে পারেনি—এ শিক্ষা পেয়েছি আমি শৈশবে বাবার কাছ থেকে। ভূতের গল্প বা ভূতের আবির্ভাব, আমার কাছে এসব ছিল হাসির ব্যাপার।

আমাদের বাসার কাছে ছিল একটি গোরস্থান। এক গভীর রাত্রে চুপিচুপি আমি সেইদিকে যাত্রা করলুম। সঙ্গে নিলুম একটি চোরা লণ্ঠন ও শাবল।

গভীর রাত্রি। আকাশ নিশ্চন্দ্র। চারদিকে থমথমে অন্ধকার। মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাকে স্তব্ধতা জেগে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়ছে।

গোরস্থানের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটা মস্ত ঝুপসি গাছ হঠাৎ মড়মড় শব্দ করে উঠল—দমকা বাতাসের ধাক্কায়। কতকগুলো ঝিঁঝিপোকা আচমকা একসঙ্গে ডেকে উঠেই যেন কোনও বিভীষিকার সাড়া পেয়ে আবার চুপ মেরে গেল। কী একটা জীব শুকনো পাতার ওপরে সশব্দে পা ফেলে ছুটে পালিয়ে গেল—বোধহয় শেয়াল।

এসব দেখেশুনে আমার কিছুমাত্র ভাবান্তর হল না। গোরস্থান তো কেবলমাত্র সেইসব জীবনহীন দেহরক্ষার আধার—আগে যারা ছিল সৌন্দর্যে কমনীয় এবং এখন যারা হয়েছে কীটের খোরাক।

সেই রাত্রেই গোটা চারেক পুরানো ও নতুন কবর খুঁড়ে কতকগুলো অস্থিসার বা অর্ধগলিত বা প্রায় অবিকৃত মড়া বার করে লণ্ঠনের আলোতে পরীক্ষা করলুম।

এইভাবে আমার পরীক্ষা চলতে লাগল রাত্রির পর রাত্রি ধরে।

এইসব নরদেহ—কবিরা যাদের রূপ বর্ণনা করে আসছেন যুগ-যুগান্তর ধরে, এখানে তাদের কী অবস্থা! মৃত্যু এসে হরণ করেছে তাদের সমস্ত রং-গড়ন, গতি-ভঙ্গির ছন্দ!

কিন্তু এদের মধ্যে কোথায় জীবনের সমাপ্তি এবং কোথায় মৃত্যুর আরম্ভ? কোন ফাঁক দিয়ে পলায়ন করেছে চঞ্চল জীবন এবং আবির্ভূত হয়েছে অসাড় মরণ? ভাবতে ভাবতে আচম্বিতে প্রগাঢ় অন্ধকারের ভেতরে ফুটে উঠল এক অপূর্ব সত্যের বিচিত্র জ্যোতি!

আশ্চর্য সেই আলোক রহস্য—কিন্তু কত সহজ তার অর্থ! অবাক ও অভিভূত হয়ে ভাবতে লাগলুম, পৃথিবীর এত বড়ো বড়ো প্রতিভাধর এই একই রহস্য নিয়ে চিরকাল ধরে মস্তিষ্কচালনা করে এসেছেন, কিন্তু এমন সহজ অর্থটাও কারুর কাছে ধরা পড়েনি! আর আমি হচ্ছি জ্ঞান-রাজ্যের এক নগণ্য অতিথি, আমার কাছেই কিনা সেই চিরন্তন সত্য এমন অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করলে!

ভাববেন না আমি পাগল! সত্য বলছি আমি আবিষ্কার করেছি জন্ম ও জীবনের কারণ! কেবল তাই নয়, এখন আমি জীবনহীন জড়ের মধ্যেও জীবন সঞ্চার করবার ক্ষমতা অর্জন করেছি।

॥ পঞ্চম ॥

জীবন সৃষ্টি

এই অদ্ভুত আবিষ্কার করে আনন্দে আমি যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলুম। এবং এই উন্মাদনার মধ্যে তলিয়ে গেল আমার সমস্ত পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টের কথা। প্রকৃতির যে রহস্য ভাণ্ডারের দ্বার আজ পর্যন্ত কেউ খুলতে পারেনি, তারই চাবি আমার হস্তগত!

বন্ধু, আপনার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারছি, আমার গুপ্তকথা জানবার জন্যে আপনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু অসম্ভব, সেকথা আপনাকে জানানো অসম্ভব! আগে আপনি আমার কাহিনির সবটা শুনুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন, আমার এই গুপ্তকথা জানার অর্থই হচ্ছে, স্বখাতসলিলে ডুবে মরা। যে দুর্ভাগ্যের তাড়নায় আমি নিজেই আজ ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছি, তার কবলে আপনাকেও নিক্ষেপ করে লাভ নেই। বলেছি, এক্ষেত্রে জ্ঞানের পাত্র হয়েছে বিষের পাত্র—এ বিষ সহ্য করবার শক্তি থেকে আমরা বঞ্চিত।

আবিষ্কারের পর চিন্তা করতে লাগলুম, আমি সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি বটে, কিন্তু অতঃপর কী সৃষ্টি করা উচিত? মানুষ, না মানুষের চেয়ে নিচু কোনও জীব?

যে-কোনও জীবের কাঠামোর মধ্যে শত-শত জটিল খুটিনাটি আছে। তন্তু, মাংসপেশি ও শিরা-উপশিরা তৈরি করে যথাস্থানে বসিয়ে কাজে লাগানো বড়ো যে-সে ব্যাপার নয়। আপাতত আমার হাতে যে মালমশলা আছে, তার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত হয়তো আমি সফল হতে পারব না; হয়তো বারংবারই আমাকে বিফল হতে হবে; হয়তো আমার গঠনকার্য হবে অসম্পূর্ণ!

কিন্তু তবু আমি দমলুম না, কারণ, প্রথমবারে বিফল হলেও দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে পারব। এবং দ্বিতীয়বারেরও পরে আছে তৃতীয়বার!

স্থির করলুম, সর্বপ্রথমে মানুষই গড়ব। ...কাজ আরম্ভ করতে দেরি হল না। কিন্তু সাধারণ মানব-দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ঠিকমতো গড়ে তোলা বড়োই কষ্টসাধ্য দেখে ভিন্নভাবে কাজ শুরু করলুম।

এবারেও মানুষের কাঠামো গড়ব বলে স্থির করলুম বটে, কিন্তু খুদে পাঁচ-ছ'ফুট লম্বা মানুষ নয়। এ হবে দানবের মতন বৃহৎ মানব—যেমন দৈর্ঘ্যে, তেমনি প্রস্থে! বিরাট দেহ, বিপুল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! ...কয়েক মাস ধরে দরকারি মালমশলা সংগ্রহ করে দেহ গড়তে বসে গেলুম।

গড়তে গড়তে মনের ভেতর দিয়ে যেসব বিভিন্ন ভাবের ঝড় বয়ে যেতে লাগল, তা আর বলবার নয়। জীবন ও মৃত্যুর সীমাবন্ধন ছিন্ন করব আমি! অন্ধ বিশ্বের ওপরে করব আলোকবর্ষণ! নতুন এক জাতের মানুষ আবির্ভূত হবে এই পৃথিবীতে, তারা শ্রদ্ধা করবে আমাকে সৃষ্টিকর্তা বলে! আমার মানসপুত্ররা হবে কত সুখী, কত সুন্দর! এমন কথাও

ভাবলুম, আমি যদি জড়কেও জ্যান্ত করে তুলতে পারি, তাহলে মড়াকেও আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারব না কেন?

এইসব ভাবি, মাঝে মাঝে মূর্তি গড়ি এবং মাঝে মাঝে কেতাবের পর কেতাব পড়ি। দিনের পর দিন যায়, আমি থাকি ঘরের ভেতরে বন্দি। আমার চোখ গেল বসে, গাল গেল চুপসে, শরীর গেল শীর্ণ হয়ে। জানলার ফাঁক দিয়ে সূর্য-চাঁদ উঁকি মেরে যায়, কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় আমার নেই।

এক-একবার বেরিয়ে যাই, কবর খুঁড়ে অস্থি নিয়ে আসবার জন্যে। সময়ে সময়ে জ্যান্ত জীবজন্তু এনে তাদের দেহে অস্ত্রাঘাত করে যন্ত্রণা দিয়ে পরীক্ষা করি, একটা জীবনহীন জড়পিণ্ডকে জীবন্ত করবার জন্যে! আমার গুপ্ত সাধনার বীভৎসতা কে কল্পনা করতে পারবে? মাঝে মাঝে আমারও মনুষ্যত্ব বিদ্রোহী হয়ে উঠত, কিন্তু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে আবার তাকে শান্ত করতুম। শরীর যখন আর বয় না, তখনও ছুটি নেই—এই একমাত্র কর্তব্য পালনের জন্যে আমি হয়ে উঠলুম যেন আত্মহারা, উন্মাদগ্রস্ত!

শীত গেল, বসন্ত গেল, গ্রীষ্ম গেল আমার ঘরের বাইরে দিয়ে হেসে-গেয়ে-নেচে-ফুল ছড়িয়ে।

তারপর সে এক ঘনঘোর বর্ষার রাত্রি। জানলার শার্সির ওপরে শুনছি বাতাসের ধাক্কা এবং বৃষ্টির পটাপট শব্দ। বাইরের দিকে জেগে জেগে উঠছে বিদ্যুতের অগ্নিপ্রভা!

ঘড়িতে টং করে বাজল একটা। আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড টেবিলের ওপরে শোয়ানো, আমারই হাতে-গড়া বিরাট মূর্তিটার মুখের দিকে তাকালুম। কী দৃশ্য!

মূর্তিটা ধীরে ধীরে তার বিবর্ণ হলদে চোখদুটো খুলে ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শ্বাস-প্রশ্বাসে তার বক্ষস্থল সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল!

আমার প্রাণ কেঁপে উঠল যেন দারুণ এক দুর্ঘটনায়! এতকাল ধরে এত চিন্তা, যত্ন ও পরিশ্রমের পরে এ আমি কী গড়েছি? জীবনলাভের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মূর্তিটার রূপ যে গেল বদলে! হলদে চামড়ার তলা থেকে ওর সমস্ত মাংসপেশি ও শিরা-উপশিরা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, জীবন্তের মুখে মড়ার দাঁতের মতন তার দাঁতগুলো ঝকঝক করছে, তার ধূসর শ্বেত অক্ষিকোটরে জ্বলজ্বল করছে দুটো ভয়ানক জলীয় চক্ষু! এ তো মানুষ নয়, এ যে রাক্ষস!

এক মুহূর্তে আমার সমস্ত স্বপ্ন ছুটে গেল—মনের ভেতরে জেগে উঠল বিষম আতঙ্ক ও বিজাতীয় ঘৃণা! এই অপসৃষ্টির জন্যেই কি আমি জীবনের এতগুলো দিন ব্যয় করলুম?

আর সে দৃশ্য সহ্য করতে পারলুম না, দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকে একেবারে বিছানার ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। চেষ্টা করলুম ঘুমোবার জন্যে—কিন্তু মনের সে অবস্থায় কি ঘুম সহজে আসতে চায়? অনেকক্ষণ ছটফট করবার পর তন্দ্রা এল—কিন্তু তার সঙ্গে এল ভয়াবহ সব দুঃস্বপ্ন। আবার ধড়মড় করে উঠে বসলুম।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে—জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে এবং

সেই আলোতে দেখলুম, বিছানার মশারিটা দুই হাতে ফাঁক করে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আমার স্বহস্তে সৃষ্ট সেই ভীষণ দানবটা! এবং তার দুটো জলীয় চোখ—যদি তাদের চোখই বলা চলে—ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে আমারই পানে!

তার চোয়াল দুটো খুলে গেল, তার মুখ দিয়ে বেরুল বোবাদের মতন কী একরকম অব্যক্ত শব্দ, তারপর সে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসলে।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়লুম। সে হাত বাড়িয়ে আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, কিন্তু কোনও গতিকে তাকে ফাঁকি দিয়ে আমি সরে পড়লুম। একেবারে নেমে এলুম বাড়ির উঠোনে। তারপর উত্তেজিতভাবে ক্রমাগত পায়চারি করি আর প্রত্যেক শব্দে চমকে উঠে ভাবি—ওই বুঝি এই দানোয় পাওয়া মৃতদেহটা আবার আমাকে আক্রমণ করতে আসছে! ...উঃ, অসম্ভব সেই মূর্তি! কোনও মানুষ তার দিকে তাকাতে পারে না! মিশরের হাজার হাজার বছর ধরে রক্ষিত মড়া বা 'মমি' যদি জীবনলাভ করে, তবে তার বীভৎসতাও হার মানবে এর কাছে!

চাঁদ ডুবল, আলো ফুটল, সূর্য উঠল। বিনিদ্র চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে সেই অভিশপ্ত বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। চলতে চলতে বারংবার পিছন ফিরে দেখতে লাগলুম—মনে তখনও ভয় ছিল যে, হয়তো সেই রাক্ষসটাও আমাকে খোঁজবার জন্যে পথে বেরিয়ে আসবে! সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও ভাবতে লাগলুম যে, প্রকাশ্যে সেই কল্পনাতীত অমানুষিক মূর্তির আবির্ভাব দেখলে রাজপথের ওপরে কীরকম চাঞ্চল্য ও গোলমালের সৃষ্টি হবে। এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আবিষ্কার করলে দেশের লোকের কাছে আমি লাভ করব কীরকম অভ্যর্থনা!

মানুষ হয়ে আমি ভগবানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে গিয়েছিলুম—ভেবেছিলুম ঈশ্বরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুঝি জড়বিজ্ঞান! তারই ফল এই। চেয়েছিলুম স্বর্গে উঠতে, নেমে এলুম পাতালের অন্ধকারে। দেবতা গড়তে গিয়ে দানব গড়ে বসেছি!

॥ ষষ্ঠ ॥

দুর্ভাগ্য

নদীর ধারে এসে পড়লুম।

সোনালি রোদ মাখানো আকাশ, আনন্দ-ঝরানো বাতাস, ঢেউয়ের সঙ্গে গান দোলানো নদীর নাচ—প্রকৃতির এইসব স্বাভাবিক আশীর্বাদকে এতদিন ভুলেছিলুম কীসের মোহে!

এই তো পাখি ডাকছে, গাছের সবুজ ঝিলমিল করছে, ঘাসেঘাসে রংবেরঙা ফুল ফুটছে—সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ এদের দেখে আসছে, তবু এরা কারুর চোখে পুরানো নয়!

তুচ্ছ জ্ঞানের সাধনা—যার মোহে মানুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিবাস্বপ্ন দেখে নিজের প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করতে চায়! আর সেইসব মানুষই শ্রেষ্ঠ ও সুখী, নিজেদের গণ্ডি-ঘেরা ক্ষুদ্র গ্রামকেই যারা মনে করে সমগ্র পৃথিবী!

অনেকদিন পরে আজ মুক্ত প্রকৃতিকে বড়ো ভালো লাগল। আপনমনে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলুম—বাসায় ফেরবার কথা একবারও মনে হল না।

এমন সময়ে নদীর ওপার থেকে একখানা নৌকা এসে এপারে ভিড়ল। একটি লোক নৌকা থেকে নীচে নেমেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আরে, অজয় যে! কী ভাগ্যি, এখানে এসেই প্রথমে তোমার সঙ্গে দেখা!'

এ যে আমার বাল্যবন্ধু প্রণব! ছুটে গিয়ে তার দুই হাত চেপে ধরলুম।

প্রণব আমার মুখের পানে চেয়ে বলল, 'ভাই অজয়, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে! তোমাকে দেখলেই মনে হয় যেন কতকাল তুমি ঘুমোওনি! ব্যাপার কী? তোমার কি অসুখ হয়েছে?'

'প্রণব, তুমি ঠিক ধরেছ! আমার অসুখ হয়নি বটে, কিন্তু কাজের তাড়ায় বহুদিন আমার ভাগ্যে বিশ্রাম জোটেনি। আজ আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে—এখন আমি স্বাধীন। যাক সে কথা—আগে বাড়ির কথা বলো। বাবা, অশোক আর মমতার খবর কী?'

'সবাই ভালো। কিন্তু সবাই তোমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কতকাল তুমি দেশে যাওনি—চিঠিতেও নিজের কথা ভালো করে লেখোনি। সেইজন্যেই তোমার বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এসব কথা এখানে নয়—চলো তোমার বাসায় যাই।'

বুক কেঁপে উঠল। বাসা!

কিন্তু উপায় নেই। প্রণবকে নিয়ে বাসায় না গেলে তো চলবে না। ফিরলুম। আসতে-আসতে কেবলই ভাবতে লাগলুম গেল রাতের কথা।

বাসার কাছে এসে দাঁড়ালুম। ওর দোতলা ঘরে সেই ভয়ানক রাক্ষসটা এখনও কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে? প্রণব যদি তাকে দেখে তাহলে কী হবে? হয়তো সে বিকট আর্তনাদ করে ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়বে আর তার চিৎকার শুনে রাজ্যের লোক ছুটে আসবে, পুলিশের আবির্ভাব হবে, চারদিকে মহা হইচই পড়ে যাবে! তখন আমি কী করব? কী জবাবদিহি দেব?

প্রণবকে কিছুক্ষণ নীচে অপেক্ষা করতে বলে আমি নিজের বাড়ির ভেতরে ঢুকলুম।

বাড়ি চুপচাপ। সিঁড়ির ওপর দিয়ে বিদ্রোহী পা দুটোকে কোনওরকমে চালিয়ে নিয়ে দোতলায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

ওই সেই ঘর! দরজা বন্ধ! দরজায় খানিকক্ষণ কান পেতে রইলুম। ভেতরে কোনও শব্দ নেই। তবে কি তার কৃত্রিম দেহে জীবনের যে শিখা জ্বেলে দিয়েছিলুম, এরই মধ্যে আবার তা নিবে গিয়েছে?

সভয়ে, কম্পিত হস্তে হঠাৎ ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেললুম।

ঘরের ভেতরে কেউ নেই। ছুটে আমার শোওয়ার ঘরে গেলুম। সেখানেও কেউ নেই।

মুক্ত—আমি রাহুমুক্ত। বিপুল আনন্দে চিৎকার করে প্রণবকে ডাকলুম।

প্রণব যখন ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল, আমি তখন পাগলের মতন অট্টাহাসি হাসছি আর হাসছি।

প্রণব সবিস্ময়ে বললে, 'ভাই অজয়, ব্যাপার কী? দোহাই তোমার, অমনভাবে আর হেসো না!'

আচম্বিতে আমার ভ্রান্ত চোখ যেন দেখলে—সেই দৈত্যটা আবার ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। আমি চিৎকার করে বললুম, 'রক্ষা করো প্রণব, আমাকে রক্ষা করো!' বলে অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়লুম!

তারপর প্রবল জ্বরের আক্রমণে শয্যাগত হয়ে কেটে গেল মাসের পর মাস। কখনও জ্বর ছাড়ে, আবার তেড়ে আসে। কখনও কমে, কখনও বাড়ে। কখনও আচ্ছন্নের মতো শুয়ে থাকি, কখনও বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকি।

বাবা নিশ্চয়ই আমার কাছে এসে পড়তেন, কিন্তু তিনি এখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন—রেলপথে এতদূর আসবার ক্ষমতা তাঁর নেই। এবং চিকিৎসকরা বললেন, আমাকে স্থানান্তরিত করবার চেষ্টা করলে পীড়াবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কাজেই আমার সেবার ভার নিতে হল একা প্রণবকেই। আর আমার পক্ষে তার চেয়ে যোগ্য লোক এ সংসারে কে আছে?

দীর্ঘকাল পরে আমি যখন আরোগ্যলাভ করলুম পৃথিবীতে তখন বসন্তের আগমন হয়েছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গাছে-গাছে নতুন পাতার শ্যামল সমারোহ। কানে আসছে গীতকারী পাখিদের উচ্ছ্বসিত ভাষা। নিশ্বাস টানলেই পাই বাগানে ফোটা তাজা ফুলের সৌরভ। চারদিকে নবজীবনের উৎসব, এরই মধ্যে পাখি, ফুল, পাতার মতন আমারও যে একটুখানি ঠাঁই আছে, এই ভেবে মন পুলকিত হয়ে উঠল।

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললুম, 'ভাই প্রণব, তুমি এখানে না থাকলে আমি আজ কোথায় থাকতুম? এই সুন্দর পৃথিবী থেকে হয়তো আমার অস্তিত্বই মুছে যেত। আমি কেমন করে তোমার ঋণ পরিশোধ করব?'

প্রণব বললে, 'চুপ করো অজয়। আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ঋণের কথা উঠতেই পারে না। ও প্রসঙ্গ থাক। আপাতত তুমি যখন সেরে উঠেছ, তোমার সঙ্গে আমি একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।'

আবার বুক দুরুদুরু করে উঠল। প্রণব কী নিয়ে আলোচনা করবে? তবে কি আমি বিকারের ঘোরে আমার সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ করে ফেলেছি?

প্রণব বললে, 'কথাটা যে কী, আমার মুখে শোনবার দরকার নেই। তোমার বাবার একখানা চিঠি এসেছে, পড়ে দ্যাখো।

প্রণবের হাত থেকে বাবার পত্রখানি নিয়ে পাঠ করতে লাগলুম

'বাবা অজয়,

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তুমি আরোগ্যলাভ করেছ। কিন্তু তবু আমার আনন্দলাভ করবার উপায় নেই, কারণ ভগবান আমাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন। বজ্রাহত বৃক্ষের মতন আজ আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছি। শেষবয়সে আমাকে যে এই মহা দুর্ভাগ্যের দুর্বহ ভার বইতে হবে, এটা কোনওদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

তোমার ছোট্টভাই অশোককে আর তুমি দেখতে পাবে না। আজও তার কোল ছাড়বার বয়স হয়নি। কিন্তু এই বয়সেই অশোককে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

কিন্তু এ সাধারণ মৃত্যু নয়। কারণ, অশোক মারা পড়েছে হত্যাকারীর হাতে। আমার সেই ফুলের মতন সুন্দর, পবিত্র ও কোমল শিশু—যাকে দেখলে সবাই ভালোবাসতে চাইত, তাকেই হত্যা করেছে কোনও নিষ্ঠুর নরপশু।

অকারণে শোকোচ্ছ্বাসে পত্র পরিপূর্ণ করে লাভ নেই—শোকপ্রকাশ করে কেউ কোনদিন মৃত্যুকে বাঁচাতে পারেনি। এখানে ব্যাপারটা যতদূর পারি গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করব।

গত তেসরা ফাল্গুন অশোককে নিয়ে আমি আর মমতা সান্ধ্যভ্রমণে বেরুই। তুমি জানো, এটি আমার পুরোনো অভ্যাস। ছেলেবেলায় তুমিও আমার সঙ্গে রোজ বেড়াতে বেরুতে।

অশোক বাগানের এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করে আপন মনে খেলা করছিল, মমতা আর আমি বসেছিলুম একখানি বেঞ্চিতে।

সন্ধ্যা যখন হয় হয়, তখন আমরা বাড়ি ফেরবার জন্যে গাত্রোত্থান করলুম। কিন্তু অনেক ডাকাডাকি করেও অশোকের সাড়া পাওয়া গেল না।

তখন ভয় পেয়ে আমরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলুম। অনেকক্ষণ পরে রাতের অন্ধকার যখন জমাট হয়ে উঠেছে, তখন বাগানের বাইরে একটি ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল অশোকের মৃতদেহ। কোনও পিশাচের কঠিন আঙুলের ছাপ তখনও তার কণ্ঠের ওপরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

অশোকের দেহের পাশে পড়েছিল একখানা খণ্ড খণ্ড ফটোগ্রাফ। সেখানা তোমারই ছবি—তোমার যাওয়ার আগের দিনে যা তোলা হয়েছিল।

ছবিখানা তোমার ঘরের ড্রেসিং-টেবিলের ওপরে ছিল, ঘটনাস্থলে কেমন করে এল প্রথমটা তা বুঝতে পারিনি। তারপর আন্দাজ করেছি, শিশু-বুদ্ধির কোনও খেয়ালে অশোক বেড়াতে যাওয়ার সময়ে ছবিখানা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছবিখানা এমন খণ্ড-খণ্ড অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে কেন, তার কারণ আমি জানি না। পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখনও খুনির কোনও সন্ধানই পাওয়া যায়নি। এবং এই শিশুহত্যার উদ্দেশ্যই বা কী তাও কেউ অনুমান করতে পারছে না।

তোমার মা পরলোকে গিয়ে এই দারুণ আঘাতের ব্যথা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন বটে, কিন্তু মমতাকে নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে পড়েছি। অশোকের মায়ের স্থান নিয়েছিল মমতাই, তাকে হারিয়ে তার অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। সে দিনরাত কাঁদছে আর ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছে। মমতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তি আমার নেই।

অজয়, পত্রে আমি এর বেশি আর কিছু লিখতে চাই না—লেখবার শক্তিও আমার নেই। নিজেকে বড়োই একাকী বলে মনে করছি। এখন তোমাকে আমার কাছে পেতে চাই। ইতি—

তোমার হতভাগ্য পিতা'

সেইদিনই প্রণবের সঙ্গে দেশের দিকে যাত্রা করলুম।

॥ সপ্তম ॥

আবার দুঃস্বপ্ন

দেশে এসেছি।

আমাদের শোকাচ্ছন্ন পরিবারের দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা নিয়ে এখানে আলোচনা করে আমার আসল বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। দুনিয়ার এমন কে মানুষ আছে, শোক-দুঃখের আস্বাদ যে পায়নি? এক্ষেত্রে মানুষ মাত্রই ভুক্তভোগী। সুতরাং আমার একান্ত সাধারণ অশ্রুজলের কাহিনি এবং প্রিয়বিয়োগকাতর আত্মীয়স্বজনের হা-হুতাশের ইতিহাস বর্ণনা না করলেও আপনি অনায়াসেই অনুভব করতে পারবেন।

একে দীর্ঘকালব্যাপী রোগশয্যা থেকে উঠেই ভগ্নদেহে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, তার ওপরে বাড়ির ভেতরকার এই বুকচাপা আবহ;—প্রাণ-মন যেন শ্রান্ত হয়ে পড়ল। ছোটো ভাইকে আমি যে ভালোবাসতুম না, তা নয়; অশোক ছিল আমার আত্মার মতন প্রিয়। কিন্তু যতই কাঁদি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি, সে আর ফিরবে না। নিয়তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ নেই।

শোকের চেয়ে আমার মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল প্রতিহিংসার ভাব। অতটুকু নিষ্পাপ অবোধ শিশু—পৃথিবীতে ছিল যে স্বর্গের প্রতিনিধির মতো, কোন পাষণ্ড তাকে অকারণে হত্যা করলে? এ যেন কেবল হত্যার আনন্দ উপভোগ করবার জন্যেই হত্যা করা। এত বড়ো নরাধম যে এখনও ধরা পড়ল না, সে যে এখনও সমাজে-সংসারে সাধুর মুখোশ পরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এই ভেবেই আমার আক্রোশ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল।

দিনরাত কেবল ওই কথাই ভাবি। শিশু-রক্তে হাত রাঙা করে কোথায় সে লুকিয়ে আছে? কে তার সন্ধান দেবে? কোন কৌশলে তাকে ধরা যায়?

ভগ্ন দেহের দুঃখ, বাবার ও মমতার শোক-অধীর মুখ, হত্যাকারীর বিরুদ্ধে অশান্ত জল্পনা-কল্পনা ক্রমেই আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। তাই একদিন মনকে একটু ছুটি দেওয়ার জন্যে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

পশ্চিমের যে ছোটো শহরটিতে আমার বাড়ি, তার সীমানা পার হলেই দেখা যায় চারদিকে পাহাড়, ঝরনা, বন, মাঠ আর নদী। প্রকৃতিকে চিরদিন আমি ভালোবাসি, তার কোলে গিয়ে দাঁড়ালে কেবল সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য নয়, লাভ করি সান্ত্বনার আশীর্বাদও।

ভুট্টাখেতের পর ভুট্টাখেত—সেখানে দিকে দিকে বসেছে পাখিদের ভোজসভা। সুদূরের নীল অরণ্যের এপারে পড়ে রয়েছে অসমোচ্চ প্রান্তর এবং তারই ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির রৌপ্য-ধমনির মতন একটি ছোট্ট নদী।

সামনেই একটি পাহাড়। তারই পদতলে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম, আজকের বিদায় লগ্নে পশ্চিম আকাশের পটে রঙিন ছবি আঁকবার জন্যে সূর্য কোন কোন রঙের ডালা নিয়ে বসেছে।

কিন্তু আর একদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম, সূর্যের চিত্রলেখা মুছে দেওয়ার জন্যে দ্রুত ধেয়ে আসছে মস্ত একখানা কালো মেঘ। দেখতে দেখতে বজ্র-বাজনা বাজাতে বাজাতে সেই বিদ্যুৎভরা মেঘখানা প্রায় সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল ব্লটিং কাগজের ওপরে ওলটানো দোয়াতের কালির মতো।

বহুদূর থেকে আগতপ্রায় ঝটিকার চিৎকার শুনতে পেলুম। তারপর হয়তো বৃষ্টিও আসবে।

এখানকার সমস্তই আমার নখদর্পণে। বাল্যকালে এই মাঠে, নদীর ধারে ও পাহাড়ের বুকে কত খেলাই করেছি। শ-দেড়েক ফুট ওপরে পাহাড়ের এক জায়গায় একটি গুহা আছে তাও আমি ভুলিনি। আসন্ন ঝড়-বৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে সেই গুহার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলুম।

শুকনো ধুলো-পাতা-বালি উড়িয়ে, বড়ো বড়ো গাছগুলোকে দুলিয়ে হু হু শ্বাসে ঝড় এসে পড়ল—কিন্তু তখন আমি গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

আচম্বিতে অন্ধকার ভেদ করে আমার চোখ দেখতে পেলে, গুহার মুখেই রাত্রির মতন কালো কী একটা ছায়া। চমকে উঠলুম। ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলুম।

অকস্মাৎ মুহূর্তের জন্যে সারা আকাশে যেন আগুন ধরিয়ে দপ করে জ্বলে উঠল তীব্র এক বিদ্যুৎ শিখা। ...আর কোনও সন্দেহ রইল না। ক্ষণিক আলোকেই সেই অসম্ভব দীর্ঘ ও বিরাট ও বীভৎস মূর্তিকে চিনতে পারলুম আমি অনায়াসেই। এ আর কেউ নয়—আমারই হাতে গড়া দানব!

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। দেখলুম, দৈত্যটা আশ্চর্য এক লাফ মেরে প্রায় দশ-বারো ফুট

উঁচু একখানা পাথরের ওপাশে গিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরেই ঝড়ের হুংকার ডুবিয়ে কানে এল হা-হা-হা-হা করে বিকট এক অট্টহাস্য। কী সেই অট্টাহাস্য—পৃথিবীর সমস্ত নৃশংসতার আনন্দ যেন তার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল!

ঝড় বইছে, বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু আমার পা দুটো যেন পাথরের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেল। প্রকৃতির দুর্যোগ অনুভব করতেও পারলুম না—আমার দেহ ও হৃদয় স্তম্ভিত!

বিদ্যুতের আলোক কেবল সেই ঘৃণ্য দানবকেই প্রকাশ করলে না—সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুললে আর এক ভীষণ সত্যকে।

এই দানবই অশোকের হত্যাকারী!

হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। প্রথমত যে-কোনও নির্দয় মানুষের পক্ষেও বিনা কারণে অমন কচি শিশুকে হত্যা করা অসম্ভব। এ হচ্ছে অমানুষিক পাপ। দ্বিতীয়ত, কোথায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আর কোথায় আমাদের এই ছোট্ট নগর। দুনিয়ার এত দেশ থাকতে দানবটা কেনই বা এখানে এসে হাজির হয়েছে আর কেনই বা এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তৃতীয়ত, আমাকে দেখে অমন বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে সে পালিয়ে গেল কেন?

নিশ্চয়, নিশ্চয়! অশোকের হত্যাকারী হচ্ছে এই দানব—নিশ্চয়!

একবার ভাবলুম, পিশাচের পিছনে পিছনে ছুটে যাই। তারপরেই বুঝলুম, সে হবে একেবারেই ব্যর্থ চেষ্টা। যে সৃষ্টিছাড়া জীব দশ-বারো ফুট উঁচু পাথর এক লাফে অনায়াসে টপকে যেতে পারে, তাকে ধরবার শক্তি কোনও সাধারণ মানুষেরই নেই। আর তার দেহ গড়েছি আমি স্বহস্তেই। তাকে যে কতখানি আসুরিক ক্ষমতার অধিকারী করেছি, একথা আমার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না। আমি তার সৃষ্টিকর্তা—কিন্তু দৈহিক প্রতিযোগিতায় আমি হব তার হাতে খেলার পুতুল মাত্র। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজে শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনিই কি শয়তানকে দমন করতে পেরেছেন?

রোগশয্যা ত্যাগ করবার পর আজ পর্যন্ত আমি যে শরীরী-দুঃস্বপ্নকে ভুলে ছিলুম, আবার সে আমাকে নতুন করে দ্বিগুণ বিক্রমে আক্রমণ করলে। একে একে আবার মনে পড়তে লাগল আমার সৃষ্টির আগেকার কল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ও সাধনার কথা; মূর্তিমান প্রেতের মতো গভীর রাত্রে গোরস্থানে গিয়ে রোমাঞ্চকর উপাদান সংগ্রহের কথা; তারপর সৃষ্টির নামে সেই কিম্ভূতকিমাকার অনাসৃষ্টির কথা; তারপর আমার সুখস্বর্গ থেকে যন্ত্রণার নরকে পতন-কাহিনি।

হায়রে আমার কপাল, নিজের হাতে সাক্ষাৎ অভিশাপের ও সর্বনাশের জীবন্ত মূর্তি গড়ে আজ আমি মানুষের শান্তির তপোবনে ছেড়ে দিয়েছি!

দানব আমার ভাইকে হত্যা করেছে। কিন্তু এই কি এর প্রথম হত্যা? আমার অজ্ঞাতসারে

এ কি আরও কতবার মানুষের রক্তে স্নান করেনি?

ঝড় বিদায় নিয়েছে। জলভরা মেঘ অদৃশ্য হয়েছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু সেই আলো ঝলমল বিশ্বে আমার চোখ অন্ধ।

নানারকম দুর্ভাবনা ভাবতে ভাবতে আবার বাড়িতে ফিরে এলুম। কী কষ্টে বিছানায় ছটফট করতে করতে সে রাত্রি কাটল, ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

প্রভাত হল—নবসূর্যের আনন্দ ধারা নিয়ে। কিন্তু আমার পক্ষে কী-বা রাত, কী-বা দিন। আমার প্রাণপাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে রইল নিরাশার বিষে। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তি আছে কার?

নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলুম বারংবার। মনে হল, ভাইয়ের রক্তে—নির্দোষ শিশুর রক্তে হাত আমার রাঙা হয়ে উঠেছে! আমারই হাতে তৈরি সাংঘাতিক রাক্ষস, আমি যদি পাগলামির খেয়ালে তার কুগঠিত মূর্তির মধ্যে জীবনদান না করতুম, তাহলে অশোক তো আজও হালকা বাতাসে উড়ন্ত সুন্দর প্রজাপতির মতন খেলা করে বেড়াত। পিঞ্জরের দ্বার খুলে রক্তলোভী হিংস্র পশুকে যে বাইরে ছেড়ে দেয়, যত কিছু হানাহানির জন্যে দায়ী তো সে নিজেই। অনুতাপে বুক যেন জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগল।

পুলিশ চারদিকে তন্নতন্ন করে খুনিকে খুঁজছে, বাবা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, আমি কিন্তু জেনে শুনেও আসল হত্যাকারীর কথা প্রকাশ করতে পারছি না। আমার এ যেন বোবার স্বপ্ন, প্রকাশ করবার কোনও উপায়ই নেই।

প্রকাশ করলে কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? যদি বলি, আমি জড়পিণ্ডকে জীবন্ত করবার উপায় আবিষ্কার করেছি এবং অশোকের হত্যাকারী হচ্ছে আমারই সৃষ্ট এক অতিকায় দানব, তবে কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে—এমনকি বাবাও ভাববেন, আমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। শেষটা হয়তো আমাকে বাস করতে হবে পাগলা গারদে। এত দুর্ভাগ্যের পর গারদে বাস করবার সাধ আমার হল না।

আমার স্বাস্থ্য আবার ভেঙে গেল। পাছে আবার কোনও মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হই, সেই ভয়ে বাবা কাতর হয়ে পড়লেন।

আমাকে বললেন, 'অজয়, তোমার বায়ু-পরিবর্তন করা উচিত। বিন্ধ্য পর্বতে আমার যে বাংলো আছে, কিছুদিন তুমি সেইখানে গিয়ে বাস করো। আপাতত আমার বাড়ি তোমার মন আর স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়।

প্রণব ও মমতাও সেই মত প্রকাশ করলে। আমিও আপত্তি করলুম না—কারণ এখানে থাকলে আমার সেই দুষ্টগ্রহের সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে, হয়তো সে শিকারি বাঘের মতন লুকিয়ে সর্বদাই আমার ওপরে পাহারা দিচ্ছে—আবার কোনও ধারণাতীত দুর্ভাগ্যের আয়োজন করবার জন্যে!

॥ অষ্টম ॥

দানব ও মানব

চমৎকার নির্জন বাংলো। পাশেই একটি ছোট্ট ঝরনা খানিক রোদের সোনা ও খানিক আমলকী বনের ছায়া মেখে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে পাথরে পাথরে সকৌতুকে লাফাতে লাফাতে নীচের দিকে কোথায় নেমে গিয়েছে চোখের আড়ালে। দূরে নীচে শ্বেত বালুতটের ফ্রেমেআঁটা গঙ্গাকে দেখাচ্ছে আঁকা ছবির মতো। বহুদূর থেকে মাঝে মাঝে জনতার ক্ষীণ একতান শোনা যায়—কিন্তু সে যেন অন্য জগতের কলগুঞ্জন! কাছে খালি নির্ঝরের সংগীত, তরুকুঞ্জের মর্মর-ছন্দ, প্রভাতি পাখির কাকলি, দুপুরের ঘুঘুদের ঘুমপাড়ানি সুর!

বাবা জানতেন, আমি জনতার অর্থহীন মুখরতাকে ভয় করি, তাই আমার দেহ ও মনের বিশ্রামের জন্যে যোগ্যস্থানই নির্বাচন করেছেন।

যাঁর রক্তমাংসে আমার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু গড়া, শিশুবয়স থেকে যিনি আমার সমস্ত সবলতা-দুর্বলতা, স্বাভাবিক ঝোঁক, হাবভাব, শিক্ষা-দীক্ষা লক্ষ করে আসছেন, পুত্রের চরিত্র তাঁর কাছে যে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগেরই মতন সহজ হবে, এজন্যে বিস্মিত হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সন্তানরা—বিশেষ করে পুত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন স্বাভাবিক সত্যটা বুঝতে পারে না। যৌবনের উদ্দামতায় আত্মহারা হয়ে তারা ভাবে, বাবা তো মিউজিয়ম-এর সেকেলে বিশেষত্ব, অতি-অগ্রসর একালের ধর্ম তিনি ধারণায় আনবেন কেমন করে? ছেলেরা যখন ঠাওরায় বাপকে ঠকালুম হারালুম, তখন আসলে ঠকে ও হারে যে তারা নিজেরাই, যুগে যুগে এ সত্যের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে যে কতবার, সে হিসাব কেউ রাখেনি। আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে এ সত্য পিতাদের পক্ষেই রায় দিয়েছে, তবু এখনও পুত্রদের বিশ্বাস—জন্মদাতাদের চেয়ে তারাই হচ্ছে বেশি বুদ্ধিমান।...

সেদিন অজানা পাখি আমার বাংলোর একটি জানলায় বসে নিজের ভাষায় প্রথম প্রভাতকে দিচ্ছিল সুন্দর অভিনন্দন।

তার কণ্ঠস্বরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু আমি বিছানার ওপরে উঠে বসতেই পাখি গেল পালিয়ে। মানুষকে কোনও জীবই বিশ্বাস করে না—সিংহ-ব্যাঘ্র পর্যন্ত তাকে ভয় বা শত্রু বলে সন্দেহ করে।

কিন্তু পাখি যে-গান গেয়ে গিয়েছিল, তার সুরের রেশ তখনও ঘুরছিল আমার ঘরের ভেতরে। বনের পাখির বনের গান ডাক দিয়ে গেল আমাকে ঘরছাড়া বনের পথে।

উঠে দেখলুম, গরম চা, এগ পোচ ও টোস্ট প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি প্রাতঃক্রিয়া সেরে, জামাকাপড় পরে, চা প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করে বেরিয়ে পড়লুম বাংলো থেকে।

মন যে কেন সেদিন অকারণে প্রফুল্ল হয়ে উঠল জানি না—বোধ করি নিয়তির ছলনা!

প্রতিদিনের মতো সেদিনও যদি-না বাংলোর বাইরে পা বাড়াতুম, তাহলে আজ হয়তো দেখা হত না আপনার সঙ্গে এবং আমাকেও বলতে হত না এই অভিশপ্ত জীবনের অবাস্তব কাহিনি।

আগেই বলেছি, এখানে বসে দূর থেকে গঙ্গাকে দেখাচ্ছিল আঁকা ছবির মতো—অচপল, জীবনহীন। তবু তার মধ্যে ছিল কবির সংগীত, চিত্রকরের মৌন স্বপ্ন। ...সেই দিকে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই পেরিয়ে চলে গেলুম অনেক দূর, অনেক দূর। মনকে সেদিন ছেড়ে দিয়েছিলুম আকাশে-বাতাসে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে, নিরুদ্দেশের যাত্রীর মতো। আমি যেন পৃথিবীর মাটি-ভোলা স্বপ্নলোকের পথিক!

কিন্তু হায়, আচম্বিতে হল স্বপ্নভঙ্গ। ছিঁড়ে গেল আমার প্রাণের বীণার তার।

দূর থেকে একটা মূর্তি হনহন করে এগিয়ে আসছে আমার দিকেই। মাঝে মাঝে সে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সে এক-একটা দশ-বারো ফুট উঁচু পাথরের ঢিপি এক এক লাফে অত্যন্ত অনায়াসে পার হচ্ছে! মূর্তিটা মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ বড়ো! চিনতে দেরি লাগল না। বুকটা ধড়াস করে উঠল! সেই শয়তান!

রাগে সারা শরীর জ্বলতে লাগল। ও কেন এদিকে আসছে? আমার কাছে কী চায় ও?

স্থির করলুম, নিজের হাতে যে মূর্তি গড়েছি, আজ নিজের হাতেই তাকে ধ্বংস করব! ওকে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম।

সে কাছে এল। তার অপার্থিব কুৎসিত মুখে মাখানো অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের এবং সেইসঙ্গেই তিক্ত যন্ত্রণার ভাব। কিন্তু রাগের মাথায় ওসব আমি ভালো করে লক্ষ করলুম না।

চিৎকার করে বললুম, 'পিশাচ! কোন সাহসে তুই আমার সামনে এসেছিস? আমার প্রতিহিংসার ভয়ে তোর বুক কাঁপছে না?'

মৌনমুখে সে আমার আরও কাছে এল।

'দূর হ নরকের কীট! না, না, দাঁড়া! আমার পায়ের তলায় তোকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দি!'

দৈত্যটা বললে, 'আমি এইরকম অভ্যর্থনারই আশা করছিলুম। হতভাগ্যকে সবাই ঘৃণা করে—আর আমার মতন হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কিন্তু ওগো আমার স্রষ্টা, আমি যে তোমারই হাতে গড়া জিনিস, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন যে অচ্ছেদ্য,—তুমিও কি আমাকে ঘৃণা করবে? তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও—এ কথা বলতে তোমার মুখে বাধল না? আমার প্রতি তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো, তাহলে আমিও তোমার আর মনুষ্যজাতির প্রতি আমার কর্তব্য পালন করব। যদি শান্তি চাও, আমার কথা শোনো। নইলে যতক্ষণ তোমার আত্মীয়-বন্ধুদের দেহে রক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমি পূর্ণ করব মৃত্যুর উদর!

ক্রোধে অধীর কণ্ঠে বললুম, 'ঘৃণ্য রাক্ষস! শয়তান! তোর পক্ষে নরক-যন্ত্রণাও তুচ্ছ শাস্তি। তোকে সৃষ্টি করেছি বলে তুই আমাকে দোষ দিচ্ছিস? আয় তবে, যে দীপ জ্বেলেছি, নিবিয়ে দি এখুনি!'—বলেই আমি তার ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়লুম।

সে খুব সহজেই আমাকে এড়িয়ে বলল, 'শান্ত হও। মিনতি করি আমার কথা শোনো। আমি যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করেছি, আমার দুঃখ আরও বাড়িয়ো না। হ্যাঁ, দুঃখময় আমার জীবন, কিন্তু সে-জীবনও আমার কাছে প্রিয়। তুমি আমাকে আক্রমণ করলে আমিও বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষা করব। মনে রেখো, তুমি আমাকে গড়েছ তোমার চেয়ে বলবান করে—আকারেও আমার কাছে তুমি বামনের মতো। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করতে চাই না। আমি হচ্ছি তোমারই দাস—তোমারই সৃষ্টি। তুমি আমার রাজা, আমি তোমার প্রজা। আমাকে তুমি পদদলিত কোরো না। আমি তোমার কাছে সুবিচার চাই। এই দুনিয়ার চারদিকেই আনন্দের হাসি, নিরানন্দের কান্না খালি আমার বুকে। প্রথমে আমার স্বভাব ছিল মিষ্টি, শান্ত, সদয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাকে আজ করে তুলেছে দানব। আমাকে সুখী করো আমিও হব সুচরিত্র।'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'না, না, না! দূর হ! তোর কোনও কথাই আমি শুনব না। তোর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই থাকতে পারে না। আমরা শত্রু। হয় দূর হ, নয় লড়াই কর—বেঁচে থাকুক খালি আমাদের একজন।'

দৈত্য কাতর কণ্ঠে বললে, 'কেমন করে আমি তোমার মন ফেরাব? প্রভু, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমার মনে ছিল প্রেম, উদারতা, মনুষ্যত্ব। কেবল মানুষের অবহেলাই আমার প্রকৃতিকে জঘন্য করে তুলেছে। ভেবে দ্যাখো। আমার স্রষ্টাই যখন আমার প্রতি বিরূপ, তখন অন্য মানুষদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারি! এই বিপুল জগতে আমি একাকী—আমি একাকী। সংসারে-সমাজে-গ্রামে-নগরে আমার ঠাঁই নেই—আমি হচ্ছি বনজঙ্গল-পাহাড়ের জীব! আমার বন্ধু আকাশ-বাতাস, মানুষের চেয়ে তারা দয়ালু। মানুষরা যদি আমার সন্ধান পায় তাহলে দল বেঁধে আমাকে হত্যা করতে ছুটে আসে। মানুষ আমার শত্রু, আমিই-বা মানুষের বন্ধু হই কেমন করে? প্রভু, আগে আমার কাহিনি শোনো, তারপর বিচার করো।'

আমি বললুম, 'যেদিন তুই জন্মেছিলি, সে দিনকে অভিশাপ দি। আমার যে হাত তোকে গড়েছে, তাকেও আমি অভিশাপ দি।'

দানব বলল, 'তবু আমার কাহিনি শোনো।'

অগত্যা আমাকে রাজি হতে হল।

॥ নবম ॥

দৈত্যের আত্মকথা

আমার জন্মমুহূর্তের কথা ভালো করে স্মরণ হচ্ছে না। সে যেন অস্পষ্ট স্বপ্ন!

শব্দ পেলুম, গন্ধ পেলুম, স্পর্শ পেলুম। চোখও ফুটল। কিন্তু আলোর কী তীব্রতা! আবার চোখ মুদলুম—অমনি ডুবে গেলুম অন্ধকারে। আবার চোখ খুলে পেলুম আলোর ধারা।

উঠলুম। পাশের ঘরে গিয়ে তোমার দেখা পেলুম। কেমন করে জানি না, মন তখনই তোমাকে চিনে ফেললে আমার ঈশ্বর বলে। কিন্তু তুমি আমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে চলে গেলে কোথায়!

তারপর সবিস্ময়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম। রাস্তায় ছিল না জনপ্রাণী। হাঁটতে হাঁটতে শহর ছাড়িয়ে পেলুম মাঠ। তারপর বন। তখন তেষ্টা পেয়েছে, খিদে পেয়েছে। বনে ছিল ফল, নদীতে ছিল জল। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

যখন জাগলুম, তখনও অন্ধকারের ঘোর কাটেনি। বিষম শীত করতে লাগল। কোথাও আশ্রয় নেই, বন্ধু নেই। মনে জাগল কেমন একটা ভয়ের ভাব। নিজেকে কী অসহায় বোধ হল। একা বসে কেঁদে ফেললুম।

তারপর দেখলুম জীবনের প্রথম সূর্যোদয়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম। আমার নিশ্চেষ্টতা ঘুচে গেল। উঠে গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে লাগলুম।

কিন্তু তখনও আমি ভালো করে কিছু বুঝতে পারছিলুম না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আলো-অন্ধকার অনুভব করছি, চারদিকে শুনছি নানা ধ্বনি, বাতাসে পাচ্ছি ফুল-মাটি-বনের গন্ধ—এইমাত্র!

এমনিভাবে কেটে গেল কয়েকটা দিন। তারপর, একে একে পৃথিবীর রহস্য এবং কার্য ও কারণ সম্বন্ধে আমার মন সজাগ হয়ে উঠল।

গাছে গাছে পাখির ডাক ভারী মিষ্টি লাগল। একদিন খেয়াল হল, আমিও অমনি ধ্বনির সৃষ্টি করব। কিন্তু পারলুম না—আমার গলা থেকে বেরুল কীরকম একটা কর্কশ অব্যক্ত শব্দ। নিজের গলা শুনে নিজেরই ভয় হল আমি একেবারে চুপ মেরে গেলুম!

ক্রমেই জানতে পারলুম—দিনের পর রাত আসে আর রাতের পরে আসে দিন, সূর্য ডুবলে চাঁদ ওঠে, চাঁদ মিলোলে সূর্য ওঠে; কোকিলের স্বর মধুর, কাকের ডাক কর্কশ, জড় নড়ে না, গাছেরা জড়ও নয় জীবও নয় প্রভৃতি আরও অনেক কিছু!

একদিন বনের পথে চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলুম, রাঙা টকটকে কী একটা সমুজ্জ্বল জিনিস। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শীতার্ত দেহে লাগল তপ্ততার আরাম! খুশি হয়ে জিনিসটাকে স্পর্শ করতেই সে আমাকে এমনি কামড়ে দিলে যে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম।

একই জিনিস দেয় আরাম ও যাতনা। সেইদিন থেকে চিনলুম আগুনকে। ক্রমে তার ব্যবহারও শিখলুম।

কিছুদিন পরে সে বনে হল ফলের অভাব। খালি জল খেয়ে তো জীব বাঁচতে পারে না। ক্ষুধার তাড়নায় দেহ অস্থির হয়ে উঠল। বনের আশ্রয় ছেড়ে আবার খোলামাঠে বেরিয়ে পড়লুম।

সেখানেও খাবার নেই। মাঠ পেরিয়ে একখানা গ্রামের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। একখানা কুটির চোখে পড়ল। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি, এক বুড়ি বসে বসে রান্না করছে।

আমার পায়ের শব্দে চমকে বুড়ি মুখ ফেরালে। সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ কপালে তুলে ভয়ানক চেঁচিয়ে সে এমন আশ্চর্য দৌড় মারলে যে, নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতে পারতুম না। অত বুড়ি অত জোরে দৌড় মারতে পারে!

বুড়ি ভাত নামিয়েছে, ডাল ও তরকারি রেঁধেছিল। তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে সমস্ত সাবাড় করে ফেললুম। তারপর দিব্যি আরামে উনুনের ধারে বসে আগুন পোয়াচ্ছি, এমন সময়ে বাইরে উঠল এক বিষম গোলমাল!

ব্যাপার কী দেখবার জন্যে বেরিয়ে এলুম। চারদিকে মস্ত জনতা, এদিকে-ওদিকে যেদিকেই তাকাই, কেবল মানুষের পর মানুষ। সবাই উত্তেজিত, সবাই চিৎকার করছে! আমি বাইরে আসতেই বেশিরভাগ লোকই পালিয়ে গেল, কিন্তু বাকি মানুষগুলো আমাকে টিপ করে ক্রমাগত ছুড়তে লাগল ইট-কাঠ-পাথর! বেগতিক দেখে আমি দিলুম টেনে লম্বা!

আমার আর একটা শিক্ষা হল। বুঝলুম, মানুষ আমার বন্ধু নয়। সেইদিন থেকে দিনের বেলায় আর মানুষের কাছে যেতুম না।

দিনের পর দিন কাটে। দু-চার বার ঝড়-বৃষ্টির পাল্লায় পড়ে কষ্ট পেলুম। মনে হল, মানুষের মতন আমারও যদি একটা ঘর থাকত, তবে কী সুবিধাই হত। কিছুদিন পরে একটা সুযোগও জুটল। এক রাত্রে একখানা পুরোনো ভাঙা খালি বাড়ি পেলুম। লুকিয়ে তার ভেতরে ঢুকে বাঁধলুম বাসা। দিনের বেলায় সেখানে শুয়ে শুয়ে ঘুমুতুম আর রাতের অন্ধকারে বাইরে এসে করতুম খাবারের সন্ধান। এই শূন্য বাড়ির ভেতরেই আমার নতুন শিক্ষা শুরু হল!

আমার বাড়ির পাশেই ছিল একখানা ছোটো বাড়ি, দুই বাড়ির মাঝখানে ছিল কেবল হাত-তিনেক চওড়া একটা গলি।

আমি দোতলার যে ঘরখানি ব্যবহার করতুম, তার জানলাগুলো বন্ধ করে রাখতুম—ধরা পড়বার ভয়ে। কিন্তু সেই পুরোনো বাড়ির প্রত্যেক জানলাই ছিল ভাঙা ঝরঝরে। ফাটা পাল্লায় চোখ লাগালে পাশের বাড়ির দোতলার দুটো ঘর দেখা যেত, ও বাড়ির ওপরে দু-খানার বেশি ঘরও ছিল না।

চমৎকার আওয়াজ শুনে উঠে গিয়ে দেখি, একটি অতিপ্রাচীন মানুষ আপন মনে বসে

বসে কী একটা যন্ত্র নিয়ে কী করছেন, আর সুমধুর ধ্বনিতে চারদিক মিষ্টি হয়ে উঠছে। পরে জেনেছি ও যন্ত্রটির নাম বেহালা।

প্রাচীনের কী সুন্দর মূর্তি। মাথায় ধবধবে সাদা রুপোর মতন চিকন লম্বা চুল, মুখেও সাদা লম্বা দাড়ি, গায়ের রংও শুভ্র। তাঁর শান্ত মুখখানি দেখলেই ভক্তি হয়।

তারপরেই চোখ পড়ল প্রাচীনের পাশের দিকে। সেখানে বসে আছে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে, বয়স হবে পনেরো-ষোলো। মেয়েটি আদরমাখা চোখে প্রাচীনের দিকে চেয়ে একমনে বাজনা শুনছিল।

খানিক পরেই ঘরের ভেতরে একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে এসে দাঁড়াল। তাকেও দেখতে অতি সুন্দর।

বাজনা থামল। তারা তিনজনে মিলে কথা কইতে আরম্ভ করল।

কী বিস্মিতই যে হলুম! তখনও জানতুম না কথা বা ভাষা কাকে বলে! আমি নিজে তখনও কথা কইতে শিখিনি—কথা বলতে বুঝতুম শুধু অর্থহীন শব্দ!

কিন্তু বেশ আন্দাজ করতে পারলুম এরা মুখ দিয়ে যে-সব শব্দ বের করছে সেগুলো যা-তা বা অর্থহীন নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই আরও বুঝলুম, কোনও কোনও শব্দের পরেই তারা হাসে বা দুঃখিত হয় বা অন্যরকম ভাব প্রকাশ করে। ভাবলুম, বাঃ, এ তো ভারী ভালো ব্যাপার।

প্রভু, তোমার কাছ থেকে আমি ভাষা শিখিনি বটে কিন্তু তোমার প্রসাদে আমি পেয়েছি আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি! বোধহয় আমার মতন স্মৃতিশক্তি কোনও মানুষেরই নেই। যে-কথা আমি একবার শুনি তা আর কিছুতেই ভুলি না।

রোজ মন দিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতুম আর মনে মনে বোঝবার চেষ্টা করতুম। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধা হত, তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে শব্দরহস্য স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল।

কেবল কানে শোনা নয়, প্রত্যেক শব্দ আমিও উচ্চারণ করবার চেষ্টা করতুম। এইভাবে কিছুকাল অভ্যাসের পর ক্রমে ক্রমে আমি কথা কইবার শক্তিও অর্জন করলুম।

এক বছর চেষ্টার পর ভাষার ওপরে আমার মোটামুটি দখল হল। কিন্তু এসব হচ্ছে পরেকার কথা।

প্রথম দিনেই এই সুখী পরিবারটিকে আমার বড়ো ভালো লাগল। কী চমৎকার এদের দেখতে, কেমন মিষ্টি এদের ব্যবহার! অন্ধকার ঘরে ধুলো ভরা মেঝের ওপরে শুয়ে শুয়ে কেবল এদের কথাই ভাবতে লাগলুম। মনের ভেতরে প্রবল ইচ্ছা জাগল, ওদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে। কিন্তু প্রথম দিনেই মানুষদের কাছে গিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা আর ভোলবার নয়। কাজেই সাহস হল না, মনের ইচ্ছা মনেই রইল।

আপাতত ওদের লক্ষ করেই দিন কাটতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে বোঝা গেল, প্রাচীন ব্যক্তিটি হচ্ছেন ঠাকুরদাদা আর ছেলে-মেয়ে দুটি তাঁর নাতি-নাতনি। প্রাচীনের স্ত্রী নেই আর ওদের মা-বাপ বেঁচে নেই। ওরা বড়োই গরিব। মেয়েটি একলাই সংসারের সব কাজ ও দাদুর সেবা করত। ছেলেটি রোজ সকালে খেয়েদেয়ে কোথায় চাকরি করতে যেত—ফিরত সেই বিকালে। তারপর বোনকে নিয়ে রোজ একবার করে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বেড়িয়ে আসত। ক্রমে জানলুম ছেলেটির নাম মাধব আর মেয়েটির নাম মাধবী।

দাদুকে বিশেষ চলা-ফেরা করতে দেখতুম না। প্রায় সারাদিনই তিনি জানলার ধারে বসে থাকতেন। যখন চলতেন তখনও কেমন যেন বাধো বাধো পায়ে হাঁটতেন। বেশির ভাগ সময়েই মাধব কি মাধবী তাঁর হাত ধরে তাঁকে বাইরে নিয়ে যেত। প্রথমে এর কারণ বুঝিনি—তারপর আবিষ্কার করলুম, দাদু চোখে একেবারেই দেখতে পান না! তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমার মন করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠত।

দাদুর বেশি সময় কাটত বেহালা বাজিয়ে। কী নিপুণ হাত তাঁর! আমার কানে আর প্রাণে ঝরত যেন স্বর্গীয় সুরের অমৃত! তাঁর বেহালার তান শুনলে আমি পৃথিবীর আর সব ভুলে যেতুম।

যখন ভাষা শিখলুম, তখন নিজে আড়ালে থেকে অনেক ছোটো ছোটো ব্যাপারে আমি তাদের উপকারে লাগবার চেষ্টা করতুম।

মাধব রোজ সকালে উঠে তাদের বাড়ির পিছনকার বন থেকে নিজে কাঠ কেটে আনত। সেই কাঠ জ্বালিয়ে তাদের রান্না হত।

একদিন করলুম কী, রাত-আঁধারে বনে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে মস্ত একবোঝা কাঠ এনে তাদের সদর দরজার সামনে ফেলে রেখে এলুম।

পরের দিন দরজা খুলে এই কাঠের বোঝা দেখে মাধব ও মাধবী বিস্ময়ে অবাক! তারপর এমনি ব্যাপার যখন নিত্যিই হতে লাগল, তখন তারা রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেল। এই কথা শুনে দাদুও কম অবাক হলেন না। তাদের এই বিস্ময়ের ভাবটি আমি উপভোগ করতুম। শেষটা রহস্য বোঝবার চেষ্টা তারা ছেড়ে দিল।

মাঝে মাঝে ফলমূল শাক-শবজি পেলেও এনে দিতুম। দাদু বলতেন, 'আমরা গরিব বলে আমাদের ওপরে বোধহয় বনদেবতার দয়া হয়েছে।'

মাধব বলত, 'এসব ভূতুড়ে কাণ্ড।'

মাধবী বলত, 'যে-ভূত এত উপকার করে তাকে দেখলেও আমি ভয় করব না!'

শুনে আমার মনে আশা জাগত। ভাবতুম, একদিন হয়তো ওদের সঙ্গে আমারও বন্ধুত্ব হবে! এ কথা ভাবলেও বন্ধুহীন আমার মনে জেগে উঠত পরম সান্ত্বনার ভাব।

একদিন সন্ধ্যার সময় ওদের বাড়িতে এল একটা মহা কুৎসিত লোক। যেমন কালো,

তেমনি মোটা, তেমনি বেঁটে। ম্লান দীপের আলোতে তার মুখের কদর্যতা আমার নজর এড়াল না।

কথাবার্তা শুনে বুঝলুম, দাদু কবে এর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন, ও তাই আদায় করতে এসেছে।

দাদু কাতর স্বরে বললেন, 'মশাই. আর কিছুদিন সবুর করুন। আপাতত আমার অবস্থা তো দেখছেন, এখন টাকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আর কিছুদিন যাক, মাধবের মাইনে বাড়ুক, তারপর মাসে মাসে আপনার টাকা শোধ করব।'

লোকটা গর্জন করে বলে উঠল, 'না, না—আমি আর সবুর করব না। তোমাকে এক মাস সময় দিলুম, এর মধ্যে যদি টাকা না পাই, এ বাড়ি থেকে তোমাকে তাড়িয়ে তবে ছাড়ব!'

সর্বনাশ, দাদু আর মাধব মাধবীকে যদি এখান থেকে বিদায় করে দেয়, তাহলে আমার হাল কী হবে? দুঃখের সাগরে এইটুকু আমার সুখের দ্বীপ, শেষটা কি এর থেকেও বঞ্চিত হব?

দারুণ ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। তখন রাত্রিকাল, আকাশে ফুটেছে চাঁদের আলো।

পাওনাদার যখন রাস্তায়, আমি এক দৌড়ে রুদ্র মূর্তিতে তার সুমুখে গিয়ে হাজির। আমাকে দেখেই তার চক্ষুস্থির, দারুণ আতঙ্কে সে কেবল ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল—একবার চ্যাঁচাতেও পারলে না।

আমি ক্যাঁক করে তার গলা চেপে ধরে তাকে বিড়াল বাচ্চার মতন শূন্যে তুলে দু-একটা ঝাঁকানি মেরে মাটির ওপরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললুম, 'আমি হচ্ছি দাদু আর মাধব-মাধবীর বন্ধু! দাদুকে এ বাড়ি থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলে তোকে খুন করে ফেলব।' এই বলেই অদৃশ্য হলুম।

পরের দিনেই এই ঘটনার কথা বোধহয় ও-বাড়ির সকলের কানে উঠল। কারণ আমি শুনলুম, দাদু উত্তেজিত ভাবে বলছেন, 'বনদেবতা, বনদেবতা! আমাদের ওপরে বনদেবতার দয়া হয়েছে!'

মাধব বলল, 'আশ্চর্য ভূত!'

মাধবী বলল, 'এমন ভালো ভূতকে আমি প্রণাম করি।'

আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ আর একটা ভীষণ আবিষ্কার করলুম।

একদিন একটি নদীর দিকে তাকিয়ে দেখি, জলের ভেতরে ভয়ঙ্কর একটা মূর্তি। সেই রাক্কুসে মূর্তিটা দেখেই প্রথমটা ভয়ে আমি চমকে উঠলুম। কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারলুম, জলে পড়েছে আমারই ছায়া। আমার চেহারা এমন ভয়াবহ। সমস্ত প্রাণমন হা হা করে উঠল। কিন্তু তখনও আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি, এই চেহারার জন্যে আমার অদৃষ্টে আরও কত দুর্ভোগ লেখা আছে!

একটি সুন্দর সন্ধ্যা। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। বসন্ত-বাতাসে ফুলের আতর।

মাধবীকে নিয়ে মাধব বেড়াতে বেরিয়েছে। দাদু জানলার ধারে একলা বসে বেহালার তারে করছেন অপূর্ব সুরসৃষ্টি—তাঁর মুখের ওপরে এসে পড়েছে চাঁদের আলো।

সুর শুনতে শুনতে আমার বুকটাও যেন ভরে উঠল বাসন্তী জ্যোৎস্নায়। প্রাণের আবেগে নিজের ভয়াবহ কদর্যতার কথাও ভুলে গেলুম।

মনে হল, এই হচ্ছে দাদুর সঙ্গে ভাব করবার উপযুক্ত সময়। দাদু একলা, তিনি চোখেও দেখতে পান না। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি!

আমি একেবারে ও বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দাদুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমার ভারী পায়ের শব্দ দাদুর কানে গেল। বাজনা থামিয়ে তিনি বললেন, 'কে?'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'আমি বিদেশি। আপনার কাছে একটু বসতে পারি কি?'

মধুর হাসিমাখা মুখে দাদু স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়! ভেতরে আসুন। ওই চেয়ারে বসুন।'

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকে চেয়ারে না বসে দাদুর কাছেই বসে পড়লুম। কিন্তু কী বলে কথা আরম্ভ করব বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলুম।

দাদু বললেন, 'আপনি বিদেশি হলেও আপনার কথা শুনে বুঝছি, আপনি বাঙালি।'

আমি বললুম, 'আমি বাঙালি নই, তবে বাংলা বলতে শিখেছি বটে।'

'কার কাছে শিখেছেন?'

'বাঙালিরই কাছে। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক—আমার অন্য কথা আছে।'

'বলুন।'

'দেখুন, আমি কেবল বিদেশি নই—আমি বড়ো হতভাগ্য লোক। আমি সমাজচ্যুত—জাতিচ্যুত। কেউ আমাকে দু-চোখে দেখতে পারে না।'

'বিদেশি, আপনার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে দুঃখিত হলুম।'

'আমি একটি বাঙালি পরিবারকে ভালোবাসি—যদিও সে পরিবারের কেউ আমাকে চেনে না। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তাদের কাছে গেলে যদি তারাও আমাকে ত্যাগ করে! তাদের হারালে আমি পৃথিবীর সব হারাব!'

দাদু বিস্মিত ভাবে অল্পক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বিদেশি, হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আপনার বন্ধুরা নিশ্চয়ই আপনাকে ভুল বুঝবেন না। তারা লোক কেমন?'

'খুব ভালো। কিন্তু আর সকলের মতন তারাও হয়তো কেবল চোখে দেখেই আমাকে বিচার করবে।'

'আপনার বন্ধুরা কোথায় থাকেন?'

'এইখানেই।'

'এইখানেই।'

'হ্যাঁ। দাদু, আপনিই আমার বন্ধু। আমি বড়ো অভাগা, আমার ওপরে দয়া করুন'—বলেই আমি দুই হাতে দাদুর হাত চেপে ধরলুম।

দাদু বিস্মিত চকিত স্বরে বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য, কে আপনি?'

আমি কোনও জবাব দেওয়ার আগেই ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল মাধব ও মাধবী! আমাকে দেখেই তাদের মুখের ভাব হল যেরকম, তা আর বর্ণনা করা অসম্ভব, মাধবী তখনই অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপরে পড়ে গেল। মাধব ঘরের কোণ থেকে একগাছা মোটা লাঠি তুলে নিয়ে মরিয়ার মতন ছুটে এসে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার পর লাঠির পর লাঠি মেরে আমার সর্বাঙ্গ জর্জরিত করে তুলল।

ইচ্ছা করলে আমি একটিমাত্র আঘাতে মাধবের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিতে পারতুম। কিন্তু সে ইচ্ছা আমার হল না। দেহে এবং মনে একসঙ্গে দারুণ আঘাত পেয়ে দাদুর ঘর থেকে আমি বেগে বেরিয়ে এলুম।

॥ দশম ॥

দৈত্যের আত্মকথা চলছে

কেন আমি বেঁচে আছি? এ অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী?

কে আমি? কোথা থেকে আমি এসেছি? মানুষরা আমাকে এত ঘৃণা করে কেন?

ঘৃণা! আমি দিতে চাই প্রেম, আর ওরা করবে ঘৃণা! কেন, কেন, কেন?

প্রচণ্ড ক্রোধে ফুলতে ফুলতে এক-একবার মনে হতে লাগল, দি বাড়িসুদ্ধু ওদের ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে ধুলোয় ধুলো করে মিশিয়ে। ওরা যখন করুণ আর্তনাদ করবে, আমি করব তখন উৎকট আনন্দে আকাশ ফাটানো চিৎকার। হ্যাঁ, সে শক্তি আমি রাখি!

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলুম।

প্রভু, তারপর স্মরণ হল তোমাকে। কেন জানি না, মনে হল আমার জন্মের সঙ্গে কোনও রহস্য জড়ানো আছে। আমি পৃথিবীর কোনও মানুষেরই মতন দেখতে নই কেন? মানুষরা আমায় দেখলেই ভয় পায় কেন? তবে কি আমি মানুষ নই? বুঝলুম, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো কেবল তুমি। তৎক্ষণাৎ তোমার সন্ধানে ছুটে চললুম।

আবার সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম—যেখানে প্রথম আমি চোখ মেলে তাকিয়েছিলুম।

রাত তখন অনেক! আমি পা টিপে টিপে তোমার শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

উঁকি মেরে দেখলুম, তুমি একটা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছ আর দু-পাশে বসে আছে দুজন অচেনা লোক।

হঠাৎ তুমি চিৎকার করে বলে উঠলে, 'এ আমার অদ্ভুত আবিষ্কার। জড়পিণ্ডকে আমি জীবিত করতে পারি। মাটির তাল থেকে গোরস্থানের অস্থি-পিঞ্জর কুড়িয়ে আমি গড়েছি নতুন জাতের এক বৃহৎ মানুষ! আমি হচ্ছি সৃষ্টিকর্তা! আমি মানুষ গড়েছি—না, না, মানুষ গড়তে গিয়ে আমি গড়েছি প্রকাণ্ড এক দৈত্য, আমি গড়েছি মূর্তিমান অভিশাপ!'

কে বললে, 'ডাক্তার, অজয় আবার বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকতে শুরু করলে।'

উত্তরে ডাক্তার কী বললে তা আমার কানে গেল না। যেটুকু শুনেছি আমার পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট! আবার ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠবার ইচ্ছা হল, কিন্তু প্রাণপণে সে ইচ্ছা সামলে সেখান থেকে আমি পালিয়ে এলুম!

একেবারে গভীর অরণ্যে! কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে কালো রাত্রি। আকাশের অন্ধকারে সঙ্গে মিশল গিয়ে আমার মনের অন্ধকার। ঝোড়ো বাতাসে সারা অরণ্য করছে গভীর গর্জন। কিন্তু সেই মর্মর গর্জনে জেগে উঠল আমার আহত রক্তাক্ত হৃদয়ের অশান্ত চিৎকার। বনে বনে ছুটে বেড়াই আর করি প্রচণ্ড হাহাকার!

তাহলে আমি মানুয নই? আমার এ কৃত্রিম দানব দেহ বহন করছে ক্ষুদ্র মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম জীবন? আমার স্রষ্টারও মতে আমি হচ্ছি একটা মূর্তিমান অভিশাপ? প্রভু, তোমাকে হাতের কাছে পেলে আমি কী করতুম জানি না—কারণ তখন আমার মনে হচ্ছিল, অরণ্যের গাছগুলোকে পর্যন্ত দুই হাতে উপড়ে ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে দি আকাশে-বাতাসে। সেইদিন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, আমি যখন মানুষ নই তখন মনুষ্য-জাতির কারুকেই আর দয়া ক্ষমা করব না। আর যে স্রষ্টা নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে আমাকে এই অভিশপ্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছেন, তাঁকেও আমি দেব উপযুক্ত শাস্তি!

সারারাত দাপাদাপি করে ভোরের দিকে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেহ আমার পীড়িত হলেও মন হয়েছে কতকটা প্রকৃতিস্থ। বসে বসে ভাবতে লাগলুম, নিজের জন্মরহস্য তো বুঝেছি, এখন আমার কী করা উচিত? মানুষের সমাজে আর আমার আশ্রয় নেই, কিন্তু আমার সমাজ কোথায়? সাধারণ দানব-দৈত্যদেরও সমাজ আছে—কিন্তু আমি যে অসাধারণ! এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে আমি যে সম্পূর্ণ একাকী!

কিছুই স্থির করতে পারলুম না। কেবল এইটুকুই মনে করে রাখলুম, মানুষের ছায়াও আর মাড়াব না—মানুষের কাছে আর আমার কিছুই প্রাপ্তির আশা নেই। আমি হচ্ছি অন্ধকারের আত্মা—আমার ঠাঁই জীবরাজ্যের বাইরে।

তারপর আরম্ভ হল আমার নিরুদ্দেশ যাত্রা। আজ যেখানে থাকি কাল সেখান থেকে চলে যাই অনেক দূরে। এক জায়গায় বসে দু-দিনের সূর্যোদয় দেখবার ধৈর্য আমার নেই—

এমনি আমার পথের নেশা! আমি যেন ঝোড়ো হাওয়া—হু হু শ্বাসে বিশ্বময় ছুটে বেড়ানোই আমার ধর্ম!

অজানা পথের পথিক হওয়ার সুযোগ পাই কিন্তু কেবলমাত্র রাত্রিবেলায়। মানুষ হচ্ছে দিনের আলোকের জীব, তাদের সঙ্গে চোখাচোখি করবার সাধ নেই।

সমস্ত মধুর অনুভূতি আমার লুপ্ত হয়ে গেল। আমার কাছে সূর্য উত্তাপহীন, চন্দ্র জ্যোৎস্নাহীন, আকাশ নীলিমাহীন, পুষ্পলতা বর্ণহীন। সারা পৃথিবীকে আমি দি অভিশাপের-পর-অভিশাপ! দেহের ভেতরে সর্বদাই জাগে জ্বরের জ্বালা, মনের ভেতরে সর্বদাই মাথা খোঁড়ে অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসার নিষ্ফল আক্রোশ, দৃষ্টি দেখে সর্বদাই ধ্বংসের উৎসব! আমার স্বভাবের সমস্ত সৎগুণ নষ্ট হয়ে গেল—দিনে দিনে আমি হয়ে উঠলুম দানবেরও পক্ষে ভীতিকর মহাদানব!

একদিন এক জায়গায় আমি ভুল করে একটু সকাল সকাল—অর্থাৎ সন্ধ্যার একটু আগে পথে বেরিয়েছিলুম। জায়গাটি নির্জন ছিল বলে ভেবেছিলুম, হয়তো ঘৃণ্য মানুষের সঙ্গে দেখা হবে না।

নদীর ধারে দেখলুম একটি বাগানের মতন রঙিন ঠাঁই। প্রভু, তুমি আমাকে মানুষ করে গড়োনি, কিন্তু আমার বুকে দিয়েছ দুর্বল মানুষের মন। সেদিনের সবে ওঠা চাঁদ, সুগন্ধ বাতাস আর নদীর কলতান মুহূর্তের জন্যে আমার মনকে করলে অভিভূত। হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে পৃথিবীকে কেমন মিষ্টি লাগল।

পৃথিবীকে মিষ্টি লাগার ফল কিন্তু ভালো হল না। আমি বরাবরই লক্ষ করে দেখেছি এমন বিকৃত কৃত্রিম ভাবের মধ্যে আমার জন্ম যে, মনের মধ্যে মাধুর্য এলেই আমাকে পেতে হয় দুর্ভাগ্যের আঘাত!

একটা ঝোপের পাশে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালুম, এমন সুন্দর সন্ধ্যায় মানুষরা কী করছে দেখবার জন্যে।

হঠাৎ একটি ছোট্ট খোকা খেলা করতে করতে আমার সামনে ছুটে এল।

ভাবলুম, এই তো অবোধ শিশু, এর বুকের ভেতরে হয়তো এখনও মানুষী-ঘৃণার জন্ম হয়নি, একে একটু আদর করি।

আমি শিশুর হাত চেপে ধরতেই সে মহা ভয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ভূত! রাক্ষস! ছেড়ে দে—ছেড়ে দে আমাকে।' তার হাত থেকে একখানা ছবি মাটির ওপরে পড়ে গেল।

ছবিখানার দিকে চোখ পড়তেই চিনলুম, তাতে রয়েছে তোমার মূর্তি! হ্যাঁ, তোমার—আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রুর মূর্তি! পরমুহূর্তে আমার মন থেকে সমস্ত মধুর দুর্বলতা মুছে গেল—আবার ফিরে এল আমার দানবত্ব!

কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওখানা কার ছবি?'

শিশু ছটফট করতে করতে বললে, 'আমার দাদার। ছেড়ে দে আমাকে, নইলে বাবাকে ডাকব!'

আমার চিরশত্রুর ভাই এই শিশু! নিজের অজ্ঞাতসারেই তার কণ্ঠের ওপরে আমার হাতের চাপ কঠিন হয়ে উঠল, তারপর শিশুর মৃতদেহ পড়ল আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে!

সেই শিশুর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে অনুভব করলুম নরকের প্রচণ্ড উৎসব। দুই হাতে তালি দিয়ে বিপুল আনন্দে বলে উঠলুম, 'আমিও তাহলে ধ্বংস করতে পারি! শত্রু তাহলে আমার নাগালের বাইরে নেই—এই শিশুর মৃত্যুই এ সত্য তাকে বুঝিয়ে দেবে। এর পরেও তার জন্যে তোলা রইল আরও অনেক শাস্তি। তারপর শত্রু নিপাত।'

তারপর কিছুকাল আমি আর সে দেশ ত্যাগ করলুম না। কারণ আমার মন বললে, এইখানেই আবার আমার নির্দয়, নির্বোধ সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

মন ভুল বলেনি। একদিন তোমার দেখাও পেলুম। কিন্তু সেদিন আমি তোমার সামনে যাইনি।

তবে তারপর আর তোমাকে আমার চোখের আড়ালে যেতে দিইনি। দিন-রাত আড়াল থেকে রেখেছি তোমার গতিবিধির ওপরে তীক্ষ্নদৃষ্টি!

কেন? সেই কথা বলবার জন্যেই আবার এসেছি তোমার কাছে। প্রভু, এই শিশুহত্যা—অর্থাৎ আমার এই প্রথম অপরাধটাই হয়তো তোমার কাছে বড়ো হয়ে উঠবে! কিন্তু এটাকে বড়ো করে দেখবার আগে বিচার কোরো, আমাকে সহ্য করতে হয়েছে কতখানি! তুমি, আমাকে সৃষ্টি করে নিক্ষেপ করেছ আগ্নেয়গিরির গর্ভে!

তোমাকে দোষ সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্যেই আবার তোমার কাছে এসেছি। এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করো। যতক্ষণ না আমার অনুরোধ রক্ষা করবে, ততক্ষণ আমি এ স্থান ত্যাগ করব না। মনে রেখো, এটা কেবল মিনতি নয়, তোমার দয়ার ওপরে আমার দাবি আছে!

॥ একাদশ ॥

দানবের আবেদন

নিজের কাহিনি শেষ করে দৈত্য আমার পানে তাকিয়ে রইল মৌনমুখে।

আমিও নিরুত্তর হয়ে রইলুম। তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আমাকে এতখানি অভিভূত করেছিল যে আমি জবাব দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলুম না।

দৈত্য বলল, 'তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ মনুষ্য-সমাজের মধ্যে। কিন্তু কোনও মানুষই আমার সঙ্গী হতে রাজি নয়। তাই দুনিয়ায় আমি একা। তোমাকে এই ত্রুটি সংশোধন করতে হবে।'

জানতে চাইলুম, 'কেমন করে?'

'আমারই মতন ভয়াবহ এক নারী সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের মতন সে আমাকে কখনওই ঘৃণা করবে না—আমার বউ হতে রাজি হবে। তাহলেই একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তিলাভ করব।'

তার এই প্রস্তাব শুনে আবার জেগে উঠল আমার ক্রোধ। বললুম, 'অসম্ভব! আমি সৃষ্টি করব তোর মতন আবার এক দানবী, আর তারপর তোরা দুজনে মিলে করবি মানুষের ওপর অত্যাচার? না, তা হবে না! দূর হ!'

দৈত্য অবিচলিত কণ্ঠে বললে, 'প্রভু, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার ওপরে সবাই অত্যাচার করে বলেই আজ আমি হিংসুক হয়েছি। এমনকি তুমি পর্যন্ত আমার প্রতি বিমুখ—অথচ আমি হচ্ছি তোমারই সৃষ্টি! আমার কথা যদি না শোনো, তোমার সর্বনাশ করব! শোনো, আমি চাই আমারই মতন কুৎসিত দেখতে একটি স্ত্রী। তাহলে আমরা দুজনেই সুখের জীবন যাপন করতে পারব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, স্ত্রীকে নিয়ে মানুষের বসতি ছেড়ে চলে যাব পৃথিবীর কোনও সুদূর নির্জন প্রান্তে। মানুষের চোখ আর আমাদের দেখতে পাবে না।'

'যদি ফের ফিরে আসো?'

'কখনও না, কখনও না! শত্রুর কাছে ফিরে আসব কীসের মোহে?'

'কে জানে এই অনুরোধ তোমার ছলনা নয়? মানুষকে তুমি ঘৃণা করো। কে জানে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যেই তুমি আবার আমার কাছে এসেছ কি না?'

'প্রভু, আবার তুমি ভুল বুঝছ। আমি যদি আর-একজনের সহানুভূতি পাই তাহলে আবার আমার প্রকৃতি শান্ত হবে। জীব কখনও একলা থাকতে পারে? পশুও যে দোসর চায়!'

নীরবে ভাবতে লাগলুম। দৈত্য যে সত্যকথাই বলছে তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রথমে এর স্বভাব ছিল মিষ্টি, এর প্রাণ ছিল প্রেম ও উদারতায় ভরা। কিন্তু উপকার করতে গিয়ে এ সয়েছে অত্যাচার, ভালোবাসতে গিয়ে পেয়েছে খালি ঘৃণা। তার ওপরে এর শাসানিও তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। চেহারায় আর ক্ষমতায় এর তুলনা নেই। এ বুদ্ধি পেয়েছে মানবের আর শক্তি পেয়েছে দানবের। একে তুষ্ট না করলে এ যদি মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে বাধা দেওয়ায় মতন মানুষ গোটা পৃথিবী খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

বললুম, 'দানব, আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হলুম। তোমার বউয়ের মূর্তি গড়ব। কিন্তু তারপর তুমি মানুষের বসতির ত্রিসীমানায় থাকতে পারবে না।'

দৈত্য বিপুল আনন্দে বললে, 'ওই প্রদীপ্ত সূর্য, ওই অনন্ত নীলাকাশ আমার সাক্ষী, একজন সঙ্গী পেলে আমি তাকে নিয়ে চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাব।'

'বেশ, তাহলে এখন বিদায় হও।'

'প্রভু, তুমি তবে সৃষ্টি-কার্য শুরু করো। কতখানি উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি যে তোমার কাজ লক্ষ করব তা কেবল আমিই জানি। যেদিন তুমি সফল হবে সেইদিনই আবার আমার দেখা

পাবে! এখন বিদায়!' বলেই সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলে গেল—যদি হঠাৎ আবার আমি মত পরিবর্তন করি, বোধহয় সেই ভয়েই! আশ্চর্য ক্ষিপ্র তার দুই পদ, উঁচু-নিচু পাহাড় পার হয়ে সে অদৃশ্য হল হরিণের চেয়ে দ্রুতগতিতে!

সন্ধ্যার সময়ে বাংলোর বারান্দায় বসে আছি—মনের ভেতর দিয়ে ছুটছে ভাবনার বন্যা!

আবার আমাকে নতুন সৃষ্টি করতে হবে! কিন্তু প্রথম বারের মতন এবারে সৃষ্টির সম্ভাবনায় মন আমার আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল না—এ সৃষ্টির সঙ্গে আর আমার প্রাণের যোগ নেই...

পরদিন সকালে বাবার এক পত্র পেলুম।

বাবা লিখেছেন—

'স্নেহাস্পদেষু,

অজয়, আশা করি বায়ু পরিবর্তনের ফলে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। আমার সমস্ত চিন্তাই এখন তোমাকে নিয়ে, কারণ আজ এ পৃথিবীতে আমার আত্মজ বলতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাই তোমার ভালোমন্দের ওপরে নির্ভর করছে আমার সুখ-দুঃখ।

তুমি জানো, সংসারের হিসাবের খাতা মোড়বার বয়স আমার হয়েছে। একে বার্ধক্যের ভার হয়ে উঠেছে অসহনীয়, তার ওপরে অশোকের শোচনীয় মৃত্যু। আমার দেহের আর মনের শেষ শক্তিটুকু হরণ করে নিয়েছে। আমি দিনের পর দিন গুনছি জীবন্ত শবের মতো—এখন যেকোনও মুহূর্তে আসতে পারে পরকালের ডাক!

কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করবার আগে আমার একটি শেষ কর্তব্য আছে। তা পালন না করলে আমার আত্মা পরলোকে গিয়েও শান্তিলাভ করবে না। আমার বন্ধুকন্যা মমতার ভার রয়েছে আমার ওপরে। মৃত্যুর আগে তার একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই।

সে ব্যবস্থা কী, তুমি জানো। মমতাকে এতদিন আমি রক্ষা করেছি কেবল তোমার জন্যেই, একথা কারুর অবিদিত নেই। মমতাকে কেবল লালন-পালন নয়, আমার পুত্রবধূ করব, বন্ধুর মৃত্যুশয্যায় এমন প্রতিজ্ঞাও আমি করেছি। আর মমতা যে সবদিক দিয়েই তোমার যোগ্য, একথাও বলা বাহুল্য।

বাবা অজয়, এর চেয়ে বেশি আর কী বলব? মমতা তোমার জীবনযাত্রার পথ মধুময় করে তুলুক, এই আমার একমাত্র কামনা।

আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তোমার উত্তর পেলেই শুভ-বিবাহের দিন স্থির করে ফেলব। ইতি—'

উত্তরে সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ মমতা যে আমার স্ত্রী হবে, একথা বহুদিন হতেই শুনে আসছি।

কিন্তু আমারও সামনে রয়েছে একটা মস্ত-বড়ো কর্তব্য। হ্যাঁ, ঘৃণ্য কর্তব্য! বিবাহের পরে এ কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব। এ কাজ শেষ করতে গেলে আমাকে থাকতে হবে কেবল আত্মীয় স্বজন নয়—যে কোনও মানুষেরই চোখের আড়ালে!

একজন সঙ্গী না পেলে এই সাংঘাতিক দানবও আমাকে মুক্তি বা শান্তি কিছুই দেবে না। সে আমার আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে ছায়ার মতো—সর্বদাই মনে করিয়ে দেবে আমার প্রতিজ্ঞা আর তার দাবির কথা। পাছে তার কথা আর কেউ জানতে পারে সেই দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাকেও থাকতে হবে ভয়ে ভয়ে। এখন আমি আর তার প্রভু নই—সেই-ই আমার আসল প্রভু। নিজের হাতে শনি সৃষ্টি করে আমি হয়েছি শনিগ্রস্ত।

কিন্তু সঙ্গী পেলে দানব আমার জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবে, আমিও আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচব। তারপর আবার আমি লাভ করব স্বাধীন জীবনযাত্রার স্বাভাবিক সুযোগ।

পত্রোত্তরে বাবাকে লিখলুম,

'শ্রীচরণেষু,

আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু এখনও আমি পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাইনি, এখান থেকে এরই মধ্যে দেশে ফিরলে হয়তো আবার শয্যাগত হয়ে আপনাদের সকলকে বিপদগ্রস্ত করব।

এতদিন যখন অপেক্ষা করেছেন, তখন আর দুই মাস মাত্র অপেক্ষা করলে বোধহয় আপনার বিশেষ কোনও অসুবিধা হবে না। এ সম্বন্ধে আপনার মত জানতে পারলে সুখী হব। ইতি—'

উত্তরে বাবা জানালেন,

'তোমার কথামতোই কাজ করা হবে। দুই মাস পরে প্রথম লগ্নেই হবে মমতার সঙ্গে তোমার শুভবিবাহ। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ইতি—'

মাত্র দুই মাস সময়। এর মধ্যেই করতে হবে আমাকে একটি দানব-মূর্তি সৃষ্টি। সুকঠিন কর্তব্য, কিন্তু অসম্ভব নয়। কারণ এবারে আমাকে আর অন্ধের মতো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হবে না। পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফলেই এবারে আমি খুব তাড়াতাড়ি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারব!

॥ দ্বাদশ ॥

দানবী

বিন্ধ্য পাহাড়ের এই নির্জনতাই হচ্ছে আমার ভূতুড়ে কাজের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। এখানে কৌতূহলী দৃষ্টির উৎপাত নেই।

বাংলো থেকে খানিক তফাতে ছিল একটি অন্ধকার গভীর গুহা। নানা জায়গা থেকে গোপনে আমার অপার্থিব মূর্তি গঠনের নানা উপাদান একে একে এনে গুহার ভেতরে জড়ো করতে লাগলুম। এই উদ্যোগ-পর্বই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার এবং এই কাজ শেষ করতেই কেটে গেল পনেরো দিন।

তারপর আরম্ভ হল গঠন কার্য। প্রথম প্রথম এই বিশ্রী কাজে কিছুতেই মন বসতে চাইত না। যে অপূর্ব মরীচিকা আগের বারে আমাকে জগৎ ভুলিয়ে তার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, এবারে তেমন কোনও আকর্ষণ নেই। আমি কাজে হাত দিয়েছি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।

কিন্তু আর এক প্রকাণ্ড মূর্তির কাঠামো যখন কতকটা তৈরি হল, আবার আমি নিজেকে ভুলে গেলুম। বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো ভুলে গেলুম আমি নিখিল বিশ্ব! কাজের মধ্যে ডুবে কোনওদিন আঠারো এবং কোনওদিন বা উনিশ-কুড়ি ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে কেটে যেতে লাগল, কিছুই বুঝতে পারতুম না। দেখতে দেখতে দানবীর কাঠামো সম্পূর্ণ আকার ধারণ করলে।

কিন্তু মূর্তি গঠন তো তুচ্ছ ব্যাপার, যে কোনও সাধারণ কারিগর অনায়াসেই যে কোনও মূর্তি গড়তে পারে। যার মধ্যে জীবন নেই তা গড়া তো সহজসাধ্য ব্যাপার! আমাকে আনতে হবে জীবনের গতি, চাঞ্চল্য, তপ্ততা—আসল সমস্যা হচ্ছে এইখানেই।

হাতে সময় আছে মাত্র পনেরো দিন—তারপরেই পিতৃকৃত্য পালনের জন্য আমাকে যাত্রা করতে হবে নিজের দেশে। বাবাকে যখন কথা দিয়েছি, সে কথা আমি রাখব। বিবাহ করব।

একদিন মূর্তির হৃৎপিণ্ড রচনায় একাগ্রমনে নিযুক্ত হয়ে আছি, আচম্বিতে গুহার একমাত্র প্রবেশ পথে পড়ল যেন কার বৃহৎ ছায়া। আমি কৃত্রিম আলোতে কাজ করতুম—বাইরের স্বাভাবিক আলোকের কতকটা উজ্জ্বলতা আসত কেবল গুহার প্রবেশ পথ দিয়েই। সেখানটা অন্ধকার হতেই আমি চমকে ফিরে দেখলুম। একখানা অতি বীভৎস প্রকাণ্ড মুখ সাঁৎ করে সেখান থেকে সরে গেল!

হুঁ! তাহলে দানবটা এখনও আমার ওপরে তার সজাগ দৃষ্টির পাহারা জাগিয়ে রেখেছে। তাহলে আমি হচ্ছি তার হুকুমের চাকর আর সে আড়াল থেকে দেখছে আমি তার হুকুম

তামিল করছি কি না! তাহলে আমি এখন বিজ্ঞানের ছাত্র নেই, একটা অমানুষের খেয়াল চরিতার্থ করবার যন্ত্র মাত্র!

তখনই স্বপ্ন ছুটে গেল! আর কাজ করতে ভালো লাগল না। গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

বাইরে গিয়ে কিন্তু জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না। সূর্য অস্তে যাওয়ার আয়োজন করছে—পশ্চিম আকাশে বিচিত্র রঙের প্রদর্শনী শুরু হতে আর দেরি নেই।

দূরে গঙ্গার ওপরে নীলাকাশে শুভ্র বেলফুলের মালার মতন বকের সারি উড়ে যাচ্ছে কোন বনে কোন তরুকুঞ্জে রাতের বাসার সন্ধানে।

একখানা পাথরের ওপরে বসে পড়লুম, হঠাৎ মনে জাগল এক নতুন ভাবনা।

একদিন মনের ভুলে জ্ঞানান্ধ হয়ে গড়েছিলুম এক ভীষণ দানব—যে আজ আমার সমস্ত জীবনকে করে তুলেছে দুঃস্বপ্নময়! আমার সহোদর—এতটুকু শিশু অশোক পর্যন্ত যার হিংসার চিতায় করেছে আত্মদান!

আজ আমি আবার তারই জন্যে তৈরি করতে বসেছি নতুন এক দানবীর দেহ। কারণ তার দাবি, এই দানবী তার দোসর হবে!

সে প্রতিজ্ঞা করেছে, দানবীকে লাভ করলে আর মানুষের কাছে ফিরে আসবে না। দানবের প্রতিজ্ঞার মূল্য থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।

কিন্তু আজ যে দানবীকে গড়ছি, তার প্রকৃতি কীরকম হবে আমি তা জানি না। হয়তো সে হবে দানবের চেয়ে ঢের বেশি মারাত্মক, ঢের বেশি হিংস্র। সে আমার কাছে কোনও প্রতিজ্ঞার বন্ধনে বাঁধা থাকবে না। দানবী যদি মানুষের শত্রু হয়, আমি তাকে কেমন করে নিবারণ করব?

কুৎসিত হলেই সে কুৎসিতকে পছন্দ করবে, এমন কোনও কথা নেই। হয়তো দানবী পছন্দ করবে না দানবকে। তখন দুজনেই ধেয়ে আসবে হয়তো মানুষের দেশে, নিজেদের হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে।

কিন্তু তার ওপরেও দুশ্চিন্তার কারণ আছে। এই দানব আর দানবীর সন্তান হবে—তারপর বছরে বছরে জন্মগ্রহণ করবে তাদেরও বংশধর এবং তারা কেউ হবে না আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভবিষ্যতে দলে দলে দানব-দানবী এসে যদি মানুষদের আক্রমণ করে—চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় ধ্বংস আর মৃত্যু, কে তখন তাদের বাধা দেবে? হয়তো একদিন তারা পৃথিবী থেকে মানুষ-জাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত করে দেবে!

দানবের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শেষটা কি আমাকেই হতে হবে মানুষ-জাতির ধ্বংসের কারণ? তখন যে আমার ধিক্কারনিনাদে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস হয়ে উঠবে শব্দিত! ভাবতে ভাবতে আমি শিউরে উঠলুম!

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখ তুলে দেখলুম, পূর্ণিমার আলো ঝকমক করছে চারদিকে।

কিন্তু সেই সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্না তখনই পরিম্লান হয়ে গেল—যখন দেখলুম একটা অতিকায় মূর্তি আমায় লক্ষ করতে করতে হঠাৎ পাহাড়ের একটা শিখরের আড়ালে হল অদৃশ্য!

তাহলে দানবও আমায় বিশ্বাস করে না! নইলে কেন এত লুকোচুরি? নিশ্চয় তার অবিশ্বাসের মূলে আছে ক্রূর কপটতা! সে আমায় পেয়েছে তার হাতের খেলনা। দানবীকে লাভ করলেই ধারণ করবে নিজের বিভীষণ মূর্তি! তখন আমি তো মরবই—সঙ্গে সঙ্গে মরবে নির্দোষ মানুষরাও!

নিশ্চয় আমি পাগল! দানবের কাছে অঙ্গীকার! এর কোনোই মূল্য নেই!

তখনই ঝড়ের মতন ছুটে আবার গুহার ভেতরে গিয়ে ঢুকলুম। টেবিলের ওপরে শুয়েছিল দানবীর বিপুল মূর্তি—কিন্তু তখনও জীবনহীন। একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি নিয়ে আমি তখনই নিজের হাতে যত্নে গড়া সেই মূর্তিকে করলুম খণ্ড-বিখণ্ড।

তারপরেই পিছনে শুনলুম একটা ভয়াবহ চিৎকার। ফিরেই দেখি, দানব এসে দাঁড়িয়েছে আমার সম্মুখেই।

মেঘের মতন গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, 'আমার সঙ্গীর মূর্তি তুমি ভেঙে ফেললে! তোমার ইচ্ছেটা কী শুনি? তুমি কি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাও? সারাজীবন আমি কষ্ট স্বীকার করে এসেছি—কেবল তোমার খেয়ালের জন্যেই! এত যাতনার পর তুমি কি আমার শেষ আশার বাতিও নিবিয়ে দিতে চাও?'

প্রচণ্ড ক্রোধে পাগলের মতন হয়ে আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম, 'দূর হ, দূর হ! পৃথিবীকে—মানুষ জাতিকে ধ্বংস করবার জন্যে আবার আমি তোর মতন কিংবা তোর চেয়ে একটা সৃষ্টিছাড়া মূর্তিকে সৃষ্টি করব? দূর হ, দূর হ!'

দানবের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ভীষণ এক উত্তেজনায়—তার দেহ হঠাৎ হয়ে উঠল সোজা, তার দুই হাত হল মুষ্টিবদ্ধ। মনে হল সে আমায় আক্রমণ করতে চায়! কিন্তু কোনওরকমে সে ভাব সামলে দানব বললে, 'গোলাম, দেখছি তোমার কাছে যুক্তির বা প্রতিজ্ঞার কোনোই মূল্য নেই! উত্তম! শক্তিমান হচ্ছি আমিই! তোমাকে আমি খণ্ডবিখণ্ড করে লুপ্ত করতে পারি! তুমি নাকি আমার সৃষ্টিকর্তা? কিন্তু আজ আমিই তোমার প্রভু! পালন করো আমার হুকুম। ভাবছ আমার চেয়েও তুমি হতভাগ্য? কিন্তু তোমাকে আমি দুর্ভাগ্যের এমন চরম সীমায় নিয়ে যেতে পারি, যেখানে গিয়ে তুমি ভাববে সূর্যের পবিত্র আলোকও ঘৃণাকর!'

আমি হা হা করে হেসে বলে উঠলুম, 'চমৎকার! যা খুশি বলতে চাও, বলো—আর আমি অস্থির হব না! তুই আমাকে ভয় দেখাতে চাস? কিন্তু আমি ভয় পাব না, আমি মানুষদের ধ্বংস করবার জন্যে তোর মতন আর দ্বিতীয় মূর্তি সৃষ্টি করব না। দূর হ এখান থেকে—তোর গর্জন বা অনুরোধ, কিছুই আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না!'

রাক্ষসের মুখ-চোখ যেরকম করে উঠল, ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। আমি ভাবলুম,

সে বুঝি আমায় আক্রমণ করবে! কিন্তু সে কোনওরকমে আবার নিজেকে সামলে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'আমি সব খবর রাখি! তুমিও এত সঙ্গী থাকতে আবার বিয়ে করবে? পশুরও সঙ্গী আছে! আর আমি একলাই কেবল সঙ্গীহীন হয়ে এই পৃথিবীর মরুভূমির ওপরে পাগলের মতন ছুটে বেড়াব? ধিক তোমাকে!...এর পরে আর আমাকে কোনও দোষ দিয়ো না। মানুষ! আমি তোমায় ঘৃণা করি! আমি নরকের আগুনে জ্বলব, আর তুমি পরম সুখে জীবন যাপন করবে? কখনও নয়, কখনও নয়। আমি তো একদিন মরবই—কিন্তু তার আগে তোমায় মারব! আজ থেকে গোখরো সাপের মতন তোমার ওপর দৃষ্টি রাখব, তারপর দংশন করব একদিন। মানুষ! তোমাকে আমি শিক্ষা দেব!'

তার বড়াই শুনে আমার রাগ আরও বেড়ে উঠল। চিৎকার করে বললুম, 'শয়তান, চুপ কর! আর এখানকার বাতাসকে বিষাক্ত করিসনি। যা বলবার, আমি তা বলেছি। তোর কথায় আর আমি মত বদলাব না। চলে যা এখান থেকে!'

'বেশ, বেশ। তাহলে এই কথাই রইল। আমি আবার আসব তোমার বিবাহের রাত্রে।'

আমি উন্মত্তের মতো তার দিকে ছুটে গেলুম, কিন্তু তাকে ধরতে পারলুম না। চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস? তার আগে ভেবে দ্যাখ, তুই নিজেই নিরাপদ কিনা!'

কিন্তু কার সঙ্গে আমি কথা কইছি? আমি কিছু বলবার আগেই দানবের মূর্তি হয়েছে অদৃশ্য!

চারদিক আবার চুপচাপ। নিষ্ফল আক্রোশে আমি গুহার ভেতরে পায়চারি করতে লাগলুম।

যদি তাকে ধরতে পারলুম! কেন তাকে পালাতে দিলুম? কেন লোহার ডান্ডা মেরে গুঁড়িয়ে দিলুম না তার মাথাটা!

আমার বিবাহের রাত্রে আবার তার আবির্ভাব হবে! তার মানে, সেইদিনই সে আমাকে হত্যা করবে! তার বউ জুটল না, অথচ আমি বিবাহ করব— এই হচ্ছে তার অভিযোগ! কী স্পর্ধা! সে কি ভাবছে তার মতন একটা জন্তুর ভয়ে আমি বিবাহ করব না? দেখা যাক।

পরদিন দু-খানি পত্র পেলুম। একখানি প্রণবের, একখানি বাবার।

প্রণব জানিয়েছে, অনেকদিন আমাকে না দেখে তার মন কেমন করছে, তাই খুব শীঘ্রই এখানে এসে হাজির হবে।

বাবা জানিয়েছেন, দুই মাস পূর্ণ হতে আর দেরি নেই। অতএব পরের মাসের দশ তারিখে তিনি আমার বিবাহের দিন ধার্য করতে চান।

পত্রোত্তরে বাবাকে আমার সম্মতি জানালুম। কিন্তু সম্মতি জানাবার সময় এ কথাও মনে হল, বাবা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পান দানবের কথা, তাহলে আর কি ওই তারিখে আমার বিবাহ দিতে চাইবেন?

দিন-তিনেক কেটে গেল নানা দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে। তারপর এ জায়গাটা আর ভালো লাগল না—দানবের আবির্ভাবের পর থেকেই এখানকার বাতাস যেন বিযাক্ত হয়ে উঠেছে! স্থির করলুম, আবার দেশে ফিরে যাব। কিন্তু তার আগে একটা কাজ শেষ করে যেতেই হবে।

গুহার ভেতরে এখনও পড়ে আছে দানবী মূর্তিটার ধ্বংসাবশেষ। আমি চলে যাওয়ার পর যদি কেউ এই দেহাবশেষ আবিষ্কার করে তবে বিশেষ গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। তার ফলে নানা খবরের কাগজে রাক্ষসী হত্যা নিয়ে হরেকরকম চমকদার গল্প পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে।

সে অভিশপ্ত গুহার ভেতরে আর ঢোকবার ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবু কোনওরকমে বিদ্রোহী মনকে সংযত করে আবার গুহার মধ্যে প্রবেশ করলুম।

চারদিকে ছড়ানো রয়েছে যেন কোনও রক্তমাংসে গড়া মৃতদেহের খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নিজেকে মনে হল হত্যাকারী বলে!

দেহের ভগ্ন-চূর্ণ অংশগুলো একটা মস্তবড়ো থলের ভেতরে ভরে ফেললুম। যন্ত্রপাতি যা ছিল সব পুরলুম বাক্সের ভেতরে।

সন্ধ্যার আগে গঙ্গার ধারে গিয়ে একখানা জেলে ডিঙি ভাড়া করলুম। বললুম, 'আমার গঙ্গায় বেড়াবার শখ হয়েছে। আমি নিজেই নৌকা বাইব; সঙ্গে তোমাদের কারুকেই থাকতে হবে না।'

রাত্রি হল। আমার ভয়াবহ বোঝা নিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠলুম।

কী সুন্দর চন্দ্রালোক! আকাশ জ্যোৎস্নায় ঝলমল, গঙ্গাকেও মনে হচ্ছে যেন জ্যোৎস্নাপ্রবাহ। খানিক তফাতে জলের ওপরে জেগে আছে একটি বালুচর—যেন রুপোলি দ্বীপ, পরিদের খেলার জমি!

ছোটো একখানা মেঘ ভেসে এসে চাঁদের মুখে পরিয়ে দিলে ঘোমটা। সেই ফাঁকে রাক্ষসীর দেহকে দিলুম বিসর্জন। সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে চারদিক কেঁপে উঠল ভীষণ এক হাহাকারে! আমার বুক কাঁপতে লাগল—কে কেঁদে উঠল অমন করে?...ও কি সেই দানব? তার শেষ আশা লাভ করল সলিল সমাধি? তাই কি এই ক্রন্দন? তাহলে সে এখনও আমার কার্যকলাপ লক্ষ করছে? কিন্তু কোথায় সে? চারদিকে চেয়ে দেখলুম, কিন্তু কোথাও তাকে আবিষ্কার করতে পারলুম না।

আর কিছুক্ষণ গঙ্গায় বেড়িয়ে নৌকো নিয়ে ফিরলুম। ডাঙায় নৌকো লাগার সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম আবার এক করুণ আর্তনাদ—তারপরেই অনেক লোকের গোলমাল আর ছুটোছুটি!

কারা চ্যাঁচাতে লাগল, 'খুন! খুন! পুলিশ, পুলিশ!'

ছুটে সেইদিকে গেলুম। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি, রাস্তার ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা দেহ। আমি দেহটাকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই সচমকে চিৎকার করে উঠলুম।

এ যে আমার বন্ধু প্রণব! তার কণ্ঠের ওপরে মোটা মোটা অমানুষিক আঙুলের চিহ্ন!

'প্রণব—প্রণব, আমাকে বন্ধুহীন করবার জন্যে দানব শেযটা তোমাকেও বলি দিলে—' বলতে বলতে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লুম।

॥ ত্রয়োদশ ॥

বিবাহের রাত্রে

সেই মর্মভেদী ঘটনার পর কেটে গেল তিন মাস। বলা বাহুল্য এখনও আমার বিবাহ হয়নি।

প্রণবের মৃত্যু আমার প্রাণে যে কী আঘাত দিয়েছিল, সেকথা আপনি অনায়াসেই অনুমান করতে পারবেন। তার শোক কি জীবনেও ভুলব? কিন্তু থাক—আমার শোক আমার মনের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে থাক, শিশুর মতন জনতাকে আমি কান্না শোনাতে চাই না।

প্রণবকে বাবাও মনে করতেন পুত্রের মতো। তাঁরও বুকে যে কতটা বেজেছে, আমি তা জানি। তিনিই পিছিয়ে দিলেন আমার বিবাহের দিন।

দানব, পিশাচ, রাক্ষস! আমার বুকে জাগছে কেবল এইসব নাম। দৈত্য অশোককে হত্যা করেছে, প্রণবকে হত্যা করেছে, আমাকেও হত্যা করতে চায়! যারা আমার আনন্দের নিধি আগে আমাকে তাদের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত করে তারপর দেবে আমার ওপরে দৃষ্টি—দৈত্যের এই অভিপ্রায়! আগে আমাকে মরমে মেরে তারপর সে আমার দেহকে ধ্বংস করবে! কী পৈশাচিক মনোবৃত্তি!

কিন্তু আমি তাকে ভয় করি না! আমিও প্রস্তুত—তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে! না, না, তাও নয়—সে কবে আসবে বলে আমি প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে চাই না—আমি চাই তাঁকেই খুঁজে বার করতে। নিশিদিন আমার চিত্ত তার নিকটস্থ হওয়ার জন্যে অধীর হয়ে আছে। এবার যেদিন আমাদের দুজনের দেখা হবে সেদিন হবে একটা রক্তাক্ত, প্রচণ্ড দৃশ্যের অবতারণা! সেদিন একটা যবনিকা পড়বেই—হয় আমার, নয় তার জীবন-নাট্যের ওপরে! আজ আমারও প্রতিহিংসার ক্ষুধা তার চেয়ে কম জাগ্রত নয়!

এক-একদিন প্রাণের আবেগে বেরিয়ে পড়ি গভীর রাত্রে। তার মুখেই শুনেছি, সে নিশাচর। দুই পকেটে দুই গুলি ভরা রিভলভার নিয়ে খুঁজে বেড়াই চারদিকে—ঘাটে-বাটে-মাঠে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে উপত্যকায়, উপত্যকায়, গহন বনের আনাচে-কানাচে, যেখানে তার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা! আমি বিলক্ষণই জানি, আমার ওপরে নজর রাখবার জন্যে আমাকে ছেড়ে থাকবে না সে বেশিদূরে। কিন্তু তবু সে থাকে চোখের আড়ালে, আমার নাগালের বাইরে!

কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করি প্রতি মুহূর্তে! এমনকি, অনুভব করি যেন তার রক্তপিপাসী হিংসকুটে খরদৃষ্টির স্পর্শ পর্যন্ত! আমার চোখে সে অদৃশ্য হলেও তার চক্ষে আমি দৃশ্যমান হয়েই আছি, এই অপ্রীতিকর সত্যটা সর্বদাই আমার মনকে খোঁচা দিতে থাকে!

তারপর বাবা আবার বিবাহের দিন স্থির করতে উদ্যত হলেন।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আরও কিছু দিন সময় দিন। অশোক আর প্রণবকে খুন করেছি আমিই। আগে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

বাবা উৎকণ্ঠিত চোখে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'অজয়, তুমি কি অসুস্থ? পাগলের মতন যা তা কী বলছ?'

'বাবা, আমি পাগল নই—অসুস্থও নই। অশোক আর প্রণবকে যে খুন করেছে তাকে আমি চিনি। এও জানবেন যে ওরা আমার ভাই আর বন্ধু না হলে আজ মারাও পড়ত না। তাই অনুতাপে বুক আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। খুনিকে শাস্তি না দিয়ে বিবাহ করতে আমার মন উঠছে না।'

'কে এই পাযণ্ড খুনি? তার নাম বলো, এখনই আমি শাস্তির ব্যবস্থা করছি। ইংরেজ রাজ্যে পুলিশ আর আদালতের অভাব নেই।'

'বাবা, আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছুই নেই। কিন্তু এ হচ্ছে এমন সাংঘাতিক গুপ্তকথা, যা আপনারও কাছে বলা উচিত নয়।'

বাবা অল্পক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, 'অজয়, তুমি আমাকে চেনো। পুত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার অভ্যাস আমার নেই। তোমার গুপ্তকথা জোর করে আমি জানতে চাই না। কিন্তু তোমারও উচিত পিতৃকৃত্য পালন করা। আমি স্থির করেছি, আসছে হপ্তায় পাঁচ তারিখে তোমার বিবাহ দেব।'

'বাবা।'

'চুপ। আসছে হপ্তায় পাঁচ তারিখে মমতার সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে।'

বাবা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি বাবাকে জানি, আর তাঁর কথার নড়চড় হবে না।

কিন্তু আমারও বোঝাবার উপায় নেই এবং বাবাও বুঝতে পারলেন না, তিনি আমার বিবাহের দিন নয়—স্থির করে গেলেন আমার মৃত্যুর দিন!

...বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হল। বিপুল আয়োজন! বাবা নাকি আমার বিবাহে খরচ করবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। কত লোকের নিমন্ত্রণ যে হল তার সংখ্যা আমি জানি না। যন্ত্রসংগীত, কণ্ঠসংগীত, বাইজির নাচ। তার ওপরে দিনে যাত্রা আর রাতে থিয়েটার! খাবারের যে ফর্দ তৈরি হল তা দেখলেও ভোজনবিলাসীদের জিভ দিয়ে পড়বে টপ টপ করে জলের ফোঁটা।

পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে বাবা বোধহয় পৃথিবীকে চমকে দিয়ে যেতে চান!

পৃথিবী কতখানি চমকাবে জানি না, কিন্তু থেকে থেকে সচকিত হয়ে উঠছে আমারই মন।

দৈত্য বলে গেছে, তার সঙ্গে আবার দেখা হবে আমার বিবাহের রাত্রে!

এবং সে হয়তো জানে না, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমিও রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে আছি!

আজ বিবাহের দিন। কিন্তু আমার বরসজ্জার আড়ালে অপেক্ষা করছে দু-দুটো ছ'নলা রিভলবার! এমন সশস্ত্র ও হত্যার জন্যে তৈরি হয়ে কোনও বর্বরও বোধহয় বিবাহের মন্ত্র পড়ে না।

মন্ত্র পড়লুম। বিবাহ হয়ে গেল। হিন্দুর বিবাহের দিনে বরকে সারাদিন অভুক্ত থাকতে হয়। রাত্রে বাসর-ঘরে প্রবেশ করবার আগে ডাক পড়ল আমার, আহার করবার জন্যে।

খেতে বসেছি। কানে আসছে সানাইয়ের সাহানা রাগিনী; আর এক জায়গা থেকে 'অর্কেস্ট্রা'র সুর সৃষ্টির চেষ্টা; অন্য কোথায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে নর্তকীর নূপুর ধ্বনি; এবং এরি মধ্যে সমান সজাগ হয়ে আছে অসংখ্য কণ্ঠের প্রচণ্ড কোলাহল—খেতে খেতে ভাবছি এই বিশ্রী অনৈক্য তানকে কী করে লোকে মহোৎসব বলে মনে করে।

আচম্বিতে বাড়ির সমস্ত বৈদ্যুতিক আলো গেল নিবে—সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল নাচ গান বাজনার শব্দ। চারদিকে উঠল বিকট হইহই রব—আকাশ গেল যেন বিদীর্ণ হয়ে!

সকলেরই মুখে উচ্চকণ্ঠের জিজ্ঞাসা, 'কী হল, কী হল, কী হল?' কেবল জিজ্ঞাসা, কোনও উত্তর নেই।

কিন্তু অন্তঃপুরে উঠল বহু নারী কণ্ঠের আর্তনাদ! মনে হল, এ শব্দ আসছে বাসর ঘরের ভেতর থেকেই!

কোনওরকমে একটা 'টর্চ' সংগ্রহ করে অন্তঃপুরের দিকে ছুটলুম।

বাসর ঘরের দরজার কাছে কারা তিন-চারটে হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিশ-পঁচিশ জন মেয়ে গোলমাল ও হাহুতাশ করছে সেইখানে দাঁড়িয়েই।

মেয়েদের ভেতরে পথ করে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে স্তম্ভিত চোখে দেখলুম, রাঙা চেলির কাপড় পরে নববধূ মমতা মাটির ওপরে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে আছে...নরম ফুল দিয়ে গড়া অপূর্ব প্রতিমার মতো। তার কণ্ঠের ওপরে কতকগুলো অমানুষিক আঙুলের চিহ্ন!

তাহলে এই ছিল দৈত্যের মনে? বিবাহের রাত্রে আমাকে নয়, মমতাকে হত্যা করবার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতই সে দিয়ে গিয়েছিল আমাকে?

এবং এই খবর শুনে সেই রাত্রেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বাবার মৃত্যু হল!

আমি একা! দুনিয়ায় আমি একা—আমার স্বহস্তে সৃষ্ট দানবেরই মতন একা!

॥ চতুর্দশ ॥

অভিযান

আমি একা।

পৃথিবীর সব কথা ভুলে গিয়েছি—মনে জাগছে খালি এক চিন্তা। প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ চাই! দৈত্যকে বধ করতে হবে।

কিংবা সে করবে আমাকে বধ। দুনিয়ার আমাদের দুজনের ঠাঁই নেই।

অশোক, প্রণব, মমতা—যাদের নিয়ে ছিল আমার ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন, দৈত্য একে একে তাদের কেড়ে নিয়েছে। আবার বাবারও মৃত্যুর হেতু সে।

আমারও বাঁচবার সাধ নেই। কিন্তু কেবল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই আমার বাঁচা দরকার।

নদীর ধারে বসে বসে এইসব ভাবছি। হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে শুনলুম উৎকট অট্টহাসি!

তারপর শোনা গেল তার উল্লসিত কণ্ঠস্বর; 'অজয়, আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আজ তোমাকে করেছি আমারই মতন দুঃখী। কিন্তু তোমাকে আমি বাঁচিয়েই রাখব! দুঃখকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে আমি মরতে দেব না!'

বেগে পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলুম। কিন্তু তিন চারটে আশ্চর্য লাফ মেরে সে আবার কোথায় অদৃশ্য হল।

কিন্তু তারপর আরম্ভ হয়েছে আমার যে অভিযান, এর সমাপ্তি কোথায় জানি না! কখনও বনে বনে, কখনও মাঠে মাঠে, কখনও পাহাড়ে বা মরুভূমিতে বা নদীপথে ছুটে বেড়াচ্ছি আমি শত্রুর সন্ধানে! কখনও দূরে তার মূর্তি দেখি, কখনও তার সাড়া পাই এবং কখনও বা মাটির ওপরে পাই তার পদচিহ্ন! এমনি করে সে আমাকে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে দেশে দেশে। কিন্তু সে যেন আলেয়া, দেখা দিলেও ধরা দেয় না।

কতদিন শহরে বাস করিনি—সভ্যতার সংস্পর্শে আসিনি। কতদিন আহার জোটেনি। কতদিন বনের পশুপক্ষী মেরে অসভ্যের মতন আগুন পুড়িয়ে খেয়েছি। জীবন হয়ে উঠেছে ঘৃণ্য, দুঃসহ! একমাত্র আনন্দের স্বাদ পাই কেবল নিদ্রায়। স্বপ্নে দেখি আবার প্রিয়জনদের মুখ!

মাঝে মাঝে দীর্ঘকাল তার সাক্ষাৎ না পেয়ে যখন হতাশ হয়ে পড়ি, তখন সে নিজেই আবার তার সন্ধান দেয়! হয়তো পাহাড়ের ওপর বা গভীর অরণ্যের ভিতরে লুকিয়ে সে চিৎকার করে বলে,—'অজয়, নিরাশ হোয়ো না, আমি আছি! আমার ইচ্ছা, চিরদিন ভবঘুরের মতন তুমি ছুটোছুটি করে বেড়াও! আমি জানি আজ দু-দিন তুমি উপোসি।

তোমার জন্যে এখানে একটা খরগোশ মেরে রেখে গেলুম। পুড়িয়ে খেয়ো—না খেলে আমার পিছনে ছুটবে কেমন করে? এসো শত্রু, আমার অনুসরণ করো, এখনও আমাদের শেষ যুদ্ধের দেরি আছে!'

কিছুদিন আগে সে আবার আমাকে শুনিয়ে বললে, 'এইবার আমি হিমালয়ে বেড়াতে যাব। অতএব প্রস্তুত হও! সে হচ্ছে বরফের দেশ, সেখানে পদে পদে তুমি কষ্টভোগ করবে, আর তোমার যন্ত্রণা দেখে আমি করব আনন্দলাভ!'

হিমালয়েই যেতে হল! দিনে দিনে ওপরে উঠছি, উঠছি, উঠছি। ক্রমে এত ওপরে উঠলুম যে নীচের দিকে তাকালে দেখি, মেঘের পর মেঘ ভেসে যাচ্ছে। কষ্ট যা পেয়েছি তা আর বলবার নয়। দেহের রক্ত জমে গিয়েছে, বরফের ঝড় মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গি..., শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হওয়ার মতন হয়েছে। আর অনাহারে থেকেছি যে কতদিন, তার হিসাব নেই।

কেবলমাত্র প্রতিহিংসার ঝোঁকেই সহ্য করতে পেরেছি এই দারুণ পথকষ্ট। আঙুল যখন খসে পড়বার মতন হয়েছে, তখনও আমি ফিরিনি, বসিনি বা দাঁড়াইনি—ছুটে আর ছুটে চলেছি। আমি যেন কালবৈশাখীর মেঘ, ধেয়ে চলাই আমার ধর্ম। কিন্তু দানব এখনও আমাকে ধরা দেয়নি। দেখি, সে আরও কত দূরে যায়?

সুন্দরবাবু, কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, এইবারে হয়তো সব ছুটোছুটির শেষ হবে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আর আমার দেহের শক্তি নেই। বোধহয় আমার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। হয়তো সে বাঁচবে আর আমি মরব।

কিন্তু আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি? আপনাকেও আমার মতন ভবঘুরে হতে বলি না, কিন্তু যদি কখনও আমার মৃত্যুর পর দানবের দেখা পান, তাহলে কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবেন না, ছেড়ে দেবেন না। হত্যা করবেন, তাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করবেন। তাহলে আপনি লাভ করবেন আমার আত্মার আশীর্বাদ।

(অজয়ের কাহিনি সমাপ্ত)

উপসংহার

সুন্দরবাবুর কথা

১৫

অজয়বাবু একদিনে তাঁর এই অদ্ভুত কাহিনি বলতে পারেননি। একটানা কথা বলবার শক্তি তাঁর ছিল না। বলতে বলতে শ্বাসকষ্টে তাঁর কণ্ঠ মৌন হয়েছে বহুবার।

তাঁর শরীরের অবস্থা ক্রমেই বেশি খারাপ হয়ে এল। ঔষধ-পথ্য, যত্ন-সেবা কিছুতেই ফল ফলল না, একদিন মধ্যরাত্রে তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

মৃত্যুর আগের দিনেই বোঝা গিয়েছিল অজয়বাবুর আর কোনও আশা নেই।

তাঁকে ডেকে বললুম, 'আপনার জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই যে এতবড়ো আবিষ্কার লুপ্ত হয়ে যাবে, এটা হতে পারে না। মানুষ সৃষ্টির উপায় আর উপাদান আমাকে জানিয়ে গেলেই ভালো হত।'

কষ্টে নিশ্বাস টানতে টানতে অজয় বললেন, 'নতুন জীবন সৃষ্টি হচ্ছে ভগবানের কর্তব্য। ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে এটা হচ্ছে আগুন নিয়ে খেলা। আমি এ মারাত্মক খেলায় হেরেছি, গুপ্তকথা জানলে আপনিও জিতবেন না। সুতরাং ও-আগ্রহ দমন করুন। আমিও অন্তিম মুহূর্তে সেকথা প্রকাশ করে পৃথিবীর সর্বনাশ করে যাব না।'

মৃত্যু যাতনার মধ্যেও প্রাণপণে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'সুন্দরবাবু, দানবকে যদি দেখতে পান, তখনই হত্যা করবেন। তাতে কোনও পাপ হবে না। আমার মৃত্যুর পরে সে হয়তো আবার নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে পারে। তাকে হত্যা করলে জগতের মহা উপকার হবে।'

এই তাঁর শেষ কথা।

পরদিন তাঁর দেহের সৎকার হবে।

কিন্তু রাত তখন ফুরিয়ে এসেছে, হঠাৎ অজয়বাবুর তাঁবুর ভেতরে কেমন একটা শব্দ হল। আমি চুপি চুপি তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ভেতরে এককোণে লণ্ঠন জ্বলছিল, তারই ক্ষীণ আলোকে দেখলুম একটা চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর দৃশ্য।

অজয়বাবুর মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে একটা বিরাট দানব দেহ। তার মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, তার গায়ের রং মড়ার মতন এবং তার লোমাবৃত সারাদেহ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছিল একটা বন্য বীভৎসতা! বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে আমার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে গেল!

কান্নাভরা গলায় সে থেমে থেমে বলল, 'অজয়, অজয়—আমার প্রভু, আমার স্রষ্টা! তোমাকেও আমি বধ করলুম। তোমার ওপরে, আমি অনেক নির্যাতন করেছি বটে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি! দুনিয়ার কোনও মানুষই আমার কেউ নয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে ছিল যে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক! তুমিই যে আমার ঈশ্বর, আমার হর্তাকর্তাবিধাতা, আমার সব! অভিমানে বিদ্রোহী হয়ে আমি অন্যায় করেছি—অজয়, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার মৃত্যুর পর আমার জীবনের আর কোনও সার্থকতাই রইল না। তোমার কাছ থেকে—মানুষজাতির কাছ থেকে আমিও আজ চিরবিদায় গ্রহণ করলুম।'

দানব মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেলে। পরমুহূর্তে সে প্রচণ্ড বেগে তাঁবুর বাইরে এসে পড়ল এবং কোথায় মিলিয়ে গেল শেষ রাতের অন্ধকারে!

অজয়ের শেষ অনুরোধ মনে পড়ল। কিন্তু আমি এমনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম যে, দানবের বিরুদ্ধে একটা আঙুল পর্যন্ত তুলতে পারলুম না।

আঙুল তুলব কী, সামনাসামনি তাকে দেখে যে মূর্ছিত হয়ে পড়িনি, এইটেই আশ্চর্য কথা!

সে ভয়ংকর! যেন মূর্তিমান মৃত্যু! আজও স্বপ্নে তাকে দেখে চমকে চেঁচিয়ে উঠি!

ভয় দেখানো ভয়ানক

কনাড়েত আমিষ্য দুত

কলকাতার বিজন দ্বীপে

॥ এক ॥

অনেকেই কলকাতায় অনেককাল থেকেও শহরের অনেক খবরই রাখেন না। ধরুন, এই গঙ্গা নদীর কথা। গঙ্গা যে খালি কলকাতার তেষ্টা মেটায়, তা নয়; বাণিজ্যে কলকাতার লক্ষ্মীলাভের আসল কারণই ওই গঙ্গা! স্নান করতে গিয়ে, বেড়াতে গিয়ে বা পারাপার হতে গিয়ে গঙ্গাকে দেখেনি কলকাতায় এমন লোক নেই। তবু জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে, কলকাতার গঙ্গার বুকেও যে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে দিব্যি একটি ছোট্ট দ্বীপের মতন বালুচর জেগে ওঠে, এ দৃশ্য অনেকেই দেখেননি।

আমার আজকের বন্ধুরা ছিলেন ওই দলে। গঙ্গার ধারেই আমার বাড়ি। সকালে এসেছিলেন তাঁরা আমার বাড়িতে বেড়াতে। গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে চা পান করতে করতে হঠাৎ ওই বালুচর দেখে তাঁরা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

বাগবাজারের কাছ থেকে বালুচরটি সমান চলে গিয়েছে বালি ব্রিজের দিকে। চওড়ায় তা বেশি নয় বটে, কিন্তু লম্বায় হবে অন্তত মাইল খানেক। বেশি হতেও পারে।

পরেশের বোন ছন্দা, বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে। পয়লা নম্বরের শহুরে মেয়ে, জন্মে কখনও পল্লীগ্রাম বা ধানের খেত দেখেনি। সবচেয়ে বিস্মিত হল সে। বললে, 'কলকাতা শহরে দ্বীপ! এ কী অদ্ভুত দৃশ্য!'

আমি বললুম, 'কিছুই অদ্ভুত নয়! গঙ্গায় এ সময়ে রোজই দিনে আর রাতে ভাটার সময়ে চড়া পড়ে, আবার জোয়ার এলেই ডুবে যায়!'

পরেশ বললে, 'এ খবর তো জানা ছিল না!'

নবীন বললে, 'আমরা বালিগঞ্জবাসী জীব, পাশের বাড়ির খবর রাখি না, বাগবাজারের গঙ্গা তো আমাদের পক্ষে দস্তুরমতো বিদেশি নদী, ম্যাপ দেখে তার অস্তিত্বের খবর পাই!'

ছন্দা বিপুল পুলকে নেচে উঠে বলল, 'ওখানে যাওয়া যায় না বড়দা?'—সে আমাকে 'বড়দা' বলে ডাকত।'

বললুম, 'খুব সহজেই। একখানা মাত্র পানসির দরকার!'

পরেশ সোৎসাহে বললে, 'ডাকো, তাহলে একখানা পানসি! আমরা ভারতের প্রধান নগর কলকাতার মাঝখানেই দ্বীপভ্রমণ করব!'

নবীন বললে, 'তারপর ভ্রমণকাহিনি লিখে মাসিকপত্রে প্রকাশ করব!'

আমি বললুম, 'সাধু!'

ঠাট্টা করে বললুম বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারিনি যে, আমাদের এই ভ্রমণটা সত্য-সত্যই একটি চমকপ্রদ অসাধারণ কাহিনি হয়ে দাঁড়াবে!

॥ দুই ॥

গঙ্গার চড়ায় গিয়ে লাগল আমাদের পানসি।

চরের এক জায়গায় খানকয় বড়ো বড়ো নৌকা বাঁধা। অনেকগুলো কুলি চর থেকে ঝুড়ি করে বালি তুলে নৌকোয় গিয়ে বোঝাই করে আসছে। গঙ্গার একপারে কলকাতার অগণ্য বাড়ির থাক সাজানো রয়েছে এবং আর একপারে গাছের সার, চিমনিওয়ালা কলকারখানা ও মন্দির প্রভৃতি। উত্তর দিকে বালির রাঙা সাঁকো এবং তারই একমুখে দক্ষিণেশ্বরের কালি-মন্দির ও আর একমুখে বেলুড়ের নতুন মঠের গম্বুজ।

চরের যে-দিকটা নির্জন আমরা সেইদিকে গিয়ে নামলুম।

বাতাসে কালো চুল ও বেগুনি শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ছন্দা মহা আনন্দে ভিজে বালির ওপরে ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

নবীন এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, 'চরটাকে ডাঙা থেকেই ভালো দেখাচ্ছিল। এখানে তো ভ্রমণকাহিনি লেখবার কোনও রঙিন মালমশলাই চোখে পড়ছে না! ওখানে বালি বোঝাই নৌকো, চরের চারপাশে গঙ্গার ঘোলা জল আর জেলেডিঙি, মাথায় ওপরে উড়ছে কতকগুলো গাংচিল—ধেৎ, এই নিয়ে কি ভ্রমণকাহিনি রচনা করা যায়?'

পরেশ বললে, 'রাখো তোমার ভ্রমণকাহিনি! জীবনে যা দেখিনি, আজ সশরীরে সেই দ্বীপে আরোহণ করলুম, এইটেই সবচেয়ে বড়ো কথা! এ ঠাঁইটিকে আমরা যদি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সুমাত্রা কি সিংহলের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে করি, তাহলে কার সাধ্য প্রতিবাদ করে?'

এমন সময়ে খানিক তফাত থেকে ছন্দা চেঁচিয়ে ডাক দিল, 'বড়দা, একবার এদিকে এসে দ্যাখো তো এগুলো কীসের দাগ!'

তার কাছে গিয়ে দেখি, বালির ওপরে হেঁট হয়ে পড়ে অত্যন্ত কৌতূহলে কীসের দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে।

বালির ওপরে অনেকগুলো অদ্ভুত চিহ্ন!

পরেশ দেখে বললে, 'পায়ের দাগ!'

আমি বললুম, 'কিন্তু কোন জীবের পায়ের দাগ? আমরা কেউ পদচিহ্নবিশারদ না হয়েও বলতে পারি, এ দাগগুলো কোনও চতুষ্পদ জীবের পায়ের দাগ নয়! এগুলো যার পায়ের দাগ, সে দুই পায়ে হাঁটে। মানুষ দুই পায়ে হাঁটে, কিন্তু এগুলো মানুষের পায়ের দাগ নয়। পাখি দুই পায়ে হাঁটতে পারে বটে, কিন্তু কোনও পাখির পায়ের দাগই এত বড়ো বা এরকম দেখতে হয় না। এমন বড়ো যার পা, তার দেহও না জানি কত প্রকাণ্ড। দেখছ পরেশ, এর পায়ে মস্ত মস্ত নখও আছে? কী ভয়ানক! যে এমন পায়ের অধিকারী তার চেহারা দেখলে পেটের পিলে হয়তো চমকে যাবে!'

নবীন চোখ পাকিয়ে বললে, 'দুই সার পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। গঙ্গা থেকে কোনও জীব উঠে চরের ওপরে এসে আবার জলে ফিরে গিয়েছে!'

আমি বললুম, 'কিন্তু কোনও জলচর জীবই দুই পায়ে ভর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে পারে না! কুমির ডাঙায় ওঠে, তার পায়েরও অভাব নেই—কিন্তু চারখানা পা।'

পরেশ এক কথায় সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তাহলে এগুলো পায়ের দাগের মতন দেখতে বটে, কিন্তু পায়ের দাগই নয়!'

নবীনও সায় দিয়ে বললে, 'সেই ঠিক কথা! গঙ্গার স্রোতের তোড়ে বালির ওপরে এই অদ্ভুত দাগগুলো হয়েছে!'

আমিও তা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলুম না। এগুলো কোনও জীবের পায়ের দাগ হলে তাকে সৃষ্টিছাড়া আজগুবি জীব বলেই মানতে হয় এবং তেমন উদ্ভট জীব কলকাতার গঙ্গার চরে আসবে কেমন করে? এলেও খবরের কাগজের সর্বদর্শী রিপোর্টারদের চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারত না, অন্তত বাগবাজারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সর্বাগ্রেই তাকে আবিষ্কার করে ফেলত।'

যার আবদারে আমরা এই চিহ্নগুলি পরিদর্শন করতে এদিকে এসেছি, সেই ছন্দা কিন্তু এতক্ষণ আমাদের কাছে ছিল না, সে কখন সরে পড়ে দূরে গিয়ে চরের ওপরে বসে শিশুর মতো বালির ঘর তৈরি করতে ব্যস্ত ছিল!

কড়া রোদে ঘেমে উঠে ছন্দাকে ডেকে আমরা আবার পানসির দিকে ফিরে চললুম।

ছন্দা এসে বললে, 'আমার ভারী ভালো লাগছে। এক্ষুনি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'আর থাকার উপায় নেই। একটু পরেই জোয়ার আসবে, চর ডুবে যাবে।'

ছন্দা একটু ভেবে বললে, 'আচ্ছা, বড়দা, রাতে আবার এই দ্বীপটা জেগে উঠবে তো?'

'হ্যাঁ, ঘণ্টা চারেকের জন্যে।'

আজ তো পূর্ণিমে? সন্ধেবেলাতেই চাঁদ উঠবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আজ সন্ধেবেলায় এখানে সকলের নিমন্ত্রণ রইল। আমি চড়িভাতি করে তোমাদের সবাইকে খাওয়াব।'

পরেশ একটু ইতস্তত করে বললে, 'কিন্তু সে যে অনেক তোড়জোড়ের ব্যাপার! দরকার নেই ছন্দা!'

প্রস্তাবটায় নতুনত্ব আছে। আমি রাজি হয়ে গেলুম।

'তোড়জোড়ের জন্যে তোমাদের কারুকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না দাদা। আমি সব গোছগাছ করব, তোমরা খালি দয়া করে দুটো খেয়ে উপকার কোরো।'

এর পরেও আপত্তি করা অভদ্রতা, এবং পরেশ সেই অভদ্রতাই করলে। বললে, 'তুমি

যা মেয়ে, তা জানি। আবার জোয়ার না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়তেই চাইবে না! অতক্ষণ এই ভিজে বালির ওপরে বসে থাকলে অসুখ করবে। অতটা কবিত্ব আমার নেই।'

ছন্দা রেগে বললে, 'দাদা, গেল-জন্মে তুমি মাড়োয়ারি ছিলে, তোমার একটুও imagination নেই! বেশ, আমাদের জন্যে চারখানা ফোল্ডিং চেয়ারও আসবে, কারুকেই ভিজে বালিতে বসতে হবে না!...বড়দা, পানসিখানা আজ সন্ধে থেকে ভাড়া করে রেখো। প্রথমে চড়িভাতির ভোজ, তারপর চন্দ্রালোকে নৌকোয় করে গঙ্গায় ভ্রমণ,—ওঃ, ওয়ান্ডারফুল!'

॥ তিন ॥

ছন্দা, পরেশ ও নবীন নৌকোর ঘরের ভেতরে গিয়ে বসল, আমি গেলুম বুড়ো মাঝির কাছে।

'ওহে মাঝি, আজ সন্ধের সময়ে তোমার নৌকো নিয়ে আমরা আবার এই চরে আসব। তুমি ঘাটে তৈরি থেকো।'

'সন্ধের সময়? ওই চরে? কতক্ষণ থাকবেন?'

'যতক্ষণ জোয়ার না আসে।'

মাঝি চুপ করে রইল।

'কী হে, কথা কও না যে?'

মাঝি খুব মৃদুস্বরে বলল, 'সন্ধের পরে ওই চরে কেউ থাকে না। জায়গাটার বদনাম আছে।'

'বদনাম! কীসের বদনাম!'

অল্পক্ষণ ইতস্তত করে মাঝি বললে, 'কীসের বদনাম জানি না বাবু! আমাদের বুদ্ধু ওখানে হারিয়ে গিয়েছিল।'

'কেমন করে? ওখানে তো হারিয়ে যাওয়ার উপায় নেই?'

'তা নেই? কিন্তু বুদ্ধুকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে সে জলে ডুবে গিয়েছিল।'

'হতেও পারে, না হতেও পারে। ওই চরে আমরা নৌকো বেঁধেছিলুম। অন্ধকার রাত। আমরা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি, হঠাৎ কী দরকার হওয়াতে বুদ্ধু চরে গিয়ে নামল। তারপরেই শুনি সে বিকট চিৎকার করে উঠল। আমরা সবাই আলো-টালো নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু আর বুদ্ধুর সাড়া কি দেখা পাওয়া গেল না! ওই রাক্ষুসে চর যেন তাকে গিলে ফেললে!'

'চর নয়, মাঝি! তাকে গিলে ফেলেছিল এই গঙ্গা!'

'হতেও পারে, না হতেও পারে। তার কিছুকাল পরে আর এক রাতে বদরিও ওই চরে নৌকো বেঁধেছিল। সকালে উঠে দেখে, তাদের দলের একজন লোক নেই। সে যে কোথায় গেল, তা কেউ জানে না...বাবুজি, ও চরের ভারী বদনাম।'

'যত সব মিথ্যে ভয়। গঙ্গায় তো রোজই লোক ডুবছে, চরের দোষ দাও কেন?...তাহলে তোমার নৌকো পাওয়া যাবে না?'

'পাওয়া যাবে না কেন বাবুজি, পয়সার জন্যেই তো নৌকো চালাই। আপনি পয়সা দিচ্ছেন, আমরাও নৌকো আনব। তবে কিনা, জায়গাটার বদনাম আছে!'

নৌকোর ভেতরে আসতে ছন্দা বললে, 'বড়দা, মাঝির সঙ্গে অত কীসের কথা হচ্ছিল?'

'বাজে কথা!'

মিথ্যা তার মনে ভয় জাগানো উচিত নয়। আমার কাছে মাঝির গল্প হাস্যকর বলে মনে হচ্ছিল! তবে একটা ভয় আছে। চরে চোরাবালি নেই তো?

॥ চার ॥

গঙ্গা তখন চাঁদের আলোর সঙ্গে খালি খেলাই করছিল না, গল্পও করছিল কুলুকুলু স্বরে। সেই গল্প যারা বুঝতে পারে তারাই হয় কবি। আমরা কবি নই, আমাদের মন চড়িভাতির কথা ভেবেই সরস হয়ে উঠছে।

তা ছন্দা উদর-তৃপ্তির আয়োজন বড়ো কম করেনি। মাংস হবে, খিচুড়ি হবে, আরও কী কী হবে! ভীম নাগের সন্দেশ, নবীন ময়রার রসগোল্লা, আমের চাটনিও এসেছে এক বোতল। একে চড়িভাতি না বলে রীতিমতো ভোজের আয়োজন বলাই উচিত।

ছন্দা দুটো পেট্রলের লণ্ঠন জ্বাললে, যদিও আজকের পূর্ণিমায় তাদের দরকার ছিল না। তারপর দুটো ইকমিক কুকারে রান্না চড়িয়ে দিয়ে বললে, 'চলো, এইবারে দ্বীপে খানিকটা ভ্রমণ করে আমরা খিদে বাড়িয়ে আসি!'

নবীন গম্ভীর হয়ে বললে, 'খিদে দ্বিগুণ বাড়লে অতিরিক্ত খাবারের জোগান দেবে কেমন করে? মনে রেখো ছন্দা এখানে কলকাতার খাবারের দোকান নেই, আমরা বাস করছি এক অচেনা বিজন দ্বীপে!'

পরেশ বললে, 'রবিনসন ক্রুসোর দ্বীপের চেয়েও এ দ্বীপ ভয়ানক। এখানে ফ্রাইডের মতো বিশ্বস্ত ভৃত্যও মিলবে না যে খাবার কিনতে পাঠাব!'

ছন্দা হাত নেড়ে বললে, 'ওগো ক্ষুধার্ত ভদ্রলোকরা, থামো! তোমাদের ভুঁড়ির বহর জানা আছে!...চলো বড়দা!'

আমরা চর ধরে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখে নৌকো থেকে মাঝি সাবধান করে দিলে, 'বেশিদূর যাবেন না বাবু, এটা বেড়াবার জায়গা নয়!'

মাঝির কথার মানে বুঝে আমার হাসির পেলে। এখানে কীসের ভয়? আকাশ ভরে জাগছে চাঁদের মৌন সংগীত, কানে আর প্রাণে জাগছে ঠান্ডা বাতাসের গুঞ্জন এবং বালুচরের কূলে কূলে জাগছে গঙ্গার রচিত কবিতার ছন্দ! এপারে-ওপারে আলোর মালায় মালায় দেখছি যেন দীপাবলির উৎসব!

ছন্দা খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, 'মাঝিবুড়োর কথা শোনো! এটা বেড়াবার জায়গা নয় তো ঘুমোবার জায়গা নাকি?'

পরেশ বললে, 'আমার কীরকম ঘুম আসছে ছন্দা! ওই কুলুকুলু শব্দ, এই ঝিরঝিরে বাতাস আর এমন ঝিলমিলে জ্যোৎস্না! সবই কেমন স্বপ্নময়!'

আমি বললুম, 'সবই যখন স্বপ্নময় আর সংগীতময়, তখন ছন্দার গলাও আর চুপ করে থাকে কেন? ছন্দা, চলতে চলতে তুমিও রবি ঠাকুরের একটি গান ধরে ফ্যালো।'

ডান হাত দিয়ে নিজের বাঁ হাতের ওপরে সজোরে ও সশব্দে এক তালি বসিয়ে দিয়ে নবীন বলে উঠল, 'ঠিক বলেছ, লাখ টাকার এক কথা! এ সময়েও যদি রবি ঠাকুরের গান না হয় তাহলে বৃথাই তিনি সংগীত রচনা করেছেন! গাও ছন্দা!'

ছন্দা আপত্তি করলে না। রবীন্দ্রনাথের গান হচ্ছে প্রকৃতির নিজস্ব জিনিসের মতো, তার সঙ্গে আজকের এই জ্যোৎস্নামাখা গঙ্গার কলতান এমনি খাপ খেয়ে গেল।

আমি বললুম, 'চমৎকার ছন্দা, চমৎকার! এখানে মানুষের বীণা-বেণুর সঙ্গত নেই, তুমি যেন তাই গঙ্গার সুরে সুর মিলিয়েই গান ধরেছ!'

ছন্দা খানিকক্ষণ নীরবে কান পেতে গঙ্গার ঢেউয়ের গান শুনলে। তারপর বললে, 'গঙ্গার সুর? যদি তোমরা কেউ এখানে না থাকতে, যদি এই নির্জন চরে একলা বসে বসে আমাকে গঙ্গার এই কল্লোল শুনতে হত, তাহলে নিশ্চয়ই আমি ভয় পেতুম!'

'ভয় পেতে। সে কী!'

'চেয়ে দ্যাখো না, পূর্ণিমার চাঁদও পৃথিবীকে স্পষ্ট করতে পারেনি, আলোর সঙ্গে যেন আবছায়া মাখানো। কলকাতার বাড়িঘর এত কাছে, কিন্তু এই নির্জন নিরালা বালুচরের সঙ্গে আজ মানুষের কোনও সম্পর্কই আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে না! আজ আমরা যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছি! মনে হচ্ছে এই চরের যেন আত্মা আছে, আর মানুষের ছোঁয়া পেয়ে সে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে! গঙ্গার ডাক শুনছ? ও ডাক ছুটে আসছে যেন অতল পাতালের গভীর অন্ধকার থেকে—যেখানে হাসি নেই, আলো নেই, মানুষ নেই; যেখানে পাতা আছে শুধু শীতল মৃত্যুর কঙ্কাল-শয্যা, যেখানে দয়া-মায়া-প্রেমের নাম কেউ শোনেনি! গঙ্গার ও-ডাক কি সংগীত? ও যেন প্রাণদণ্ডের বাণী, ও যেন জীবনের বিরুদ্ধে মানুষের

বিরুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে অভিশাপময় নিষ্ঠুর প্রতিবাদ! মানুষের পক্ষে নিঝুম রাত্রে এখানে একলা থাকা অসম্ভব!'

পরেশ বিরক্ত হয়ে বললে, 'ছন্দা, তুই বড়ো বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতে শিখেছিস! তুই যেন আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিস!'

নবীন কিন্তু কোনও কথাই শুনছিল না, নিষ্পলক নেত্রে একদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে চমকে উঠল!

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম, খানিক তফাতেই দুটো উজ্জ্বল লণ্ঠন জ্বলছে আর কুকারে আমাদের খাবার সিদ্ধ হচ্ছে।

'নবীন, কী দেখে তুমি চমকে উঠলে? ওখানে তো দেখে চমকাবার মতো কিছুই নেই!'

নবীন অত্যন্ত অস্বাভাবিক স্বরে বললে, 'ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো!'

তীক্ষ্ণ চোখে আবার সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বুক ছম ছম করতে লাগল। ওখানে কিছুই নেই, কিন্তু তবু কিছু যেন আছেও! কী ওটা? ওকে কি শূন্যতার মধ্যে শূন্যতার মূর্তি বলব? না, চাঁদের আলোর মধ্যে ঘনীভূত আলোর মূর্তি? ওকে দেখাও যায়, দেখা যায়ও না। যেন নিরাকারের প্রকাণ্ড আকার, কিন্তু ভয়াবহ! পূর্ণিমায় ধবধব করছে বালুচর, কিন্তু পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে যেন আর একটা উজ্জ্বলতর আলোকের ছায়া ফেলে কে সেখানে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। আলোকের মধ্যে আলোকের ছায়া! আমার এই অদ্ভুত ভাষা শুনে লোকে হয়তো হাসবে, কিন্তু যা দেখলুম তা অমানুষিক বলেই মানুষী ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব! ওই অনামা ভয়ংকরের হাত-পা-দেহ বা মুখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বালির ওপরে কেউ ভারী ভারী পা ফেলে চললে যেমন বালি ছিটকে ছিটকে পড়ে, ওখানেও ঠিক তেমনি হচ্ছে!

তখন পরেশ ও ছন্দাও সেই দৃশ্যমান অদৃশ্যের ভীষণ অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছে, বা অনুভব করেছে!

ছন্দা আঁতকে বলে উঠল, 'ও কে বড়দা, ও কে? ও যে এগিয়ে যাচ্ছে, কুকারের দিকে!'

পরেশ সর্বপ্রথম সেই অবর্ণনীয় অলৌকিক মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে, 'আমরা সবাই কি হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছি? বানিয়ে বানিয়ে ভয়ের স্বপ্ন দেখছি? কই, ওখানে তো কেউ নেই! এসো আমার সঙ্গে!'

পরেশ দ্রুতপদে সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছে, আচম্বিতে দুটো ইকমিক কুকারই সশব্দে বালির ওপরে কাত হয়ে পড়ে গেল এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার ভেতরের খাবার-ভরা পাত্রগুলো! এবং পরমুহূর্তেই আমাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে, বয়ে গেল একটা ঠান্ডা কনকনে দমকা বাতাসের ঝটকা। ঝটকাটা যেমন হঠাৎ এল, চলে গেল তেমনি হঠাৎ।

পরেশ একবার হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে পড়েই আবার এগুবার উপক্রম করলে!

নৌকোর মাঝি কিছু দেখেছিল কি না জানি না, কিন্তু সে-ও সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবু, বাবু! নৌকোয় চলে আসুন!'

আমি বিহ্বলা ছন্দার হাত ধরে টেনে পানসির দিকে ছুটতে ছুটতে বললুম, 'নবীন! পরেশ শিগগির নৌকোয় চলো!'

॥ পাঁচ ॥

নৌকোয় চড়ে ঘণ্টাখানেক গঙ্গার বুকে ভেসে চললুম। বালুচর তখন চোখের আড়ালে।

সকলেই যে আমরা সেই চরের কথাই ভাবছি তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলেই এমনি অভিভূত হয়েছি যে মুখ যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

পানসি যখন হাওড়ার পুলের কাছে এসে পড়েছে পরেশ তখন বললে, 'আমরা কি কাপুরুষ! রজ্জুতে সর্পভ্রম করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এলুম! মাঝি, নৌকো ফেরাও! আমরা আবার সেই চরে যাব!'

মাঝি মাথা নেড়ে বললে, 'তা আর হয় না বাবুজি! যেতে যেতেই জোয়ার এসে পড়বে, চর ডুবে যাবে।'

ছন্দা বললে, 'চরে যা দেখেছি, আমার আর সেখানে যেতে ইচ্ছেও নেই।'

পরেশ উত্তেজিতভাবে বললে, 'চরে কী দেখেছি আমরা? কিছুই না—একটা ছায়া পর্যন্ত না! খানিকটা বাষ্প উড়ে গেলেও বুঝতুম; আমরা তাও দেখিনি! বোকা নবীনটা বাজে কী ধুয়ো তুললে, আর আমরাও সবাই হাউমাউ করে পালিয়ে এলুম! ছি ছি, কী লজ্জা!'

'ইকমিক কুকার দুটো কে ফেলে দিলে?'

'দমকা ঝোড়ো বাতাস! ঝড়ের মতো একটা বাতাসের ঝটকা তো আমাদেরও গায়ে লেগেছিল।'

'বালি উড়িয়ে কে ওখানে চলে বেড়াচ্ছিল?'

'বালি উড়ছিল ওই বাতাসেই!'

'আর সকালের সেই পায়ের দাগগুলো?'

'জানোই তো, সেগুলো পায়ের দাগই নয়, বালির ওপরে স্রোতের দাগ!'

ভাবলুম মাঝির গল্পটা বলি,—ওখানে পরে পরে দু-দুটো মানুষ কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, কেউ জানে না। কিন্তু বলতে গিয়ে বললুম না; কারণ নিশ্চয়ই উত্তরে শুনব, তারা জলে ডুবে মারা পড়েছে!

নবীন ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'হায়রে খিচুড়ি, হায়রে ফাউলকারি, হায়রে সন্দেশ-রসগোল্লা, আমের চাটনি! ওগো প্রিয়, তোমাদের পেয়েও হারালুম!'

ছন্দা বললে, 'চলো, চৌরঙ্গির কোনও হোটেলে গিয়ে খাবারের শোক আর পেটের জ্বালা নিবারণ করে আসি গে!'

বাবা মুস্তাফার দাড়ি

বিমল ও কুমার হচ্ছে নিছক অ্যাডভেঞ্চারের ভক্ত, সাধারণ গোয়েন্দাগিরি নিয়ে তারা কোনওদিন মাথা ঘামাত না। কিন্তু গোয়েন্দার প্রধান প্রধান গুণ, অর্থাৎ পর্যবেক্ষণশক্তি, চিন্তাশীলতা আর নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা তাদের দুজনেরই ছিল যথেষ্ট। এইসব কারণে তারা মাঝে মাঝে খুব সহজেই এমন সব শক্ত মামলারও কিনারা করে ফেলতে পারত বড়ো বড়ো পেশাদার গোয়েন্দারাও যাদের মধ্যে তল খুঁজে পায়নি। এই রকমেরই একটি ঘটনার কথা আজ তোমাদের কাছে বলতে চাই।

'ড্রাগনের দুঃস্বপ্নে'র গল্প যাঁরা শুনেছেন, বিমল ও কুমারের সঙ্গে কী করে ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুর প্রথম পরিচয় হয়, এরই মধ্যে তাঁরা নিশ্চয়ই তা ভুলে যাননি।

ওই ঘটনার কিছুদিন পরের কথা। বিমল ও কুমার একদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে অকারণেই সুন্দরবাবুর থানায় গিয়ে হাজির হল।

একটা টেবিলের ধারে সুন্দরবাবু চিন্তিত মুখে মাথার টাকে হাত দিয়ে বসেছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে বললেন, 'এই যে হুম! একেবারে যুগলে উদয়, ব্যাপার কী?'

কুমার হেসে বললে, 'কিছুই নয়। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম আপনার সঙ্গে দুটো গল্পগুজব করে যাই!'

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, 'আর গল্প করব! পোড়া অদৃষ্টে কি সে সুখ আছে? একটা বিচ্ছিরি মামলা নিয়ে মহা-ঝঞ্ঝাটে পড়া গেছে ভাই! তবু এসে যখন পড়েছেন, দু-কাপ চা খেয়ে যান!'

বিমল চেয়ার টেনে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'মামলাটা কী, শুনতে পাই না?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'শুনে কোনোই লাভ হবে না ভায়া, এ মামলার কিনারা করা অসম্ভব।'

'তবু শুনতে দোষ কী?'

'তাহলে শুনুন।...দিন কয় আগে আমারই এলাকায় এক রাত্রে হরেনবাবু নামে একটি ভদ্রলোক খুন হয়েছেন শুনে সকালে তদন্ত করতে গেলুম। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, ঘরময়

বইছে রক্তের ঢেউ, আর চারদিকে ছড়ানো কতকগুলো জিনিসপত্তর। তারই মাঝখানে হরেনবাবুর দেহ পড়ে রয়েছে। তাঁর মুখে, কাঁধে আর বুকে তিনটে গভীর ক্ষত, সেগুলো ছোরার আঘাত বলেই মনে হল। ঘরের অবস্থা দেখে বুঝলুম, হত্যাকারীর সঙ্গে হরেনবাবু রীতিমতো যোজাযুঝি করেছিলেন। মেঝেতে একটা মাঝারি আকারের ঘড়ি পড়ে রয়েছে, ঘড়িটা রাত বারোটা বেজে বন্ধ হয়ে গেছে দেখে বোঝা গেল, ঠিক ওই সময়েই ঘটনাটা ঘটেছে। রক্তের মধ্যে পাওয়া গেল কতকগুলো নিখুঁত জুতোর ছাপ!

'হরেনবাবুর সঙ্গে ওই বাড়িতেই তাঁর ছোটোভাই সুরেন বাস করে। হরেনবাবু বিপত্নীক আর নিঃসন্তান। সুরেন এখনও বিবাহ করেনি। বাড়িতে ওরা দুজন ছাড়া আর একজন প্রায় কালা বুড়ো চাকর থাকে, ঘটনার সময়ে সে একতলার ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার কানে কোনও গোলমালই ঢোকেনি। বাড়ির সদর দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, হত্যাকারী কোনও জিনিসই চুরি করেনি।

'বাড়ি খানাতল্লাশ করতে করতে সুরেনের ঘরে পাওয়া গেল একজোড়া রক্তমাখা জুতো। সে জুতো তারই, আর সেই জুতোর সঙ্গে হত্যাকারীর পদচিহ্ন অবিকল মিলে গেল। খুব সহজেই মামলার কিনারা হল ভেবে আমি তখুনি সুরেনকে গ্রেপ্তার করলুম। কিন্তু সুরেনকে বোধহয় আবার ছেড়ে দিতে বাধ্য হব।'

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'কেন?'

'সুরেন বলে ঘটনার রাত্রে সে তার এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত খেটেখুটে সে সেইখানেই শুয়ে পড়ে। তার পরদিন সকালে বাড়িতে ফিরে সেই-ই প্রথমে হত্যাকাণ্ড আবিষ্কার করে। সুরেনের এই বন্ধুর বাপ হচ্ছেন কলকাতা পুলিশেরই আর এক ইনস্পেকটর, তাঁর নাম অবনীবাবু। বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়িটা দেখে আমরা জেনেছি, হত্যাকাণ্ড হয়েছে রাত বারোটার সময়ে। শবব্যবচ্ছেদ করে ডাক্তারও সেই মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইনস্পেক্টার অবনীবাবু বলেন, সুরেন সে রাত্রে তাঁর বাড়ি ছেড়ে এক মিনিটের জন্যেও বাইরে যায়নি। কেবল অবনীবাবু নন, বিবাহ সভায় যারা উপস্থিত ছিল, তারা সকলেই একবাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়েছে। তারপরেও আর সুরেনকে ধরে রাখি কী করে? বিশেষ, তার সপক্ষে আর একটা মস্ত প্রমাণ রয়েছে।'

'কী প্রমাণ?'

'মৃত হরেনবাবুর হাতের মুঠোর মধ্যে গাছকয় পাকা চুল পাওয়া গিয়েছে। চুলগুলো নিশ্চয়ই হত্যাকারীর, ধস্তাধস্তি করবার সময়ে হরেনবাবু যে হত্যাকারীর চুল চেপে ধরেছিলেন, তাতে আর সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সুরেনের মাথায় একগাছাও পাকা চুল নেই।'

বিমল বললে, 'চুলগুলো একবার আমাকে দেখাবেন?'

'কেন দেখাব না? এই নিন' বলে সুন্দরবাবু ছোট্ট একটি কাগজের মোড়ক এগিয়ে দিলেন।

মোড়কটা খুলে বিমল বললে, 'একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিতে পারেন?'

'তা যেন দিচ্ছি, কিন্তু অতটা খুঁটিয়ে দেখবার কিছুই নেই। ওগুলো পাকাচুল, আর সুরেনের মাথার চুল সব কালো। আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।'

বিমল ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে চুলগুলো পরীক্ষা করে বলল,—'এই চুলগুলো কী প্রমাণ দিচ্ছে জানেন? হত্যাকারীকে মৃত হরেনবাবু চিনতেন, আর খালি তার মাথার লম্বা পাকাচুল নয়, মুখেও দাড়ি গোঁফ ছিল।'

সুন্দরবাবু ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কী করে জানলেন আপনি?'

'পরে তা বলব। আপনি আর নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি?'

'না। তবে হরেনবাবুর মৃত্যুর দিন দশেক পরে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর এক আত্মীয় মরবার সময়ে উইল করে তাঁদের দুই ভাইকে এক লক্ষ টাকা দান করে গিয়েছেন। কিন্তু এই উইলের খবর তাঁরা কেউ জানতেন না, কারণ হরেনবাবুর মৃত্যুর মোটে চার দিন আগে ওই আত্মীয়টি মারা পড়েন। এখন অ্যাটর্নি বাড়ি থেকে এই খবর সবে প্রকাশ পেয়েছে।'

বিমল অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'হরেনবাবুর অবর্তমানে এখন সুরেনই সব টাকার মালিক হবে তো?'

'হ্যাঁ! কিন্তু সুরেনও যদি ফাঁসিকাঠে ঝোলে, তাহলে তাদের সব সম্পত্তি যাবে হরিহরের হাতে।'

'হরিহর আবার কে?'

'হরেন আর সুরেনের খুড়তুতো ভাই। ঠিক পাশেই তার বাড়ি।'

'সেখানে কিছু খোঁজ নিয়েছেন?'

'তা আবার নিইনি, আমি কি তেমনি কাঁচা ছেলে হে? কিন্তু হরিহর সমস্ত সন্দেহের বাইরে। কারণ প্রথমত, খুনের সময়ে সে উইলের ব্যাপার জানত না, আর জানলেও সুরেন থাকতে তার সম্পত্তি লাভের কোনও সম্ভাবনাই নেই। দ্বিতীয়ত, তার পায়ের জুতো হত্যাকারীর জুতোর দাগের চেয়ে আধ ইঞ্চি ছোট। তৃতীয়ত, তারও মাথায় পাকাচুল নেই। চতুর্থত, সে পাবলিক থিয়েটারের অভিনেতা। ঘটনার দিনে থিয়েটারে এক বিশেষ অভিনয় ছিল, অর্থাৎ সারারাত্রিব্যাপী অভিনয়। তিন-তিন খানা নাটকে তার পার্ট ছিল। আমি থিয়েটারে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, হরিহর ঘটনার পরদিন ভোর সাড়ে ছ-টায় বাড়িতে ফিরেছে। বিমলবাবু, আপনাদের সঙ্গে গল্প করব কী, আমি এখন অকূল পাথারে ভাসছি,—হুম, গল্প করতে আমার একটুও ভালো লাগছে না!'

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার দুরবস্থা দেখে আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে! আচ্ছা, আজ

আর বেশিক্ষণ আপনার সময় নষ্ট করব না, কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসা করে বিদায় হব।'

'কী কথা?'

ঘটনাস্থলের কাছে, মাঝরাতে সেদিন যে পাহারাওয়ালা রাস্তায় পাহারায় ছিল, তাকে একবার ডেকে দিন।'

পাহারাওয়ালা এল।

বিমল শুধোলে, 'তোমার নাম কী?'

'চন্দর সিং।'

'আচ্ছা চন্দর সিং, যে বাড়িতে খুন হয় তার কাছ থেকে কত তফাতে তুমি পাহারায় ছিলে?'

'পাঁচ-ছ খানা বাড়ির পরেই।'

'খুন হয়েছে রাত বারোটার সময়ে। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়োনি তো?'

চন্দর সিং আহত কণ্ঠে বললে, 'পাহারা দিতে দিতে কোনওদিন আমি ঘুমোইনি, হুজুর!'

'বেশ, বেশ, তুমি দেখছি অসাধারণ পাহারাওয়ালা! তাহলে রাত বারোটার সময় তুমি কি কোনও আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলে?'

'না হুজুর!'

'এখন শীতকালের রাত। বারোটার সময়ে পথে খুব কম লোক চলে। ঘটনাস্থলের কাছে রাত বারোটার সময়ে তুমি কি এমন কোনও লোক দেখেছিলে, যাকে দেখলে সন্দেহ হয়?'

'তিন-চার জন লোককে দেখেছিলুম, কিন্তু কারুর ওপরে আমার সন্দেহ হয়নি!'

'এমন কোনও লোকই দ্যাখোনি, যার মাথায় ছিল লম্বা পাকা চুল, আর মুখে ছিল পাকা গোঁফ-দাড়ি?'

চন্দর সিং অল্পক্ষণ ভেবেই বলে উঠল, 'হ্যাঁ হুজুর, দেখেছিলুম। একটা বুড়ো বাঙালি-মুসলমান রাত বারোটার খানিক পরেই আমার সামনে দিয়ে হনহন করে চলে গিয়েছিল বটে।'

'কী করে জানলে, সে বাঙালি-মুসলমান?'

'তার পরনে ছিল বাঙালির মতো আলোয়ান, ধুতি আর পিরান, কিন্তু পশ্চিমা মুসলমানদের মতো তার মাথায় ছিল লম্বা পাকা চুল আর মুখে ছিল লম্বা পাকা গোঁফ-দাড়ি।'

'তাকে দেখে তোমার কোনও সন্দেহ হয়নি?'

'সন্দেহ হয়নি বটে, তবে একটা কথা মনে হয়েছিল। তার মাথার চুল আর মুখের গোঁফ-দাড়ি বেজায় বুড়োর মতন ধবধবে সাদা, কিন্তু সে হনহন করে হাঁটছিল খুব জোয়ান লোকের মতোই!'

'শাবাশ চন্দর সিং! এতটা তুমি লক্ষ করেছিলে? সত্যিই তুমি অসাধারণ পাহারাওয়ালা। আচ্ছা, আমার আর কিছু জানবার নেই।'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, 'কী আশ্চর্য বিমলবাবু, এই বুড়ো বাঙালি মুসলমানটিকে আপনি আবার কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন? আমরা পেয়েছি কেবল গাছকয়েক লম্বা পাকা চুল, কিন্তু দাড়ি-গোঁফই বা আপনি কেমন করে দেখতে পেলেন?'

বিমল সহাস্যে বললে, 'মানস চক্ষু আর কল্পনা শক্তি ব্যবহার করলে অনেক কিছু দেখা যায় সুন্দরবাবু! আমার মত কী জানেন? হত্যাকারীকে হরেনবাবু চিনতেন, তাই সে ছদ্মবেশ পরে খুন করতে গিয়েছিল। খালি পাকা চুলে মুখ লুকোনো যায় না, গোঁফ-দাড়িরও দরকার হয়।'

'তাহলে আপনি বলতে চান, খুনির মাথায় পাকা চুলের তলায় ছিল কাঁচা কালো চুল? আমরা যে সুরেনকে ধরেছি, তার মাথাতেও কালো চুল আছে। তবে কি সুরেনই—'

বাধা দিয়ে বিমল বললে, 'শীঘ্রই আবার দেখা হবে, তখন সব বলব।' এই বলে সে কুমারের হাত ধরে থানা থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু চেয়ারের ওপরে আড় হয়ে পড়ে মুখভঙ্গি করে বললেন, 'হুম! বিমলবাবু একটি আস্ত পাগল! খালি আস্ত নয়, মস্ত পাগল!'

পরদিন প্রভাতে থানায় আবার বিমল ও কুমারের আবির্ভাব! তখন সুন্দরবাবুর সঙ্গে একটি যুবক অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে জোরে সিগারেটে দম মারতে মারতে হাত-মুখ নেড়ে কথা কইছিল। বিমল লক্ষ করলে, যুবকের মাথায় বাবরি-কাটা চুল, মুখে পাউডারের চিহ্ন, গায়ে ফুলদার পাঞ্জাবি, পরনে জরিপাড় দিশি কাপড়, পায়ে বাহারি লপেটা,—হ্যাঁ, লোকটি রীতিমতো শৌখিন বটে!

সুন্দরবাবু বললেন, 'আরে, আসুন—আসুন, নমস্কার! আবার এক নতুন কাণ্ড দেখুন,— জাল-পুলিশের মামলা! এখুনি আবার হন্তদন্ত হয়ে তদন্তে ছুটতে হবে! যত বদমাইশ জুটেছে কিনা আমারই এলাকায়!'

বিমল বললে, 'জাল-পুলিশের মামলা!'

'হ্যাঁ। এই ভদ্রলোকেরই নাম হরিহরবাবু, হরেনবাবুর খুড়তুতো ভাই। ইনি সকালবেলায় থানায় অভিযোগ করতে এসেছেন, কাল দুপুরে পুলিশের লোকরা নাকি ওঁদের থিয়েটারে গিয়ে গোলমাল করে আর ওঁর সাজঘরে গিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে এসেছে! অথচ সত্যিকথা বলছি বিমলবাবু, আমরা এর বিন্দুবিসর্গও জানি না!'

বিমল হাসিমুখে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'নমস্কার হরিহরবাবু! আপনি নিজেই থানায় এসেছেন দেখে সুখী হলুম, কারণ, নইলে আমাদেরই এখুনি আপনার বাড়িতে ছুটতে হত!'

হরিহর বিস্মিত ভাবে ফ্যালফেলে চোখে বললে, 'মশাইকে তো এ জন্মে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।'

'উহুঁ, এ জন্মেও দেখেননি, গেল-জন্মেও দেখেননি বোধহয়। আপনি আর আমরা এক

জগতে বাস করি না তো! কিন্তু আমাকে না চিনলেও আপনি এই চুল-গোঁফ-দাড়িকে চেনেন কি?' বলেই বিমল একরাশ পরচুলা বার করে তুলে দেখালে।

হরিহরের মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গেল। তার পরেই সামলে নিয়ে সে বললে, 'ওগুলো কার, আমি জানি না।'

'জানেন না? বেশ, বেশ, তাহলে ভালো করে বসুন, ধীরে সুস্থে একটা ছোট্ট গল্প শুনুন। এ গল্পেরও পাত্রদের নাম হরেন সুরেন দুই সহোদর, আর তাদের খুড়তুতো ভাই হরিহর। হরেন-সুরেনের নামে এক আত্মীয় এক লক্ষ টাকা দিয়ে গেলেন। কিন্তু তারা সে সৌভাগ্যের কথা টের পাওয়ার আগেই, অ্যাটর্নি-বাড়ির কেরানি সুবোধের মুখ থেকে হরিহর খবরটা জেনে ফেললে, কারণ তারা দুজনেই এক থিয়েটারে অভিনয় করত।

'হরিহর দেখলে, রাতারাতি বড়োলোক হওয়ার এ একটা মস্ত সুযোগ! উইলের কথা এখনও কেউ জানে না, এই অবসরে হরেন আর সুরেনকে পথ থেকে সরাতে পারলেই লাখ টাকা তার হাতের মুঠোয়! হরিহর মূর্খ হলেও বোকা নয়, চট করে একটা শয়তানি ফন্দি এঁটে ফেললে।

'সে রাত্রে তাদের থিয়েটারে বিশেষ অভিনয়, তিন-তিনটে পালা শেষ হতে রাত কাবার হয়ে যাবে। প্রথম পালা 'কণ্ঠহার' শুরু হল সন্ধ্যার মুখে। তারপর আরম্ভ হল 'চন্দ্রগুপ্ত', রাত এগারোটার সময়ে। এ পালায় হরিহর সাজলে আলেকজান্ডার। মিনিট পনেরোর মধ্যে তার পার্ট শেষ হয়ে গেল। তার পরে শেষ পালা 'আলিবাবা'য় তার 'বাবা মুস্তাফা' সাজবার কথা, অর্থাৎ মাঝে তার একটানা ঘণ্টা-পাঁচেক ছুটি। হরিহর সবাইকে জানালে, সে থিয়েটারের ওপরের একটা ঘরে এই সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু সে ঘুমোতে গেল না। থিয়েটার থেকে তার বাড়ি মিনিট পনেরোর পথ। হরিহর লুকিয়ে বাড়িতে গিয়েই হাজির হল, কারণ সে জানে থিয়েটারের সবাই নিজের নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকবে, তার পার্টের সময় না হলে কেউ তাকে খুঁজবে না।

হরিহর বাবা মুস্তাফার পাকা চুল আর দাড়ি-গোঁফ সাজঘর থেকে লুকিয়ে সঙ্গে এনেছিল। নিজের বাড়িতে এসে সেইগুলো সে পঁরে নিলে, কারণ এবারে তাকে পাশের বাড়িতে যেতে হবে, সেখানে সবাই তাকে চেনে!

হরিহর নিজের বাড়ির ছাদ থেকে পাশের বাড়িতে গেল। সে জানত, সুরেন আজ বিয়ে-বাড়িতে থাকবে। প্রথমে সে সুরেনের শূন্য ঘরে ঢুকে জুতো চুরি করলে। তারপর অন্য ঘরে গিয়ে হরেনকে আক্রমণ করলে। হরেন তাকে বাধা দিতে গেল, পারলে না, কেবল হরিহরের মাথায় একগোছা পরচুলা রইল তার হাতের মুঠোয়!

ধস্তাধস্তির সময়ে ঘরের টেবিলের ওপর থেকে ঘড়িটা যে মাটিতে পড়ে ঠিক রাত বারোটায় বন্ধ হয়ে গেল, এটাও সে জানতে পারলে না। জানলে নিশ্চয়ই সাবধান হত।

খুনের পর হরিহর সুরেনের জুতো পরে রক্তের ওপরে পায়ে হেঁটে চলে বেড়াল। তারপর সরে পড়বার আগে জুতোজোড়া যথাস্থানে রেখে দিয়ে গেল।

হরিহর বুঝলে, ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে ধরা পড়ে সুরেনের ফাঁসি হবেই। তখন লাখ টাকা ভোগ করবে সে একলা। এক ঢিলে মরবে দুই পাখি।

ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই হরিহর থিয়েটারে ফিরে ওপরের ঘরে ঢুকলে। কিন্তু থিয়েটারে পালিয়ে আসবার সময়ে সে যে তাড়াতাড়িতে নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে ভুলে গিয়েছিল, পাহারাওয়ালা চন্দর সিংহের মুখে আগেই আমরা সেটা জানতে পেরেছি।...ওদিকে থিয়েটারে 'আলিবাবা'র সময়েও তাকে স্টেজে না দেখে ড্রেসার ওপরে এসে হরিহরের কপট নিদ্রা ভঙ্গ করলে। সে যে থিয়েটারেই শুয়েছিল, তারও একজন সাক্ষী রইল।

হরিহর বাবা মুস্তাফার পরচুলা পরে সে রাত্রে যখন যখন অভিনয় করতে নামল, তখন দুটি সত্য জানতে পারেনি। প্রথমটি হচ্ছে, মৃত হরেনের মুঠোর চুলের সঙ্গে মুস্তাফার মাথার ছেঁড়া পরচুলা মেলানো সম্ভবপর হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বাবা মুস্তাফার দাড়ির এক অংশে হরেনের রক্ত লেগে আছে।

সে নির্ভাবনায় পরচুলা সাজঘরেই রেখে গেল। এই হচ্ছে সেই পরচুলা। হরিহর নিজেই একবার পরীক্ষা করে দেখুক।'

কিন্তু কে পরীক্ষা করে দেখবে? হরিহর তখন চেয়ারের ওপরে বসে-বসেই দারুণ আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকবার পর বললেন, 'হুম! আপনি কি তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছেন বিমলবাবু? এত অসম্ভব কথা জানলেন কী করে?'

বিমল বললে, 'আপনিও যদি আমার মতো যত্ন করে হরেনের মুঠোর চুলগুলো পরীক্ষা করতেন তাহলেই বুঝতে পারতেন, ওগুলো রুক্ষ মরা চুল, অর্থাৎ পরচুলা। তাইতেই সর্বপ্রথমে আমার সন্দেহ হল, হত্যাকারী নিশ্চয়ই সকলকার পরিচিত লোক, তাই ছদ্মবেশ পরে খুন করতে যায়। তারপর যখন শুনলুম হরেন-সুরেনের অবর্তমানে লাখ টাকার মালিক হবে হরিহর, তখনই আমার কড়া নজর পড়ল তার ওপরে। সে থিয়েটারের অভিনেতা শুনে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। কারণ কে না জানে, অভিনেতারাই পরচুলা নিয়ে নড়াচড়া করে? এই একটা ছোট্ট সূত্র আপনার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল বলেই আপনি গোলকধাঁধায় পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।'

সুন্দরবাবু নিজের গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্বীকার করছি, আমি হচ্ছি মস্ত হাঁদা-গঙ্গারাম! কিন্তু, তারপর?'

'তারপর আর কী, পথ খুঁজে পেয়েই আমি থিয়েটারে ছুটলুম। জাল-পুলিশ সেজে

খোঁজখবর নিতে লাগলুম। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে অ্যাটর্নি-বাড়িতেও গিয়ে খবর পেয়েছি, ওখানকার কেরানি সুবোধও হরিহরের সঙ্গে অভিনয় করে, আর লাখ টাকার উইলের গুপ্তকথা তার কাছে থেকেই হরিহর সব আগে জানতে পারে। থিয়েটারে গিয়ে প্রথমে আমি খোঁজ নিলুম, ঘটনার রাত্রে হরিহর কখন কোন নাটকে অভিনয় করেছিল। হিসাব করে দেখলুম, রাত এগারোটার পর প্রায় পাঁচঘণ্টা তাকে সাজতে হয়নি, আর সেই সময়টার মধ্যে কেউ খোঁজও নেয়নি যে, সত্যসত্যই সে থিয়েটারে আছে কিনা! তারপর আমার কাজ খুবই সোজা হয়ে গেল। এর ওপর সাজঘরে খানাতল্লাশ করে যখন বাবা-মুস্তাফার ছেঁড়া চুল আর রক্তাক্ত দাড়ি পাওয়া গেল, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। বাকি গল্পটা আমি আন্দাজে রচনা করেছি, কিন্তু তা যে মিথ্যা নয়, সেটা আপনারা সকলেই দেখছেন তো?...আচ্ছা সুন্দরবাবু, আমার কাজ ফুরোল, এখন আমরা সরে পড়ি, কী বলেন?'

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মহা-উৎসাহে বিমলের হাত চেপে ধরে বললেন, 'সে কী, বিলক্ষণ! আমার ঘাড় থেকে এতবড়ো বোঝা নামিয়ে দিলেন, অন্তত কিছু মিষ্টিমুখ করে যান...ওরে, কে আছিস রে! শিগগির এক টাকার ভালো সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে আয় তো!'

বাগানের বাঘ

মুকু, নমু, দীপু, মঞ্জু আর প্যাঁচাবাবুর সঙ্গে তোমাদের এখনও পরিচয় হয়নি বোধহয়?

এরা হচ্ছে ভাই-বোন। দীপু আর প্যাঁচা হচ্ছে ভাই, মুকু, নমু আর মঞ্জু হচ্ছে বোন।

সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে প্যাঁচা আর মঞ্জু, কিন্তু সবচেয়ে ডানপিটে হচ্ছে তারা দুজনেই। দুষ্টুমি বুদ্ধিতে দাদা-দিদিরা তাদের কাছে থই পায় না।

তাদের জ্বালায় দাদু বেচারার ঘুমিয়েও শান্তি নেই। মঞ্জু চুপি চুপি গিয়ে ঘুমন্ত দাদুর নাকের ভেতরে করবে নস্যির ডিবে খালি, আর কাঁচি নিয়ে প্যাঁচা দেবে দাদুর গোঁফজোড়া কচ করে ছেঁটে। দাদুকে শাস্তি দেওয়ার এমনি নিত্য-নতুন ফন্দি আবিষ্কার করতে তাদের জুড়ি নেই।

মুকু, নমু আর দীপু অতটা দুষ্টুমি করে না বটে, কিন্তু দাদু যখন ভয়ানক হাঁচতে হাঁচতে জেগে উঠে ঠোঁটে হাত দিয়ে শখের গোঁফজোড়া আর খুঁজে পান না, তখন তাদের একটুও দয়া হয় না, উলটে তারা খিলখিল করে হেসেই খুন হয়। দাদু যদি রেগে ওঠেন তবে তারাও আরও জোরে হেসে ওঠে।

রাগ করলেও যেসব নাতি-নাতনির হাসির ধুম বাড়ে, তাদের নিয়ে কী আর করা যায় বলো? দাদু তখন নাচার হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা দাদু, আচ্ছা, দিদি, তোমরা কি আমাকে একটু ঘুমোতেও দেবে না?'

নমু ঘাড় নেড়ে বলে, 'না, আমাদের সামনে ঘুমটুম চলবে না।'

মুকু গম্ভীর মুখে বলে, 'দাদু হলে ঘুমোতে নেই।'

দাদু বলেন, 'তা হলে আমায় কী করতে হবে শুনি?'

দীপু বলে, 'খালি গল্প বলতে হবে।'

'অর্থাৎ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে হবে? বেশ! এখন হুকুম করো, কী গল্প শুনতে চাও?'

দীপুর বড়ো শখ, বাঘ শিকার করবে। সেইজন্যে সে একটা এয়ারগানও কিনেছে। দুই চোখ পাকিয়ে বলল, 'বাঘের গল্প।'

দাদু কোনওরকমে গোঁফের শোক সামলে বাঘের গল্প শুরু করলেন।

নস্যির ডিবে আর কাঁচি নিয়ে মঞ্জু আর প্যাঁচা চক্ষুলজ্জার খাতিরে ঘরের বাইরে পালিয়ে গিয়েছিল। গোঁফ-ছাঁটা দাদু হাঁচি থামিয়ে গল্প শুরু করেছেন শুনেই তাদের সমস্ত চক্ষুলজ্জা একেবারেই ছুটে গেল। গুটি গুটি ঘরে ঢুকে দাদুর পিছনে এসে ভিজেবিড়ালের মতো শান্তভাবে গল্প শুনতে বসল।

দাদু সেই পুরোনো বই 'কঙ্কাবতী'-র গল্প বলতে লাগলেন। বনের ভেতরে একরকম শিকড় পাওয়া যায়, যার গুণে মানুষ নাকি বাঘের রূপধারণ করতে পারে। বলা বাহুল্য, গল্পটা জমে উঠল রীতিমতো।

গল্প শেষ হলে পর দীপু বললে, 'আচ্ছা দাদু, বাঘরা তো ঝোপে জঙ্গলে থাকে?'

'তা নয় তো কী?'

প্যাঁচা বললে, 'আমাদের খিড়কির বাগানে তো অনেক ঝোপঝাপ আছে। সেখানে দিনের বেলায় রোজ আমরা খেলা করি, কিন্তু বাঘ-টাঘ তো দেখিনি, দাদু!'

প্যাঁচাই যে তাঁর গোঁফজোড়াকে বলি দিয়েছে, দাদু এটা বুঝতে পেরেছিলেন, কাজেই তাকে ভয় দেখাবার জন্যে তিনি বললেন, 'দিনে ওখানে বাঘ থাকে না বটে, কিন্তু রোজ রাতে আসে। এবার দুষ্টুমি করলেই তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে।'

প্যাঁচা হচ্ছে বিষম ছেলে, ভয় পাওয়ার পাত্রই নয়। বলল, 'ইস, গুলতি ছুড়ে বাঘের মাথা ফাটিয়ে দেব!'

দাদু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'গুলতি ছুড়ে বাঘের মাথা ফাটাতে চাও ফাটিয়ো, কিন্তু দেখো ভাই, ও জিনিসটি নিয়ে বুড়োদাদুর টাকের দিকে যেন টিপে কোরো না।'

সেইদিনই সন্ধ্যার আগে দাদা-দিদিদের পরামর্শ সভার এক গোপনীয় অধিবেশন হল। সভাপতিরূপে দীপুবাবু এই ছোট্ট বক্তিতাটি দিলেন

'দাদুর মুখে শোনা গেল, যেখানে জঙ্গল, ঝোপঝাপ থাকে সেইখানেই রাতের বেলায় বাঘেরা বেড়াতে আসে। আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে ফুলগাছের চেয়ে ঝোপঝাপই বেশি। দিনের বেলায় আমরা সবাই স্বচক্ষে দেখেছি, তার ভেতরে গিরগিটি থাকে, বেজি থাকে,

হেলে সাপ থাকে, ডাঁশ-মশা থাকে, সুতরাং রাত্তিরে সেখানে বাঘেরাই বা আসবে না কেন? আমার এয়ারগান আছে, আর প্যাঁচার আছে গুলতি। আজ আমরা বাঘ শিকার করব।'

একখানা গিনি-চকোলেট চুষতে চুষতে মুকু বললে, 'কিন্তু দাদুর গল্পে শুনলি তো, সে বাঘ মানুষ-বাঘও হতে পারে।'

দীপু বললে, 'তুমি আর হাসিয়ো না দিদি! মানুষ কখনও বাঘ হতে পারে? ওসব হচ্ছে গল্পের কথা।'

নমু বললে, 'কিন্তু রাত্তিরে যে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি?'

—'আজ আর কেউ ঘুমোব না। বাবা-মা ঘুমোলেই আমরা পা টিপে টিপে ঘর থেকে পালিয়ে আসব।'

'কিন্তু দীপু, রাত্তিরে বাগানে বাঘ ছাড়া আরও কেউ কেউ তো বেড়াতে আসতে পারে?'

'আবার কে আসবে?'

'ভূত আর পেতনি? আমাদের দেখতে পেলে তারা কী বলবে?'

এইখানেই দীপু মস্ত ধাঁধায় পড়ে গেল। সে বাঘ শিকার করতে পারে, কিন্তু ভূত-পেতনির সঙ্গে দেখা করতে রাজি নয়। বাপ রে, তাদের পায়ের গোড়ালি নাকি সামনের দিকে। যদি 'কঙ্কাবতী'র ঘ্যাঁঘো, নাকেশ্বরী প্রভৃতির উদয় হয়, তবে তাদের সামলানো তো বড়ো চারটি-খানিক কথা নয়। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দীপু মাথা চুলকোতে লাগল।

প্যাঁচা বললে, 'ভাবছিস কেন দাদা, বাগানে না গিয়েও তো বাঘ শিকার করা যায়!'

'কেমন করে?'

'বাগানের ওপরেই তো আমাদের হলঘর। জানলার পাল্লাগুলো একটুখানি ফাঁক করে ভেজিয়ে রেখে আমরা লুকিয়ে বাগানের দিকে নজর রাখব। ভূত-পেতনিরা আমাদের দেখতেও পাবে না, কিন্তু বাঘ দেখলেই আমরা বন্দুক আর গুলতি ছুড়তে পারব।'

প্যাঁচা বয়সে ছোটো হলে কী হয়, তার পদ্ধতিটিই যে উদ্যানবাসী প্রেতাত্মাদের হাত থেকে নিস্তার লাভ করবার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ, সভ্যদের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতভেদ হল না।

কিন্তু মঞ্জু প্রতিবাদ করে বললে, 'বা রে, আমার বন্দুকও নেই গুলতিও নেই, আমি কী নিয়ে বাঘ শিকার করব?'

দুই দিদিই একসঙ্গে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'মেয়েরা বাঘ শিকার করে না, মেয়েরা খালি দেখে।'

কিন্তু এই কচি বয়সেই মঞ্জুর মনের মধ্যে নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে-ও প্রবল মাথা-নাড়া দিয়ে বললে, 'ওসব হবে-টবে না, বাঘ শিকার আমি করবই!'

বুদ্ধিমান প্যাঁচাই আবার মঞ্জুকে ঠান্ডা করবার জন্যে বল্লে, 'হ্যাঁ রে মঞ্জু, তুইও শিকার করবি বই কি! কিন্তু সবাই একরকম অস্তর নিলে চলবে কেন? তুই কতগুলো বড়ো বড়ো ইট-পাথর নিয়ে আয়, বাঘ দেখলেই দমাদ্দম ছুড়ে মারবি।'

রাত এগোরাটার পর প্যাঁচা লেপের ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখলে, মা আর বাবা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। প্যাঁচা নিজের মনেই বললে, 'বাবার সঙ্গে মা রোজ ঝগড়া করেন, তাঁর নাক নাকি ডাকে না। হুঁ, এই তো আমি নিজের কানে শুনছি, মা-র নাক দস্তুরমতো ডাকে! রোসো, কাল বাড়িসুদ্ধু সব্বাইকে বলে দিচ্ছি।'

তারপর প্যাঁচা চিমটি কেটে আর সব ভাইবোনকে জাগিয়ে দিলে। সকলে একে একে হলঘরে গিয়ে জুটল।

হলঘরের একটা জানলায় গুলতি নিয়ে প্যাঁচা, আর-একটা জানলায় বন্দুক নিয়ে দীপু, আর-একটা জানলায় মঞ্জু গিয়ে দাঁড়াল—তার সামনে রাশিকৃত ইট-পাথর, এমনকি দুটো ভাঙা বোতল পর্যন্ত। মুকু আর নমু দুজনে একসঙ্গে আর-একটা জানলায় গিয়ে আশ্রয় নিলে, তারা নিরস্ত্র—কারণ শিকার করবার নয়, কেবল শিকার দেখবারই শখ তাদের আছে।

ভেজানো জানলার ফাঁক দেখা গেল, বাগানে আবছা চাঁদের আলো এসে চারদিক করে তুলেছে ছায়ামায়াময়। কোথাও জনপ্রাণী নেই—শব্দের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কেবল গাছে গাছে বাতাসের কান্না আর ঝোপেঝাপে ঝিঁঝিদের একঘেয়ে ডাক। বাঘের দেখা বা সাড়া নেই।

কিন্তু তাদের মনের ভেতরে তখন বাসা বেঁধেছে শিকারির ধৈর্য, কাজেই অন্ধকার ঘরে সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

হলঘরের বড়ো ঘড়িতে যখন বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত বেজে গেল এবং বাঘের আশায় তারা যখন দিয়েছে জলাঞ্জলি এবং নমু ও মুকু যখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই চোখ মুদে ঘুমোবার চেষ্টা করছে, তখন প্যাঁচার মনে হল, ছায়ার মতন কী একটা বড়ো মূর্তি সাঁৎ করে এ ঝোপ থেকে ও ঝোপে গিয়ে ঢুকল। দীপুও দেখেছিল, মঞ্জুও দেখেছিল।

ঝোপ থেকে মূর্তিটা আবার যেই আত্মপ্রকাশ করলে, অমনি দীপু ছুড়লে হাওয়ার বন্দুক, প্যাঁচা ছুড়লে গুলতি এবং মঞ্জু ছুড়লে ভাঙা বোতল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্তনাদ—'বাপ রে, মা রে, মরে গেছি রে!'

এ যে মানুষের গলা! 'ওগো, মাগো, ভূত গো!' বলে চেঁচিয়েই নমুদিদি দিলে তিরবেগে সে ঘর থেকে চম্পট! দীপুদাদার শিকারের শখ উপে গেল, ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে তৎক্ষণাৎ সে বন্দুক ত্যাগ করলে। মুকুদিদির তো লেগে গেল দাঁতকপাটি। ভূতের জন্যে তারা কেউ প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু প্যাঁচা ভয় কাকে বলে জানে না, মঞ্জুও তাই। প্যাঁচা বললে, 'মঞ্জু, ছোড়, ইট,—

আমি ছুড়ি গুলতি। ওটা মানুষ-বাঘ, ওটাকে মেরে ওর কাছ থেকে শেকড় কেড়ে নিতে হবে!' ঝোপের ওপরে ফটাফট গুলতির গুলি আর ধপাধপ ইট বৃষ্টি হতে লাগল। কিন্তু বাঘের আর সাড়াই নেই।

নমু যখন নিজেদের ঘরে ঢুকে বিছানার ওপরে ঝাঁপ খেয়েছে, তখন গোলমালে তার মা-বাবার ঘুম গেছে ভেঙে। বাবা বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রে নমু, কী হয়েছে?'

'ও বাবা, বাগানে একটা ভয়ানক ভূত এসেছে'—বলেই সে সোজা লেপের ভেতরে ঢুকে গেল, কারণ সে জানত লেপের ভেতরে একবার ঢুকতে পারলে আর ভূতের ভয় থাকে না। নমুর বাবা লাঠি নিয়ে তখনই বাগানে ছুটলেন।

বাগানের ঝোপের ভেতরে পাওয়া গেল একটা হতভাগ্য চোরের অচেতন দেহ। তার রগে লেগেছিল গুলতির গুলি। তার দেহও ইট আর ভাঙা বোতলের চোটে রক্তাক্ত। কী অশুভক্ষণেই সে আজ এ বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল। তার অবস্থা দেখে তাকে থানায় না পাঠিয়ে হাসপাতালেই পাঠানো হল।

কিন্তু দাদুর অবিচারটা দ্যাখো! কোথায় এইসব বীর নারী ও বীর পুরুষকে অভিনন্দন দেবেন, না তিনি কিনা ফস করে বলে বসলেন, 'আজকেই ও সর্বনেশেদের এয়ারগান আর গুলতি কেড়ে নিয়ে নিরস্ত্র করা হোক! আমার গোঁফ ওরা কেটে নিয়েছে, এইবারে ওদের নজর পড়বে আমার টাকের ওপরে।'

দাদুর সন্দেহ সত্য কি না জানি না, কিন্তু মুকু, নমু, দীপু, প্যাঁচা আর মঞ্জুকে তোমরা চিনে রাখো, কারণ ভবিষ্যতে ওদের সঙ্গে তোমাদের আবার দেখা হলেও হতে পারে।

সাপ, বাঘ, মুরগি

একত্রিশ বছর কেটে গেছে তারপর।

ছোটো ছোটো বন্ধুরা, একত্রিশ বছর আগে তোমরা কোথায় ছিলে? নিশ্চয়ই বলতে পারবে না, কারণ গতজন্মের কথা এ জন্মে মনে করা যায় না।

কিন্তু একত্রিশ বছর আগে আমি কোথায় ছিলুম জানো? উড়িষ্যায়। মনে হচ্ছে এ তো সেই সেদিনের কথা!

তখনকার একটি দিনের কথা আমার মনে আজও জ্বলজ্বল করছে। বিশেষ আশ্চর্য কথা নয়, তবে লোকের কাছে বললে নিতান্ত মন্দ শোনাবে না।

উড়িষ্যায় কোনওকালে নাগ রাজার রাজত্ব ছিল কি না জানি না, কিন্তু যতবারই ও-অঞ্চলে গিয়েছি, রকম-বেরকমের সাপের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

একবার ওখানে যেরকম গোখরো সাপ দেখেছিলুম, আজও তার জুড়ি খুঁজে পাইনি। এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে 'মৌচাক' পত্রিকার সম্পাদক মশাইকে আহ্বান করতে পারি। আমরা কয়েকজন সাহিত্যিক ও শিল্পী বন্ধু মিলে বাসা বেঁধেছি তখন ভুবনেশ্বরে।

এক লোক সাপ খেলাতে এসে এমন এক গোখরো বার করলে যাকে দেখেই আমাদের চক্ষু স্থির! ফনা না তুললে তাকে আমরা দূর থেকে অজগর সাপ বলেই ভ্রম করতে পারতুম। ইয়া লম্বা, ইয়া মোটা! মনে হচ্ছে রং ছিল তার চকচকে ও কুচকুচে কালো। হয়তো সেটা ছিল কেউটে জাতীয়।

আমরা ছিলুম উঁচু রোয়াকের ওপরে, সাপুড়ে ছিল উঠোনে। সেই নতুন-ধরা সাপটাকে বার করবামাত্র সে ভীষণ ফোঁশ শব্দের সঙ্গে ফনা তুলে প্রায় আড়াই ফুট উঁচু হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মৌচাক' সম্পাদকমশাই 'ইস' বলে চিৎকার করে পিছন না ফিরেই পিছন দিকে মারলেন মস্ত-লম্বা এক লম্ফ! সাপ আবার বলল, 'ফোঁশ'! 'মৌচাক' সম্পাদকও আবার বললেন, 'ইস!'—এবং তারপরেই পিছন দিকে আর-একটা তেমনি লাফ! আবার 'ফোঁশ!' আবার 'ইস!' এবং আবার লাফ! সম্পাদকমশাইয়ের বপুখানি ভগবানের ইচ্ছায় বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বাংলাদেশে যদি কোনওদিন পিছনদিকে লাফ মারার প্রতিযোগিতা হয়, তাহলে অমন হৃষ্টপুষ্ট গুরুভার দেহ নিয়েও 'মৌচাক'-সম্পাদক হবেন এখানকার চ্যাম্পিয়ন!

করদ রাজ্য সেরাইকেলা হচ্ছে উড়িষ্যার আর একটি দেশ, এখন মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। বছর তিনেক অগে সেরাইকেলার মহারাজা বাহাদুরের আমন্ত্রণে আমি দেশ-বিদেশে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলুম। প্রথম দিন বৈকালে পথে বেরিয়েই আধ মাইলের ভেতরেই পরে পরে তিনটি বাচ্চা সাপের সঙ্গে দেখা হল! স্থানীয় লোকদের ডেকে হরেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওগুলো কী সাপ?' তারা যে নাম বললে তা স্মরণে নেই, কিন্তু আর-একটি যে খবর দিলে তা ভোলবার নয়। তারা বললে, 'সেরাইকেলায় নাকি সময়ে সময়ে আকাশ থেকে সর্পবৃষ্টিও হয়। এ কথা সত্য কি না জানি না, কিন্তু যে তিন দিন সেরাইকেলায় ছিলুম আমি আর বাড়ি থেকে বেরোইনি। যে-দেশে সর্পবৃষ্টি হয় এবং পথে পথে পদে পদে সাপ করে কিলবিল সেখানে ছাদের তলার চেয়ে ভালো ঠাঁই আর নেই।

এইবারে একত্রিশ বছর আগেকার কথা বলি।

যাচ্ছি গরুর গাড়িতে চড়ে ভুবনেশ্বর থেকে খণ্ডগিরির দিকে। এ পথে তোমরা অনেকে নিশ্চয় গিয়েছ। দু-ধারে খেত, মাঠ, জঙ্গল, মাঝখানে মেটে পথ। তোমরা এ পথে গিয়ে নিরাপদেই ফিরে এসেছ, কিন্তু সেবার আমার যাত্রাটাই ছিল খারাপ। তিনবার তিন রকম সাপের সঙ্গে দেখা হয় যে যাত্রায়, তাকে ভালো বলি কেমন করে?

খণ্ডগিরি যাওয়ার পথে ছোট্ট একটি নদী বা নালা। গোরুর গাড়ি অনায়াসেই সেটা পার হয়ে গেল।

আরও খানিক এগিয়েই গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেলে একটা ঝোপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

সেদিকে ভালো করে তাকাতে-না-তাকাতেই দেখি, গাছের ওপর থেকে মাঝারি আকারের একটা অজগর নীচের একটা ছাগলের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাথার দিকটা কামড়ে ধরলে এবং তারপরেই তারা হারিয়ে গেল ঝোপের ভেতরে। কেবল ঝোপটা দুলতে লাগল ঘন ঘন।

সঙ্গীরা ভয় পেয়ে গাড়োয়ানকে আবার ভুবনেশ্বরে ফিরে যেতে বললেন।

কিন্তু গাড়োয়ান আবার গাড়ি চালিয়ে দিয়ে বললে, 'ভয় নেই বাবু, ও সাপ এখন শিকার নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকবে, আমাদের দিকে ফিরেও চাইবে না।'

অনেকের মতো আমারও আগে ভুল বিশ্বাস ছিল যে, অজগররা প্রথমে ল্যাজ দিয়ে জড়িয়ে শিকার ধরে। সেদিন ভুল ভাঙল।

তারপর খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির তলায় গিয়ে হাজির হলুম যথাসময়ে। ওখানকার বর্ণনা আর দেব না, কারণ ১৩১৬ সালের 'ভারতী' পত্রিকার সে বর্ণনা দিয়েছি।

ওখানে পাহাড়ের ওপরে ছোটো-বড়ো অনেক গুহা আছে—কোনওটির নাম রানিগুহা, কোনওটির নাম ব্যাঘ্রগুহা, কোনওটির নাম সর্পগুহা। কিন্তু সর্পগুহায় সাপ দেখিনি, দেখলুম আর একটি গুহায় গিয়ে। ভেতরে কালো রঙের মস্ত-বড়ো একটা ঝুড়ির মতন কী ওটা? ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যে কাছে এগিয়েই দেখি, প্রচণ্ড তীব্র দুটো হিংসুক চোখ নিষ্পলক হয়ে আমার পানে তাকিয়ে আছে! সাপ! অজগর সাপ! এমন প্রকাণ্ড ও স্থূল অজগর সাপ জীবনে আমি আর দেখিনি!

শুনেছি সাপের চোখে সম্মোহনী শক্তি আছে। আছে কি না জানি না, কিন্তু সেই অতিক্রুর দৃষ্টির সামনে আমার পা যেন পাহাড়ের পাথরের মধ্যে ঢুকে গেল আধ ইঞ্চি, আর নড়াতে পারলুম না। সঙ্গীরা তখনও নীচে, কিন্তু তাদের ডাকবার ক্ষমতাও হল না। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল, এইমাত্র পথে ছাগলটার যে দুর্দশা দেখেছি আমারও অদৃষ্টে আজ তাই লেখা আছে।

প্রাণের আশা যখন একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি, সাপটা তখন হঠাৎ কুণ্ডলি থেকে মাথা তুলে গুহার দেওয়ালের কোণে একটা বড়ো গর্তের ভেতরে ঢুকতে লাগল ধীরে ধীরে, খুব ধীরে! তার দেহ ঢুকছে আর ঢুকছেই, যেন তার শেষ নেই!

তখন সাড় হল। আমার প্রতি অজগরের এই অসম্ভব অনুগ্রহের কারণ বুঝতে পারলুম না, বুঝতে চেষ্টাও করলুম না, পাগলের মতো দৌড় মেরে নীচে এসে সকলের কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে সব কথা বললুম।

শুনে সঙ্গীরা তখনই পাহাড় থেকে নেমে গাড়িতে উঠে বসলেন। আমার উপরে সেদিন

বোধ হয় শনির দৃষ্টি ছিল, বললুম, 'তোমরা যাও, আমি পরে যাব। আমাকে খণ্ডগিরির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে হবে, গুহাগুলোর মাপজোক না নিয়ে আমার ফেরবার উপায় নেই।'

আমি থেকে গেলুম। তারপর মাপজোক নিতে নিতে কখন যে বেলা পড়ে এসেছে এবং আকাশে যে পুরু মেঘের উদয় হয়েছে, মোটেই তা খেয়ালে আসেনি। হঠাৎ গায়ে দু-চার ফোঁটা জল পড়তেই তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নামতে লাগলুম।

নীচে যখন নেমেছি, এমন তোড়ে বৃষ্টি এল যে দৌড়ে ডাকবাংলোয় ঢোকা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে যখন মেঘের অন্ধকার আরও ঘনিয়ে উঠল, বৃষ্টির সঙ্গে জাগল বিষম ঝোড়ো হাওয়া। বুঝলুম আজ এই নির্জন পার্বত্য অরণ্যেই দুর্যোগের রাত্রি কাটাতে হবে একাকী!

বাংলোর বেয়ারার কাছে খবর নিয়ে জানলুম, আপাতত খাবারের কোনও ব্যবস্থাই হতে পারে না।

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে একটা লণ্ঠন চেয়ে নিয়ে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে খাটে উঠে শুয়ে পড়লুম।

কী ঝড়! কী বৃষ্টি! অরণ্যের মর্মর আর্তরব, পাহাড়ের গা বেয়ে হুড় হুড় করে জল নেমে আসার শব্দ, মড় মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ার আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে আচম্বিতে জেগে উঠল ক্ষুধার্ত বা ক্রুদ্ধ বা জল-ঝড়ে বিপন্ন এক ব্যাঘ্রের গর্জনের পর গর্জন!

একলা সেই অচেনা ঘরে শুয়ে চারিদিকেই বিভীষিকার ছবি দেখে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠতে লাগলুম। একবার মনে হল ঘরের দরজা বন্ধ করিনি, বাঘটা যদি ভিতরে ঢুকে পড়ে? তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি,—না, দরজায় খিল দেওয়াই আছে!

তারপর সন্দেহ হল, খাটের তলায় বোধ হয় কেউ লুকিয়ে আছে!

আবার উঠলুম। লণ্ঠন নিয়ে খাটের তলায় একবার উঁকি মেরেই শিউরে এক লাফে আবার উপরে উঠে পড়লুম।

খাটের তলায় মেঝের উপরে এঁকেবেঁকে একটা একহাত লম্বা সাপ স্থির হয়ে পড়ে আছে।

এমন বিপদে কেউ পড়ে? খাটের উপরে আড়ষ্ট মূর্তির মতো বসে প্রায় অর্ধ অচেতনের মতো শুনতে লাগলুম বৃষ্টির শব্দ, ঝড়ের চিৎকার, অরণ্যের কান্না, ব্যাঘ্রের গর্জন।

আমার সেই সময়ের মনের ভাব, 'খণ্ডগিরির ডাকবাংলোয় রাত্রির ধ্বনি' নামে একটি কবিতায় ফোটাবার চেষ্টা করেছিলাম। কবিতাটি অনেককাল আগে 'ভারতী'তে ও 'আমার যৌবনের গান' পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। তার কয়েক লাইন এখানে তুলে দিলুম

'চুপ চুপ! ওই শোন—রম্-ঝম্ রম্-ঝম্!
ঝঞ্ঝার ঝন-ঝন—চারধার গম-গম!

অ্যাঁৎ সব ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ, স্যাঁৎ-স্যাঁৎ, হিম-হিম,
ঢাক মুখ, বোজ চোখ—ঝিম্-ঝিম্, ঝিম্-ঝিম্!
দুদ্দাড় ভাঙ দ্বার—ঝড় দেয় ঝাপটা,
বাঁশডাল টলটল—ফোঁসফোঁস সাপটা!
কুক্কুর ঘেউ-ঘেউ—ব্যাঘ্রের দলবল—
ঝরনার ঝর্ঝর—বন্যার কলকল!
বিছনায় আইঢাই, জান যায়, জান যায়,
ক্রন্দন হায়-হায় আন্ধার আবছায়!
ভয়-ভয় সবদিক—এই দিক, ওই দিক—
কে ধায়, কে চায়, কে গায়, নেই ঠিক!
কই চাঁদ—কই, কই,—আয় ভোর আয় আয়!
প্রাণটা হিমসিম—জান যায়, জান যায়!'

নিদ্রাদেবী সে রাত্রে আমার কাছে ঘেঁষতে সাহস করলেন না এবং কাছে এলেও আমি তাঁকে আমল দিতুম না। সেই ভাবেই ছবিতে আঁকা মানুষের মতো স্থির হয়ে সারারাত খাটের ওপরে বসে রইলুম।

অবশেষে ঝড় পালাল, বৃষ্টি থামল, বাঘ বিদায় নিলে, ভোর হল।

কিন্তু আমি এখন খাট থেকে নামি কেমন করে? পা বাড়ালেই সাপ-বেটা যদি ফোঁস করে কামড়ে দেয়?

সাপটা এখনও খাটের তলায় আছে কি না দেখবার জন্যে খুব সাবধানে হেঁট হয়ে একটুখানি মুখ বাড়ালুম।

আশ্চর্য! সে ঠিক তেমনি এঁকেবেঁকে সেইখানেই আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে! তবে কি ওটা মরা সাপ?

সকালের সঙ্গে সঙ্গে তখন আমার সাহসও ফিরে এসেছে। হাতের কাছেই আমার লাঠিগাছা ছিল, সেটা তুলে নিয়ে মেঝের ওপরে বার-কয়েক খটাখট শব্দ করলুম। তারপর আবার মুখ বাড়িয়ে দেখি, সাপটা একটুও নড়েনি।

তখন ভরসা করে লাঠিটা দিয়ে লাগালুম এক খোঁচা—সাপটার আড়ষ্ট দেহ খানিক তফাতে গিয়ে ছিটকে পড়ল, এতটুকু নড়ল না!

একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে খাট থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখি, সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক রং করা রবারের সাপ,—কলকাতার খেলনার দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

বাংলোর বেয়ারা আসতেই সাপটাকে তুলে তার দিকে ছুড়ে ফেলে দিলুম।

সে হাঁউমাঁউ করে চেঁচিয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল।

আমি বললুম, 'থাম থাম, অত চ্যাঁচাতে হবে না। ওটা রবারের সাপ।'

'রবারের?'

'হ্যাঁ। ওই খাটের তলায় ছিল। কিন্তু ওটা কোত্থেকে এল?'

খানিকক্ষণ রবারের সাপটার দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে বেয়ারার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'কাল সকালে এক বাবু বাড়ির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে এসেছিলেন। ওই সাপটাকে এক খোকার হাতে দেখেছিলুম। খোকাই বোধহয় ওটাকে ভুলে ফেলে গিয়েছে।'

সম্ভব। কিন্তু অজানা এক খোকার ভুলের জন্যে শাস্তি পেলুম আমি, নিয়তির এটা সুবিচার নয়।

উড়িষ্যায় বেড়াতে এসেছিলুম আমি পাঁচবার। কিন্তু এই খণ্ডগিরি থেকে ফেরবার পথে আরও দু-বার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল।

একবার সন্ধ্যার মুখে ভুবনেশ্বরে ফিরে যাচ্ছি। পথের পাশের ঝোপে ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে একটা চিতাবাঘ অনেকদূর পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল আমাদের গোরুর গাড়িকে। সম্ভবত তার দৃষ্টি ছিল গোরুদুটোর ওপরে।

আর-একবার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে খণ্ডগিরির ডাকবাংলোয় উঠেছি।

উড়ে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করা হল, এখানে সস্তায় মুরগি পাওয়া যায় কি না?

পাওয়া যায় শুনে মুরগি কেনবার জন্যে তখনই তাকে একটা টাকা দেওয়া হল।

তার পথ চেয়ে সকলে বসে আছি। ঘণ্টা তিনেক পরে বেয়ারা মস্ত এক বস্তা কাঁধে করে এসে হাজির।

ব্যারিস্টার-বন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভড় সবিস্ময়ে বললেন, 'এ কী ব্যাপার, একটিমাত্র টাকায় এক বস্তা মুরগি! এত সস্তা!'

পাছে বস্তার মধ্যে মুরগিগুলো দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ে সেই ভয়ে চটপট বস্তার মুখ খুলে ফেলা হল। দেখা গেল আমাদের ভয় অমূলক, মারা পড়বার কোনও উপায়ই নেই।

কারণ বস্তার মধ্যে রয়েছে কেবল কাঁড়ি কাঁড়ি মুড়কি। হতচ্ছাড়া উড়ে-বেয়ারা মুরগি আনেনি, কিনে এনেছে এক টাকার মুড়কি!

বিপদ-নাট্যের দুটি দৃশ্য

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে ছোটো ছোটো এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা বর্ণনা করলে গল্পের আসরে নিতান্ত মন্দ শোনায় না। বারকয়েক আমিও এমনি ঘটনা-বিপ্লবে পড়েছিলুম, অবশ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। আজ গুটি দুয়েক ঘটনার কথা তোমরা শোনো। কিন্তু মনে রেখো, এ দুটি সত্য-সত্যই সত্য ঘটনা!

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল বছর ষোলো আগে, দেওঘরে। সপরিবারে হাওয়া খেতে গিয়ে বাসা বেঁধেছিলুম উইলিয়ামস টাউনে। আমাদের বাসা ছিল ওদিককার শেষ বাড়িতে। তারপরই মাঠ আর বন, তারপর নন্দন পাহাড়।

পূর্ণিমা। নন্দন পাহাড়ের ওপরে একলাটি বসে বসে দেখলুম, পশ্চিমের আকাশকে রঙে ছুপিয়ে সূর্য নিলে ছুটি। তারপর কখন যে বেলাশেষের আলোর সঙ্গে ঝরঝরে চাঁদের আলো মিলে অন্ধকার আবির্ভূত হওয়ার পথ বন্ধ করে দিলে, কিছুই জানতে পারিনি। মিষ্টি জোছনায় চারদিক হয়ে উঠল স্বপ্নলোকের চিত্রশালার মতো। মনের ভেতর থেকে বাসায় ফেরবার জন্যে কোনও তাগিদ এল না।

কিন্তু হুকুম এল বাইরে থেকে। বোধ করি অন্ধকারই ষড়যন্ত্র করে হঠাৎ একরাশ কালো মেঘকে দিলে আকাশময় ছড়িয়ে, চন্দ্রালোক হল তাদের মধ্যে বন্দি। যদিও অন্ধকার খুব গাঢ় হল না, তবু রাত্রির রহস্যের ভেতরে চিত্রজগৎ গেল অদৃশ্য হয়ে। কবিত্বের খেয়াল ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ধরলুম বাসার পথ।

হাঁটতে হাঁটতে উইলিয়ামস টাউনে এসে পড়েছি, ওই তেমাথাটা পার হলেই বাসার পথ। তেমাথা পার হয়ে বাসায় গিয়ে পৌঁছতে দেড় মিনিটের বেশি লাগে না।

কিন্তু ঠিক তেমাথার পথ জুড়ে বসে আছে কে ও? যদিও অন্ধকারে তার চেহারা বোঝবার উপায় ছিল না, তবু সে যে মানুষ নয় এতে আর সন্দেহ নেই। কুকুর? উঁহু, কুকুর অত বড়ো হয় না। কালো গোরু কি মোষ? না, তাও তো মনে হচ্ছে না! আমার কাছ থেকে হাত-পনেরো তফাতে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে সে আমাকে নিরীক্ষণ করছে, অন্ধকারের চেয়ে কালো এক পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো,—এবং দপ দপ করে জ্বলছে তার দু-দুটো দুষ্টু, হিংসুক চক্ষু!

হাতে ছিল একগাছা বাবু-ছড়ি—অর্থাৎ যার দ্বারা ইঁদুরও বধ করা যায় না। তবু সেইটেকেই মাটিতে ঠুকে ঠকাঠক শব্দ করে বললুম, 'এই! হট, হট!'

ভয় পাওয়া দূরে থাক—অন্ধকার মূর্তিটা আমার দিকে আরও কয়-পা এগিয়ে এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে নীরবে আমাকে লক্ষ করতে লাগল। নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রে তার বেপরোয়া নীরবতাকে ভয়ানক বলে মনে হল। ওটা কী জানোয়ার? ও কি আমাকে খাবার বলে মনে করেছে?

বুকের মধ্যে শুরু হয়েছে তখন রীতিমতো কাঁপুনি। তবু বাইরে কোনওরকম ভয়ের ভাব না দেখিয়ে পকেট থেকে বার করলুম সিগারেটের কৌটো। ধাঁ করে মাথায় কী বুদ্ধি এল, একসঙ্গে দুটো সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে খুব বেশি হুস হুস শব্দে টানতে লাগলুম! ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবু টানের পর টানের আর বিরাম নেই।

দুই সিগারেটের আগুন আর ধোঁয়া দেখে জানোয়ারটা কী ভাবলে জানি না, কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে তেমাথা পার হয়ে আরও খানিক দূরে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল, তারপর

সেই ভয়ানক দপদপে চোখদুটো দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। বোধহয় সে কিঞ্চিৎ ভড়কে গেছে; বোধহয় সে কখনও একটা মানুষের মুখে দুটো জ্বলন্ত জিনিস দেখেনি।

আমি বুঝলুম, এই আমার সুযোগ। প্রাণটি হাতে করে দুটো সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে আমি অগ্রসর হলুম—তাকে যেন গ্রাহ্যই করি না এমনি ভাব দেখিয়ে।

তেমাথার মোড় ফিরে বাসার পথে পড়লুম। কয়েক পা চলে মাথাটি একটু ফিরিয়ে আড়চোখে দেখলুম, সেই মস্ত বড়ো কালো জন্তুটা আবার আমার অনুসরণ করছে। আমাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে দেখে সে বোধকরি বুঝতে পেরেছে, আমার মুখে একাধিক আগুন থাকলেও তার পক্ষে আমি বিপজ্জনক নই!

আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। প্রাণপণ বেগে ছুটতে শুরু করলুম। জন্তুটাও তখন আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল কি না জানি না। কারণ আমি আর ফিরে তাকাইনি। বাসাবাড়ির সদর দরজার দিকে গেলুম না, কারণ দরজা হয়তো ভেতর থেকে বন্ধ আছে এবং খুলতে দেরি হলে পিছনের জানোয়ারটা হয়তো হুড়মুড় করে আমার ঘাড়ের ওপরেই এসে পড়তে পারে। অতএব লম্বা দৌড়ে চার-পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে এসে পড়লুম বাসার পাঁচিলের সামনে এবং তারপর একটিমাত্র লাফে পাঁচিল টপকে একবারে ভেতরকার উঠোনে।

তোমরা আমার ছোটো ছোটো বন্ধু এবং বন্ধুদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, জীবনে আর কখনও আমি সেদিনকার মতো ভয়ানক ভয় পাইনি।

পরদিন সকালে খবর পেলুম, গতকল্য রাত্রে উইলিয়ামস টাউনে একটা ভাল্লুক নৈশ-বায়ু সেবন করতে এসেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় সাতাশ-আটাশ বৎসর আগে। আমার বয়স তখন অল্প। জীবনটা কবিত্বের রঙিন কল্পনায় সুমধুর।

গোমো জংশন খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা শুনে বাবা আমায় পাঠালেন গোমোয় একখানা বাড়ি ভাড়া করবার জন্যে।

বসতি হিসাবে আজকাল গোমোর কতটা উন্নতি হয়েছে বলতে পারি না; কিন্তু যখনকার কথা বলছি তখন গোমোয় হাওয়া-ভক্ষকদের উপযোগী বাড়ি পাওয়া যেত না। অনেক খুঁজে রীতিমতো জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাসা পাওয়া গেল, তার নাম ডি কস্টা সাহেবের বাংলো।

আমার চোখে মনে হল তাকে আদর্শ বাংলো। মানুষের বেড়াতে যাওয়া উচিত এমন কোনও জায়গায়, যেখানে নেই ঘিঞ্জি শহরের ধোঁয়া, ধুলো আর হট্টগোলের উপদ্রব। এক শহর থেকে আর এক শহরে গেলে বায়ু পরিবর্তন হয় না।

ডি কস্টা সাহেব কবিতা লিখতেন কি না খবর পাইনি, কিন্তু মনে মনে তিনি কবি ছিলেন নিশ্চয়। কারণ বাংলোখানি তৈরি করেছিলেন শ্রেণিবদ্ধ শৈলমালার কোলে, লোকালয় থেকে দূরে। ওপরে পাহাড়ের বুকে আমলকী গাছের সবুজ ভিড়, নীচে চারদিকে শালবনের পর শালবন আর ছোটো-বড়ো ঝোপঝাপ। মানুষের চিৎকার নেই, আছে শুধু মর্মর তান আর পাখিদের গান। দূরে দেখা যাচ্ছে, নীলাকাশের অনেকখানি জুড়ে, ধবধবে সাদা জৈন মন্দিরের চূড়ো পরে চিরস্থির নিরেট মেঘের মতো পরেশনাথ পাহাড়। প্রকৃতির রূপে মন নেচে উঠল। বাংলোখানি ভাড়া করে ফেললুম।

নির্দিষ্ট দিনে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আমরা সপরিবারে গোমোয় গিয়ে হাজির হলুম।

কিন্তু বাংলোর অবস্থা দেখেই আমার বাবার চক্ষুস্থির! রেগে আমাকে বললেন, 'হতভাগা ছেলে, আমাদের তুই বনবাসে এনেছিস? সব তাতেই তোর কবিত্ব? এখানে শেষটা কি বাঘ-ভালুকের পেটে যাব? এ যে গহন বন, কী সর্বনাশ!'

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলোর হাতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা রাখাল ছেলে। বাবার কথায় সায় দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ বাবুজি, এ কুঠি কেউ ভাড়া নেয় না। শীতকালে ওই বারান্দায় বাঘ এসে শুয়ে থাকে।'

তখন শীতকাল। বাবা অত্যন্ত চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁঃ, বলিস কী রে? না, মজালে দেখছি।'

মা কিন্তু বাংলোর পিছনের পথের দিকে খুশি-চোখে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, 'আহা, কী চমৎকার! ওগো, দ্যাখো—দ্যাখো, ওখানে কেমন বনের হরিণরা চরে বেড়াচ্ছে,—ঠিক যেন তপোবন!'

বাবা আরও রেগে গিয়ে বললেন, 'রাখো তোমার তপোবন! খবরদার, কেউ আর মোটমাট খুলো না, আজ রাতটা কোনওগতিকে এখানে কাটিয়ে কালকেই কলকাতায় পালাতে হবে।'

মা বেঁকে বসে বললেন, 'কলকাতায় পালাতে হয় তুমি একলা পালিয়ো। আমরা এখানেই থাকব।'

অনেক কথা-কাটাকাটির পর মায়ের জিদ দেখে বাবা শেষটা হার মানতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু বাবা যে মিথ্যে ভয় পেয়েছিলেন তা নয়। তোমরা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের দিদি, সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ? তাঁর কাছেও পরে আমি এই বাংলোর উজ্জ্বল বর্ণনা করেছিলুম। বাংলোখানি বিক্রয় করা হবে শুনে তিনি কেনবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। পরে স্বচক্ষে বাংলোর অবস্থান দেখে তাঁর সমস্ত উৎসাহ জল হয়ে যায় এবং আমাকে চিঠিতে লেখেন, 'হেমেন্দ্র, বাঘ-ভালুক কি

ডাকাতের পাল্লায় পড়ে আমার প্রাণ গেলেই কি তুমি খুশি হও? এ কী ভীষণ স্থান, এখানে কি মানুষ বাস করতে পারে?'

সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছ, আমি কবিত্বে অন্ধ হয়ে কীরকম জায়গা নির্বাচন করেছিলুম! কিন্তু এটাও শুনে রাখো, দু-মাস সেখানে ছিলুম, বাংলোর মধ্যে কোনওরকম বিপদে পড়িনি।

কিন্তু বিপদে পড়েছিলুম বাংলোর বাইরে প্রাকটিক্যাল জোক করতে গিয়ে। সেই কথাই এবারে বলছি।

খাঁচায় বন্ধ পাখি ওড়বার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কলকাতার মেয়েরা দিনরাত ইটের পিঞ্জরে বন্দি হয়ে থেকেও পদচালনার শক্তি যে হারিয়ে ফেলেন না, তাঁদের শহরের বাইরে নিয়ে গেলেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে মা রোজ বিকালেই মহা-উৎসাহে বেড়াতে যান এবং বনজঙ্গল পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত ভ্রমণ করে তবে বাংলোয় ফিরে আসেন।

বাবা নিয়মিত-রূপে প্রতিবাদ করেন। আমিও মানা করি। সত্যই এটা বিপজ্জনক। কিন্তু মেয়েরা কেউ আমাদের আপত্তি আমলেই আনেন না।

শেষটা মনে দুষ্টবুদ্ধি মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। আমার একখানি ব্যাঘ্রচর্ম ছিল। আমি সেখানিকে আসনরূপে ব্যবহার করবার জন্যে গোমোতেও নিয়ে গিয়েছিলুম।

একদিন বিকালে বাড়ির মেয়েরা নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছেন, সেই বাঘ-ছালখানি গুটিয়ে সঙ্গে নিয়ে আমিও বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লুম। নদীর ধার থেকে বাংলোয় ফেরবার পথ আছে একটিমাত্র,—মেয়েদের সেই পথ দিয়েই ফিরতে হবে।

স্থির করলুম, এই বাঘ-ছালে নিজের সর্বাঙ্গ মুড়ে, পথের ধারের কোনও ঝোপের ভেতর থেকে মেয়েদের ভয় দেখাতে হবে। তা হলেই, অর্থাৎ একবার ভয় পেলেই তাঁরা কেউ আর বনজঙ্গলে বেড়াতে আসবেন না।

অবশ্য এই প্র্যাকটিকাল জোক-এর মূলে ছিল সাধু উদ্দেশ্য। কিন্তু ফল দাঁড়াল হিতে বিপরীত।

পথের ধারে, পাহাড়ের পায়ের তলায় যুতসই একটি ঝোপ খুঁজে পেলুম। আকাশে তখন সূর্য নেই, সন্ধ্যা হয় হয়। বাঘের ছালে সর্বাঙ্গ ঢেকে সেই ঝোপের মধ্যে আধখানা দেহ ঢুকিয়ে জমি নিয়ে বাগিয়ে বসলুম।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরই দূর থেকে শুনতে পেলুম মেয়েদের কৌতুক-হাসিময় কণ্ঠ। বুঝলুম, সময় হয়েছে।

বাঘ-ছালের মুখের দিকটা নিজের মুখের ওপরে চাপা দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ পাহাড়ের

ওপর দিকে চোখ পড়ে গেল অকারণেই। যা দেখলুম দুঃস্বপ্নেও কখনও দেখিনি।

হাত ত্রিশেক ওপরে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে স্থিরভাবে বসে, একটা আসল মস্তবড়ো বাঘ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার পানে!

প্রথমটা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্ত সন্দেহ ঘুচে গেল। কারণ বাঘের দেহটা স্থির বটে, কিন্তু তার ল্যাজটা লটপট করে আছড়ে পড়ছে পিছনের ঝোপ দুলিয়ে বারংবার। ওরকম ল্যাজ আছড়ানোর অর্থ বোধহয়, সে উত্তেজিত হয়েছে দস্তুরমতো!

এ দৃশ্য দেখবার পরেও কারুর প্রাণে আর প্র্যাকটিক্যাল জোক-এর প্রবৃত্তি থাকে না,—থাকে কি? তাড়াতাড়ি বাঘ ছালখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে টেনে লম্বা দিতে যাচ্ছি,—

এমন সময়ে ওপরের বাঘটা অস্পষ্ট একটা গর্জন করে হঠাৎ লাফ মেরে তার পিছনের ঝোপের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল! অদৃশ্য হওয়ার সময়ে তার সেই চাপা গর্জনের অর্থ তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে মনে হয়েছে, সে বোধহয় বলতে চেয়েছিল, 'ওরে ধূর্ত মানুষের বাচ্চা! তুই আমাকে যতটা বোকা ভাবছিস, আমি ততটা বোকা নই!'

বলা বাহুল্য, আমি কিন্তু সেখানে আর এক সেকেন্ডও দাঁড়াইনি। পাগলের মতন দিলুম বাংলোর দিকে সুদীর্ঘ এক দৌড়,—একবারও এ কথা মনে উঠল না যে, বাঘটা যদি আবার তদারক করতে আসে তা হলে বাড়ির মেয়েদের অবস্থা কী হবে!

কিন্তু বাংলোয় পৌঁছে নিজের কাপুরুষতার কথা মনে করবার সময় পেলুম। বাসায় বাবা তখন ছিলেন না। লাঠিসোটা, চাকর-বাকরদের নিয়ে আবার যখন বেরিয়ে এলুম তখন দেখি, মেয়েরা মনের সুখে হাসতে হাসতে ও গল্প করতে করতে ফিরে আসছেন!

ভাবলুম, বাঘটা হঠাৎ অমন করে পালাল কেন? বোধহয় একে ব্যাঘ্রচর্মাবৃত মানুষ দেখেই সে চমকে গিয়েছিল, তার ওপরে মরা বাঘের চামড়াখানা ছুড়ে ফেলে দিতে দেখে জ্যান্ত বাঘটা ভেবে নিয়েছিল যে, তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে দুষ্টু মানুষের এ কোনও নতুন ফাঁদ বা ফন্দি! এ ছাড়া তার আচরণের আর কোনোই মানে হয় না।

আমার স্মৃতির গ্রামোফোনে আরও কয়েকটি বিচিত্র ঘটনার রেকর্ড আছে। কিন্তু এক দিনেই আমার পুঁজি খালি করতে চাই না। তোমাদের ভালো লাগলে ভবিষ্যতে আরও গল্প বলতে পারি।

আমার অ্যাডভেঞ্চার

[অনেককাল আগে একটি বিলাতি গল্প পড়েছিলুম। লেখকের নাম মনে নেই। কিন্তু গল্পটি ভালো লেগেছিল বলে তার প্লট এখনও বেশ মনে আছে। তোমাদেরও ভালো লাগতে

পারে এই বিশ্বাসে সেই গল্পটির ছায়া অবলম্বন করে এই কাহিনিটি আরম্ভ করা হল।]

'অন্নচিন্তা চমৎকারা' কি না জানি না, কারণ বাবা পরলোকে গিয়েছেন ব্যাংকের টাকা ইহলোকে রেখেই। কাজেই 'কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।' ওরই মধ্যে একটুখানি ফাঁক পেলেই তাস-দাবা খেলি আর পরচর্চা করি।

উঃ, জীবনটা কী একঘেয়েই না লাগছে! তিতিবিরক্ত হয়ে স্থির করলুম, এইবারে দু-একটা অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।

কিন্তু আমার উপযোগী অ্যাডভেঞ্চার কই? গায়ে জোর নেই, পথে-ঘাটে কাবলিওয়ালার সঙ্গে হাতাহাতি বা ফুটবলের মাঠে গোরার সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন সাহস নেই যে, উড়োজাহাজে চড়ে অন্য কারুর রেকর্ড ভাঙব। এমনকি আমি ব্যাডমিন্টন বা টেবিলটেনিস পর্যন্ত খেলতে পারি না।

ছেলেবেলায় মার্বেল, গুলি-ডান্ডা আর হা-ডু-ডু-ডু খেলেছিলুম বটে, কিন্তু সে সবকে তোমরা তো কেউ অ্যাডভেঞ্চার বলে মানতে রাজি হবে না?

কিন্তু আমার বুদ্ধি আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। কেবল সুবুদ্ধি নয়, দুষ্টুবুদ্ধিও। অতএব নিজের বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে আমি একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চারের পথ আবিষ্কার করে ফেললুম। অর্থবলের সঙ্গে বুদ্ধিবল থাকলে অ্যাডভেঞ্চারের ভাবনা কী?

সেদিন রাঁচি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার হাওড়া থেকে খড়গপুরে যেতে পুরো আধ ঘণ্টা লেট হয়ে গিয়েছিল কেন, তোমরা কি কেউ সে গুপ্ত খবর রাখো?

হাওড়া থেকে ট্রেনের একখানা ফাস্ট ক্লাস কামরায় ঢুকে দেখি, গাড়ির ভেতরে যাত্রী আছেন খালি আর-একটি ভদ্রলোক! চেহারা দেখলেই মনে হয়, যেন একটি পেট-মোটা গ্লাডস্টোন ব্যাগ।

নিজের আসনে বসে খানিকক্ষণ স্টেশনের ভিড় দেখলুম। তারপর ফিরে কামরার ভদ্রলোকটিকে ডেকে শুধালুম, 'মশাইয়ের কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

ভদ্রলোক তাঁর শিকারি বিড়ালের মতো গোঁফে তা দিতে দিতে বললেন, 'রাঁচি।'

'হাওয়া খেতে?'

'না, সেখানে আমার জমিদারি আছে।'

'মশাই তাহলে জমিদার?'

ভদ্রলোক আমার দিকে মস্তবড়ো গোলগাল মুখখানা ফিরিয়ে গোঁফের আড়ালে হাসলেন কি দাঁত খিঁচোলেন, স্পষ্ট বোঝা গেল না।

আমি মুখ তুলে কমিউনিকেশন কর্ডের দিকে তাকালুম। ওখানে লেখা রয়েছে, অকারণে ওই কর্ড বা শিকল ধরে টানলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হবে। এ নোটিশ তোমরাও নিশ্চয় ট্রেনে চড়ে লক্ষ করেছ? পথে হঠাৎ কোনও বিপদ হলে ওই কর্ড বা শিকল ধরে টানলেই চলন্ত ট্রেন তখনই থেমে যায়।

ট্রেন তখন হাওড়া ছেড়ে মাঠের ভেতর দিয়ে, গ্রামের পর গ্রামের পাশ দিয়ে দৌড়তে শুরু করেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। খানিকক্ষণ চুপচাপ বাইরের দৃশ্য দেখলুম। কিন্তু সেখানে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম এবং কমিউনিকেশন কর্ড ধরে মারলুম এক জোর-টান!

গোঁফে তা দেওয়া শেষ করে জমিদার তখন ঘুমোবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ব্যাপার দেখে তিনি চমকে, আশ্চর্য স্বরে বলে উঠলেন, 'অ্যাঁ-অ্যাঁ—করেন কী?'

আর করেন কী, দেখতে দেখতে মাঠের মধ্যিখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, গার্ড সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে।

আমি একগাল হেসে বললুম, 'Good evening guard!'

'কর্ড ধরে কে টেনেছে?'

'আমি।'

'কেন? কামরায় কেউ খুন হয়েছে?'

'নাঃ!'

'কামরায় হঠাৎ কারুর অসুখ করেছে?'

'উঁহু। আচ্ছা, গার্ড! আজ কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে বলো দেখি?'

গার্ড প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে বলল, 'ও, তাই নাকি? কতটা মদ খাওয়া হয়েছে?'

'মদ! চাঁদ দেখা আর মদ খাওয়া এক কথা নাকি?'

'বাজে কথা রাখো! কর্ড ধরে টেনেছ কেন বলো।'

'শখ হয়েছে তাই টেনেছি। এই শখের দাম পঞ্চাশ টাকা তো? আমি দাম দিতে রাজি আছি। দামটা কি এখনই নেবে?'

'আচ্ছা, খড়্গপুরে পৌঁছে সেটা দেখা যাবে। আপাতত তোমার নাম আর ঠিকানা দাও।'

নাম-ঠিকানা নিয়ে গার্ড গজগজ করতে করতে চলে গেল। ট্রেন আবার ছুটল।

আড়-চোখে চেয়ে দেখলুম, জমিদারের শিকারি গোঁফজোড়া কী এক ভয়ে কাবু হয়ে ঝুলে পড়েছে। আমি আবার কমিউনিকেশন কর্ডের দিকে স্থির-চোখে তাকিয়ে রইলুম।

জমিদার ত্রস্ত স্বরে বললেন, 'ওকী মশাই, আপনি ওদিকে তাকিয়ে আছেন কেন? শিকল ধরে ফের টান মারবেন নাকি?'

আমি হাসিমুখে বললুম, 'বোধহয় আর-একবার টান মারব।'

জমিদার তাড়াতাড়ি উঠে অনেক দূরে গিয়ে আড়ষ্টভাবে বসে পড়লেন। তারপরে যেই আন্দুল স্টেশনে গাড়ি থামল, তিনি শশব্যস্ত হয়ে নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে কামরা ছেড়ে নেমে গেলেন।

আমি বললুম, 'কী মশাই, এই না বললেন, আপনি রাঁচি যাচ্ছেন?'

জমিদার আমার দিকে একটা ভীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই দৌড় মারলেন। বোধহয় তিনি অন্য কামরায় গিয়ে উঠলেন। বোধহয় তিনি আমাকে বদ্ধ পাগল ভাবলেন।

গাড়ি ছাড়ল। অনেকক্ষণ ধরে কবিত্বের চর্চা করলুম—অর্থাৎ দেখতে লাগলুম, ধু ধু মাঠ, ঝোপঝাপ, গাছপালা আর ঘুমন্ত গ্রামের ওপরে চাঁদের আলোর কল্পনা। চাঁদের বাহার দেখে শিয়ালরা হুক্কা-হুয়া গান গেয়ে উঠল।

কিন্তু বেশি কবিত্ব আমার ধাতে সয় না। আমি চাই অ্যাডভেঞ্চার! অতএব গাত্রোত্থান করে আবার কর্ড ধরে দিলুম জোরে এক টান!

আবার গাড়ি থামল। অবিলম্বেই গার্ডের পুনরাবির্ভাব। এবারে তার অগ্নিমূর্তি। হুমকি দিয়ে বললে, 'মাতলামি করবার জায়গা পাওনি? জানো, তোমাকে আমি গাড়ি থেকে নামিয়ে দেব?'

আমি পরম শান্ত ভাবেই বললুম, 'জানো, আমি জীবনে কখনও মদ খাইনি? জানো, আমি ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার? জানো, আমাকে অপমান করেছ বলে আমি তোমার নামে রিপোর্ট করব?'

'তোমার যা-খুশি কোরো বাবু! কিন্তু কেন তুমি আবার কর্ড ধরে টেনেছ? এবারেও কি শখ হয়েছে?'

'না, এবারে শখ নয়। এবারে আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার ঘড়ির সঙ্গে সেটাকে মিলিয়ে নিতে চাই।'

'কী আশ্চর্য, এই জন্যে তুমি ট্রেন থামিয়েছ? দু-বারে তোমাকে একশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। এরপরে আবার কর্ড ধরে টানলে ট্রেন আর থামবে না।'

'রাত্রে যদি আমি ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখি, তাহলেও ট্রেন থামবে না? তাও কি হয় বন্ধু? আমি আরও জরিমানা দেব, আবার কর্ড ধরে টানব। গাড়ি না থামলে আমি তোমার নামে নালিশ করব। আইন না মানলে তোমার শাস্তি হবে। বুঝেছ?...যাও, আর আমায় বাজে বকিয়ো না!'

গার্ড ফিরে যেতে যেতে হঠাৎ কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বললে, 'তোমার টিকিট দেখি!'

আমি অনেকক্ষণ ধরে পকেট হাতড়ে হাতড়ে হাওড়া থেকে খড়্গপুরের একখানা থার্ড ক্লাস টিকিট বার করলুম।

গার্ড মহা উৎসাহে এক লাফ মেরে বলে উঠল, 'যা ভেবেছি তাই!'

আমি গম্ভীর স্বরে বললুম, 'তুমি কী ভেবেছ, আমি জানতে চাই না। তবে এই টিকিটের ওপরে বাড়তি যা দাম হবে আমি তা দিতে রাজি আছি।'

গার্ড কড়াস্বরে বললে, 'রেখে দাও তোমার ওসব চালাকি! নামো ফার্স্ট ক্লাস থেকে! যাও থার্ড ক্লাসে।'

গদির ওপরে জাঁকিয়ে, সম্পূর্ণ বিদেশি কায়দায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ে বললুম, 'আমি এখান থেকে নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু, বাবা! আমি আইন জানি। তুমি এখান থেকে আমাকে তাড়াতে পারবে না।'

গার্ড ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'আচ্ছা, পরের স্টেশনেই, তোমার কী অবস্থা হয়, দেখো। ট্রেন লেট হয়ে গেছে, এখানে আমি আর গোলমাল করতে চাই না।'

আমি দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বললুম, 'তুমি আমার কলা করবে। আমি পাঁচশো টাকা বাজি হারব—পরের স্টেশনে কেউ যদি এই কামরা থেকে আমাকে এক-পা নড়াতে পারে।'

কামরার সামনে, লাইনের ওপরে তখন অন্যান্য আরোহীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। সেই জনতার শেষপ্রান্তে আমি জমিদারমশাইয়ের শিকারি গোঁফজোড়াও আবিষ্কার করলুম।

গার্ডও তাঁকে দেখে বললে, 'বাবু, আপনিও এই কামরায় ছিলেন না?'

জমিদার বললেন, 'ছিলুম। কিন্তু পাগলের কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

গার্ড বললে, 'আপনাকে আমি সাক্ষী মানব।'

আমি বললুম, 'জমিদারমশাই, আমরা দুজনেই সহযাত্রী ছিলুম, আপনি আমার সাক্ষী।'

শিকারি গোঁফ-জোড়া আবার ঝুলে পড়ল, নিজের মোটা দেহ নিয়ে হাঁসফাঁস করতে করতে জমিদার অদৃশ্য হয়ে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

গার্ড বললে, 'তুমি আমার সাক্ষী ভাঙাবার চেষ্টা করছ? বহুত আচ্ছা, পরের স্টেশনেই তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।'

আমি হো হো করে হেসে বললুম, 'আমি প্রস্তুত হয়েই রইলুম। তোমার মতন দশ-বিশটা গার্ডকে আমি ট্যাঁকে পুরতে পারি। বাছাধন, পরের স্টেশনে খালি তুমি কেন, সমস্ত রেল কোম্পানিকে আমি অভ্যর্থনা করতে রাজি আছি।'

রাগে ফুলতে ফুলতে জনতা সরিয়ে, গার্ড নিশান নেড়ে সিগন্যাল দিলে। গাড়ি আবার চলল।

আবার খানিকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে বসে দেখতে লাগলুম, গাছের ওপরে চাঁদের রুপোলি আলো আর গাছের নীচে কালো অন্ধকার। মাঠে মাঝে মাঝে পুকুরের জল চকচক করছে।

একবার কমিউনিকেশন কর্ডে-র দিকেও দৃষ্টিপাত করলুম। কিন্তু তাকে নিয়ে তৃতীয়বার টানাটানি করতে ভরসা হল না।

পরের স্টেশন হচ্ছে উলুবেড়িয়া। ট্রেন স্টেশনের ভেতরে ঢুকল। খানিক পরেই গার্ড এল স্টেশনমাস্টার এবং আরও জনকয়েক লোককে সঙ্গে নিয়ে। স্টেশনমাস্টার আমাকে ডেকে হুকুম দিলে, 'গাড়ি থেকে তুমি নেমে এসো। তোমার টিকিট দেখাও।'

বললুম, 'গাড়ি থেকে না নেমেই আমি টিকিট দেখাতে পারি। এই দ্যাখো!' বসেই ফস করে একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট বার করে ফেললুম।

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো বিস্ফারিত করে গার্ড খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর বিস্মিত স্বরে বললে, 'একটু আগেই ওই বাবু আমাকে থার্ড ক্লাস টিকিট দেখিয়েছে।'

বললুম, 'হতে পারে। আমি দু-রকম টিকিট কিনেছি। খুশি হলে আমি চার রকম টিকিটও কিনতে পারি। কিন্তু সেটা বেআইনিও নয়, আর সেজন্যে তোমাদের মুখনাড়াও সইতে রাজি নই। যাও, এখান থেকে সরে পড়ো!'

স্টেশনমাস্টার গলাটা যথাসম্ভব ভারিক্কে করে তুলে বললে, 'কর্ড ধরে টেনে তুমি দু-বার ট্রেন থামিয়েছ।'

'হ্যাঁ, এই নাও দাম' বলেই একখানা একশো টাকার নোট বার করে ফেলে দিলুম।

স্টেশনমাস্টার বললে, 'এ যাত্রা তোমাকে ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কোরো না।'

অদূরে আবার দেখা দিয়েছে সেই শিকারি গোঁফজোড়া। গোঁফের মালিককে সম্বোধন করে বললুম, 'আসুন জমিদারবাবু, আবার এই কামরায় এসে উঠুন। আপনার আর কোনও ভয় নেই।'

কিন্তু আমার পাগলামি সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ এখন বোধহয় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। গোঁফের সঙ্গে তাঁর মুখখানা আবার সাঁৎ করে কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমার কিছু টাকা খরচ হল বটে, কিন্তু এই অ্যাডভেঞ্চারটা তোমাদের কেমন লাগল?

ভোম্বলদাসের ভাগনে

[সত্য ঘটনা]

॥ এক ॥

শিকারের গল্পে আমরা বাঘ-ভালুক ও সিংহ-গন্ডারের অনেক কথাই পড়ি,—কখনও হিংস্র পশু এবং কখনও-বা মনুষ্য বধের কথা। সেসব হচ্ছে দুঃসাহসিকতার ও ভীষণতার কাহিনি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে যখন হিংস্র পশুর মুখোমুখি দেখা হয়, তখন সময়ে-সময়ে কীরকম হাস্যরসের অবতারণা হতে পারে, এখানে তার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব। সকলে মনে রাখবেন, এগুলি গালগল্প নয়, বিখ্যাত সত্য ঘটনা! প্রত্যেক ঘটনার বহু সাক্ষী আছে।

মার্টিন জনসনের 'Lion' নামক পুস্তকে প্রথম গল্পটি আছে। ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে আফ্রিকা—

পশুরাজ সিংহের স্বদেশ। প্রথম ঘটনাটির নায়ক হচ্ছেন ভারতবাসী, তিনি 'ব্রিটিশ ইস্ট-আফ্রিকান রেলওয়ে'র একটি ছোটো স্টেশনের মাস্টার ছিলেন। ওই রেল লাইনে ভারতের আরও অনেক লোক চাকরি করত। কেবল ওখানে নয়, আফ্রিকার নানা প্রদেশে হাজার হাজার ভারতীয় লোক আছে।

স্টেশনের নাম কিমা। নির্জন স্থান, চারদিকে গভীর জঙ্গল।

হঠাৎ কোন খেয়ালে সেখানে বেড়াতে এসে একটা মস্ত সিংহ টের পেলে যে, এখানে খুব সহজেই মানুষ-খাদ্য পাওয়া যায়। সে রোজ সেখানে এসে হানা দিতে লাগল এবং কয়েকজন কুলিকে পেটে পুরে তার রাক্ষুসে খিদে আরও বেড়ে উঠল। যে-সিংহ বা যে-বাঘ একবার মানুষের মাংসের স্বাদ পায়, সে আর কোনও পশুর দিকে ফিরেও তাকায় না।

এসব হাসিঠাট্টার কথা নয়,—চারদিকে ভয়ের সাড়া পড়ে গেল। মানুষরা আর ঘর থেকে বেরোয় না, সিংহের বড়োই অসুবিধা।

তখন সে স্টেশনে তদন্ত করতে এল। স্টেশনমাস্টার নিজের ঘরে বসে কাজকর্ম করছেন, হঠাৎ মুখ তুলে দেখেন, প্লাটফর্ম দিয়ে পশুরাজ আসছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে।

বলাবাহুল্য, এরকম আলাপে তিনি রাজি হলেন না। একলাফে উঠে দমাদম দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলেন।

মানুষের অভদ্র-ব্যবহার ও অসভ্য অভ্যর্থনা দেখে পশুরাজের রাগ হল। 'হালুম' বলে গর্জন করে সে একলাফে স্টেশনের ছাদের ওপরে গিয়ে উঠল।

ছাদটা ছিল করোগেটের! বড়ো বড়ো থাবা আর দাঁত দিয়ে সিংহ করোগেটের পাত টেনে খুলে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘরের ভেতর বসে সিংহের মতলব বুঝে স্টেশনমাস্টারের নাড়ি ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। পাঁচ-ছয় মন ওজনের মস্ত একটা সিংহের ভারে ও থাবার চোটে স্থানে স্থানে করোগেটের পাত ফাঁক হয়ে গেল! স্টেশনমাস্টার পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগলেন, কিন্তু কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। যাদের সাহায্য করবার কথা, পশুরাজের আবির্ভাবে তারা চটপট অন্তর্হিত হয়েছে!

সিংহকে তাড়াবার আর কোনও উপায় নেই দেখে স্টেশনমাস্টার তখনই ট্রাফিক ম্যানেজারের কাছে এই চমৎকার টেলিগ্রাম পাঠালেন—'সিংহ স্টেশনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। শীঘ্র সৈন্য প্রেরণ করুন—(Lion fighting with station, Send urgent succour)!

ভারতীয় স্টেশনমাস্টারের এক অপূর্ব টেলিগ্রাম আফ্রিকায় অমর হয়ে আছে। সেখানকার লোকেরা বিদেশি শিকারিদের কাছে আগে এই গল্পটি বলে।

উপসংহারে জানিয়ে রাখি, স্টেশনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সিংহ সেবারে জয়ী হতে পারেনি।

॥ দুই ॥

দ্বিতীয় ঘটনাটি পেয়েছি প্রসিদ্ধ শিকারি মেজর ডবলু রবার্ট ফোরান সাহেবের 'Kill or Be Killed' নামক গ্রন্থে।

কেনিয়ার জঙ্গলে সিম্বা বলে ছোটো একটি রেল স্টেশন আছে—সেখানকারও স্টেশনমাস্টার হচ্ছেন একজন ভারতীয় বাবু!

ওদেশি ভাষায় সিম্বা বলতে সিংহ বোঝায়। সুতরাং সিম্বা স্টেশনে সিংহের যে অবাধ আধিপত্য, সেটা বোধহয় আর খুলে বলতে হবে না।

ভারতের নিরীহ বাবু অতশত খবর রাখতেন না, চাকুরির লোভে সেখানে গিয়ে পড়লেন তিনি মহাফ্যাসাদে। কারণ সিংহেরা সেখানেও রোজ 'স্টেশনের সঙ্গে যুদ্ধ' করতে আসতে লাগল! ভারতের বাবু, বাঘের কথাই জানেন, সিংহের বিক্রম দেখে প্রমাদ গুণলেন।

স্টেশনে ভারতীয় কুলিরা কাজ করত। খিদে পেলেই সিংহেরা এসে তাদের কারুকে-না-কারুকে মুখে তুলে নিয়ে চলে যেত। সিম্বা স্টেশন হয়ে দাঁড়াল সিংহদের খাবারের দোকানের মতো। হ্যাঁ, দোকানের মতো বটে, কিন্তু খাবারের জন্যে পয়সা লাগে না।

স্টেশনটি নতুন। তখনও সেখানে পাকা ঘর তৈরি হয়নি। কাজেই স্টেশনমাস্টারকে থাকতে হত তাঁবুর ভেতরেই।

তাঁবুর ভেতরে বাবু রাত্রে ঘুমোতে পারেন না। নিস্তব্ধ রাত্রের নীরবতা টুটে চারদিকে বনে বনে গন্ডার ঘোঁতঘোঁত করে, হায়েনা হা হা হাসে, হিপোপটেমাস ভয়ানক চ্যাঁচায়, চিতেবাঘ খ্যাঁক-খেঁকিয়ে ওঠে এবং সবচেয়ে যারা ভয়ংকর সেই সিংহের দল মেঘের মতো গর্জন করে যেন বলে—মানুষের গন্ধ পাই, আজ কাকে খাই!

তাঁবুর আনাচে-কানাচে সিংহদের পায়ের শব্দ শোনা যায়, বাবু আঁতকে উঠে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে থাকেন।

প্রতিদিনই এই কাণ্ড। প্রতিদিনই বাবুর মনে হয়, আজই তাঁর জীবনের শেষ দিন।

কুলিরা গাছে চড়ে রাত কাটায়। কিন্তু বাবুর সে ভরসাও হয় না, গাছে চড়ে ঘুমোবার অভ্যাস তাঁর নেই।

ভারতের বাবু, বুদ্ধি তো কম নয়। চট করে একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেললেন।

স্টেশনের প্লাটফর্মের ওপরে পড়ে ছিল প্রকাণ্ড একটা জলের ট্যাংক, তার ভেতরে জল ছিল না।

বাবু ট্যাংকের ফোকরে মাথা গলিয়ে দেখলেন, কোনওরকমে ভেতরে তাঁর ঠাঁই হতে পারে। খুশি হয়ে তিনি মনে মনে বললেন, সিম্বা স্টেশনের ধুম্বো সিংহ! আজ থেকে এর মধ্যে ঢুকে তোকে আমি সুবৃহৎ কদলী দেখাব! লোহার ট্যাংক তুই ভাঙতেও পারবি না, আর এই ছোট্ট ফোকর দিয়ে তোর অতখানি গতরও গলবে না! ওহো, কী মজা!'

মজার কথাই বটে! বাবু তখনই কুলিদের হুকুম দিলেন, 'এই! ট্যাংকটাকে তোরা আমার তাঁবুর ভেতর টেনে নিয়ে যা!'

সে রাত্রে ট্যাংকের মধ্যে বালিশ ও বিছানা ফেলে দিয়ে বাবুও ঢুকে পড়লেন। ট্যাংকের ফোকরটা রইল ওপর দিকে। সে রাত্রেও সিংহরা 'মানুষের গন্ধ পাই' বলে চ্যাঁচাতে ও চতুর্দিকে টহল দিতে লাগল। বাবু মনে মনে হেসে বললেন, 'তোদের আমি থোড়াই কেয়ার করি! আর তোরা আমাকে খুঁজে পাবি না।' অনেক রাত পরে বাবু আজ নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রাদেবীর সেবা করলেন।

এক রাত, দুই রাত, তিন রাত যায়। বাবু রোজ প্রাণ ভরে ঘুমোন। স্টেশনের অন্যান্য লোক বাবুর সৌভাগ্যে হিংসায় ফেটে মরে। এমন মজার শয়ন-গৃহ সিম্বা স্টেশনে আর ছিল না। কেল্লার মতো দুর্ভেদ্য শয়ন-গৃহ, পশুরাজের জারিজুরি সেখানে খাটবে না।

চতুর্থ রাত্রে এক সিংহের ভারী খিদে পেলে। খাবারের দোকান সিম্বা স্টেশনে, কিন্তু সেখানে খাবারের গন্ধটুকুও নেই। জ্যান্ত খাবারগুলো ঝুলছে উঁচু উঁচু গাছের মগডালে, লাফ মেরেও নাগাল পাওয়া যায় না।

খাবার খুঁজতে খুঁজতে সিংহ গেল স্টেশনমাস্টারের তাঁবুর কাছে এবং গিয়েই মানুষের গন্ধ পেলে। থাবা মেরে তাঁবুর কাপড় ছিঁড়ে সে ভেতরে ঢুকল। সেখানেও খাবার নেই!

কিন্তু গন্ধ আছে! আর শোনা গেল সুখে নিদ্রিত বাবুর নাক-ডাকার আওয়াজ! সিংহ এক লাফে ট্যাংকের ওপরে আরোহণ করলে। ফোকরে নাক রেখে ভোঁস করে এক নিশ্বাস টেনে মনে মনে বললে, কী তোফা মানুষের গন্ধ! প্রাণ জুড়িয়ে গেল!

ততক্ষণে বাবুর ঘুম ভেঙে গিয়েছে এবং ফোকরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তিনি নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার মূর্তিমান কারণটিকে দেখতেও পেয়েছেন। এবং বুঝতেও পেরেছেন, এই মজার শয়নগৃহের আসল মজাই হচ্ছে, এখান থেকে পালাবার কোনও উপায়ই নেই। বাইরে থাকলে ছুটে পালাবার পথ পাওয়া যেত, কিন্তু আজ তিনি মজার শয়নগৃহে থেকেই মজলেন!

সিংহ ফোকরের মধ্যে ঝাঁকড়া চুলে ভরা হেঁড়ে মাথাটা গলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে, কিন্তু গলল না। তখন লম্বা লম্বা নখগুলো বার করে একখানা থাবা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সে ঘন ঘন নাড়তে লাগল—পরমান্নের কড়ায় হাতা দিয়ে লোকে যেমন করে নাড়ে!

বাবু আড়ষ্ট ও চিত হয়ে ট্যাংকের তলার সঙ্গে মিশিয়ে পড়ে রইলেন—নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু! এবং তাঁরই দেহের কয়েক ইঞ্চি ওপরে ক্রমাগত বোঁ বোঁ করে ঘুরছে আর ঘুরছে আর ঘুরছে পশুরাজের বিপুল থাবা! থাবা যদি আর এতটুকু নীচে নামে, তাহলেই বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মতো বাবুর দেহ টপ করে উঠে পড়বে ট্যাংকের ওপরে! এমন দৃশ্য কেউ কল্পনা করতে পারেন?

প্রতি মিনিটেই সেই ভয়াবহ থাবা ট্যাংকের ভেতরে নতুন নতুন দিকে ঘুরতে থাকে, আর বাবুর চোখদুটো ছানাবড়ার মতো হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে চায় ও দাঁতে দাঁত লেগে ঠকাঠক করে আওয়াজ হয়! এই ব্যাপার চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে!

তারপর পশুরাজ থাবা তুলে নিয়ে ট্যাংকের ওপরে বসে আক্রমণের নতুন ফন্দি ঠিক করতে লাগল। বাবু অল্প একটু হাঁপ ছেড়ে স্বগত বোধহয় বললেন, হে মা সিংহবাহিনী, তোমার সিংহকে সুবুদ্ধি দাও মা, তাকে অন্য কোথাও যেতে বলো!

কিন্তু সিংহের সুবুদ্ধি হল না, খানিক জিরিয়ে নিয়ে অন্য কোনও উপায় না দেখে আবার সে ট্যাংকের ভেতরে বিষম থাবা নাড়া শুরু করলে। বাবু মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান হলে পর আবার চেয়ে দেখেন, সিংহের থাবা তখনও বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে তাঁকে খুঁজছে! আবার অজ্ঞান হয়ে যান। থাবার এত কাছে এমন টাটকা খাবার দেখে ভোম্বলদাসের ভাগনের উৎসাহ কিছুতেই কমতে চায় না। সিংহ বা মানুষ, কেউ কখনও এমন মুশকিলে ঠেকেনি।

তাঁবুর বাইরে গন্ডার, হিপোপটেমাস, হায়েনা ও অন্যান্য সিংহদের কোরাস ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে একেবারে থেমে গেল। অরণ্যের অন্ধকার সরিয়ে অল্পে অল্পে ঊষার আলো ফুটতে লাগল। ভোরের পাখিদের গলায় জাগল নতুন প্রভাতের আশার গান।

তখন সিংহের মনে পড়ল, আর বাসায় না ফিরলে চলবে না। বিরক্ত মনে মুখের খাবার ফেলে সে ট্যাংক থেকে নেমে পড়ে সুড় সুড় করে আবার বনের ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

কুলিরা তখন বৃক্ষশয্যা ত্যাগ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে মহা হইচই লাগিয়ে দিয়েছে!— 'বাবু কই? বাবু কই? এখনও বাবুর দেখা নেই, তিনিও সিংহের ফলার হলেন নাকি?'

একজন ভেবেচিন্তে বললে, 'মজার শয়নগৃহে শুয়ে বাবু এখনও মজায় নিদ্রা দিচ্ছেন। চল, তাঁকে জাগিয়ে দিই গে!'

মজার শয়নগৃহে উঁকি মেরে দেখা গেল, বাবু একেবারে অচেতন! এবং তাঁবুর ভেতরে পশুরাজের পদচিহ্ন! তখন আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করতে বিলম্ব হল না। তারপর বহু কষ্টে বাবুর মৃতবৎ দেহকে টেনে বার করে আনা হল। সেই এক রাত্রেই অসম্ভব আতঙ্কে বাবুর মাথার কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে!

অনেকক্ষণ পরে বাবুর জ্ঞান হল। তাঁর দুর্দশার ইতিহাস শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বাবু ক্ষীণস্বরে বললেন, 'পরের ট্রেনে আমি এখান থেকে পালাব। পরের স্টিমারে আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাব। আমার চাকরি চাই না, আপনি বাঁচলে বাপের নাম!'

ভারতীয় কুলিরা বললে, 'সিম্বা স্টেশনে আমাদেরও আর থাকা পোষাবে না। গাছের ডালে বসে আর আমরা ঘুমোতে পারব না।'

পরদিন থেকে সিম্বায় এল নতুন স্টেশনমাস্টার, নতুন কুলির দল। তাদের পরিণামের কথা ফোরানসাহেব বলেননি।

সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাসকে কেউ দেখেনি। কিন্তু তাঁর ভাগনেকে হাতের কাছে পেয়ে একবার একটি মানুষ কীরকম ঠকিয়ে দিয়েছিল, পৃথিবী বিখ্যাত শিকারি লেফটেনান্ট কর্নেল প্যাটার্সন সাহেবের কেতাবে তা লেখা আছে।

এ ঘটনাটিও ঘটেছিল আফ্রিকার পূর্বোক্ত রেলপথ নির্মাণের সময়ে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে হাজার হাজার কুলি কাজ করতে যেত বলে সিংহদের ভোজসভায় মহোৎসব পড়ে গিয়েছিল। এমন সুযোগ সিংহরা আর কখনও পায়নি।

সিংহ-ব্যাঘ্রদের কাছে মানুষের চেয়ে নিরীহ ও সহজ শিকার আর নেই। বনবাসী অধিকাংশ জীবেরই কামড়াবার জন্যে মস্ত ধারালো দাঁত, বা গুঁতোবার জন্যে লম্বা-লম্বা শিং, বা লাথি ছোড়বার ও পালাবার জন্যে খুরওয়ালা দ্রুতগামী পা, বা আঁচড়াবার জন্যে ভীষণ নখওয়ালা চারখানা ঠ্যাং আছে, কিন্তু মানুষ বেচারাদের সেসব কিছুই নেই। তুচ্ছ ভেড়াদেরও মতো তারা জোরসে টুঁ পর্যন্ত মারতে পারে না এবং সাপের মতো বিষ ও পাখির মতো ডানা থেকেও তারা বঞ্চিত। মানুষকে ধরো, মারো আর গপ করে খেয়ে ফ্যালো,—তারা অতীব নিরাপদ সুখাদ্য!

সারাদিনের কাজকর্ম সেরে কুলি এবং অন্যান্য কর্মচারীরা তাঁবু খাটিয়ে অসাড়ে নিদ্রা যেত। সকালে উঠে প্রায়ই দেখত, দলের দুই-এক জন লোক কমেছে। ব্যাপারটা তাদের একরকম গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

এক রাত্রে তাঁবুর মধ্যে আরামে ঘুমোচ্ছিল এক গ্রিক। শীতের ঠান্ডা রাত, গ্রিক লোকটির সর্বাঙ্গ লেপে ঢাকা।

নিঝুম রাত, কিন্তু নিস্তব্ধ নয়। আফ্রিকার অরণ্য রাত্রেই বেশি করে শব্দময় হয়ে ওঠে, তার প্রত্যেক শব্দই ভয়াবহ!

একটা সিংহ নিঃশব্দে গ্রিকের তাঁবুর ভেতরে গিয়ে ঢুকল। সিংহরা যখন শিকার করতে চায় তখন টুঁ শব্দটি করে না, তখন সে হয় মৃত্যুর মতন নীরব!

তাঁবুর ভেতরে ঢুকে সিংহ গ্রিক লোকটিকে দেখতে পেলে না, কারণ সে তখন লেপের মধ্যে অদৃশ্য। কিন্তু নরখাদক সিংহরা জানে, শীতকালে মানুষরা থাকে লেপের তলাতেই। এ সিংহটারও সে বুদ্ধি ছিল, কাজেই অন্য কোনও গোলমাল না করে সে প্রকাণ্ড এক হাঁ করে লেপ ও বিছানা একসঙ্গে কামড়ে ধরে বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

বলা বাহুল্য গ্রিক-বাবাজির ঘুম তখন ভেঙে গিয়েছে এবং বুঝতে পেরেছে সে পড়েছে সিংহের কবলে! কিন্তু ভয়ে ভেবড়ে গিয়ে সে বোকার মতন চেঁচিয়ে উঠল না, একেবারে চুপটি মেরে রইল। সে যে জেগেছে সিংহ তা সন্দেহ করতেও পারলে না, সস্তা খোরাকের বস্তা নিয়ে মস্ত বনের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বনের মধ্যে দিব্যি একটি নিরিবিলি জায়গা পেয়ে সিংহ তার মোট নামিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে

বসল। মানুষের টাটকা রক্ত-মাংসে আজকের নৈশভোজটা সুসম্পন্ন হবে, তার মনে ফুর্তি আর ধরে না!

থাবা মেরে একটানে লেপখানা সরিয়ে দিয়েই কিন্তু দুই চক্ষু তার স্তম্ভিত! লেপের তলায় খাবার নেই। ফোক্কা!

সে যখন হিড়হিড় করে লেপ ও বিছানা টেনে আনছিল, দুষ্টু মানুষটা সেই সময়ে কোন ফাঁকে মাঝখান থেকে চুপিচুপি হড়কে বেরিয়ে সরে পড়েছে, কিছুই টের পাওয়া যায়নি!

কালো বিদ্যুৎ

[রহস্য নাট্য]

পার্বত্য দেশ। অরণ্য। গাছেদের অশ্রান্ত মর্মর ধ্বনি, নির্ঝরের ঝরঝর জলতান এবং মাঝে মাঝে দু-তিন রকম পাখির সাড়া ভেসে আসছে।

একখানি ডাকবাংলো দেখা যাচ্ছে।

অমিয় সেন, তাঁর স্ত্রী লতিকা সেন ও তাঁদের বন্ধু কবি সরল রায় ধীরে ধীরে ডাকবাংলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

সূর্য অস্তগত, একটু পরেই সন্ধ্যা হবে।

সরল। অমিয়, এতক্ষণ পরে বোধহয় দুর্ভাগ্যের ধাক্কা সামলাবার একটা উপায় হল। এই দ্যাখো, আমরা ডাকবাংলোর কাছে এসে পড়েছি!

লতিকা। (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) আহা, জায়গাটি কী চমৎকার!

অমিয়। হ্যাঁ লতিকা, যিনি এখানে বাংলোর জন্যে স্থান নির্বাচন করেছেন, তিনি আর আমাদের সরল নিশ্চয়ই একজাতের মনুষ্য।

সরল। অর্থাৎ?

অমিয়। অর্থাৎ তিনিও তোমার মতোই কবি।

লতিকা। ওদিকে পাহাড়ের-পর-পাহাড়ের স্থির তরঙ্গমালা, তাদের কোলে কোলে দুলছে ঘন বনের স্নিগ্ধ শ্যামলতা, আর ওই সবুজের ওপরে ঝকমকে জরির পাড়ের মতন দেখাচ্ছে ছোট্ট ঝরনাটিকে! আমার আর এখন এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না!

অমিয়। ওটা বলা বাহুল্য। কারণ, ইচ্ছা করলেও আজ তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না। বনের পথে আমাদের ভগ্নচক্র মোটর হয়েছে নিশ্চেষ্ট, কাজেই আজ রাত্রে ওই বাংলোর জঠরে প্রবেশ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায়ই নেই।

লতিকা। তা জানি গো, জানি। কিন্তু মোটরখানা ভেঙেছে বলে এখন আর আমার কোনও দুঃখই হচ্ছে না।

অমিয়। তার মানে?

লতিকা। তোমার মোটর অচল না হলে তো আজ এমন অপূর্ব শোভার হাটে রাত্রিবাস করতে পারতুম না!

অমিয়। লতিকা, তোমার কাব্য-ব্যাধি দেখছি সরলেরও চেয়ে মারাত্মক!

সরল। অমিয়, তুমি অকারণেই বারবার আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ। কারণ আমি লতিকা দেবীর মত সমর্থন করি না। আমার কাব্য-রাজ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ নিরাপদ। পেট ভরে খেয়ে আরামে সোফায় বসে বা বিছানায় শুয়ে কবিতায় প্রকৃতি বর্ণনা পাঠ করা যায় নিশ্চিন্ত প্রাণে। কিন্তু এই ভয়াবহ বিজন জঙ্গলে শূন্যউদরে রাত কাটাতে হবে শুনে আমার মনে একটুও আনন্দ হচ্ছে না।

লতিকা। আপনার কথাগুলো অকবির মতন হল সরলবাবু! একটু পরেই চাঁদ উঠবে, তখন তার রুপোলি রূপের স্বপ্নে এক রাতের উপবাসকে তুচ্ছ বলে মনে হবে।

সরল। উপবাসকে তুচ্ছ ভাবব, এত বড়ো নির্বোধ কবি আমি নই।

লতিকা। কবিমশাই, এত সহজে হাল ছাড়ছেন কেন? এটা যখন ডাকবাংলো, তখন কোনও আয়োজনই কি এখানে হতে পারে না?

সরল। নির্জন বনের এরকম সব ডাকবাংলোর ব্যবস্থা আমি জানি। আগে থাকতে খবর না দিলে এখানে যা ভক্ষণ করতে হয় তার নাম হচ্ছে বিশুদ্ধ বায়ু।

অমিয়। দ্যাখো সরল, বাংলোর বারান্দা থেকে একটি লোক আমাদের লক্ষ করছে।

সরল। হুঁ, লোকটিকে সরকারি কর্মচারী বলেই মনে হচ্ছে।

অমিয়। আরে, আরে, ওঁকে যে আমি চিনি। মি. দত্ত, সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ!

সরল। উনিও তোমাকে চিনতে পেরেছেন। ওই দ্যাখো, তাড়াতাড়ি এদিকে এগিয়ে আসছেন।

অমিয়। হ্যালো দত্তসাহেব, আপনি এখানে বনবাসী কেন? নমস্কার।

মি. দত্ত। নমস্কার, নমস্কার! আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রশ্নই করতে পারি!

অমিয়। আমার মোটরের একখানা চাকা গাড়িকে ত্যাগ করে নদীর জলে ঝাঁপ খেয়েছে। ড্রাইভার তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় আছে, আর আমরা এসেছি আশ্রয়ের সন্ধানে।

দত্ত। সঙ্গে শ্রীমতী সেন বুঝি?

অমিয়। হ্যাঁ। আর উনি হচ্ছেন আমাদের বন্ধু, অতি-আধুনিক ধাঁধা-প্রণেতা সরল রায়।

দত্ত। ধাঁধা-প্রণেতা?

অমিয়। অর্থাৎ ভদ্রতার খাতিরে যাকে কবি বলে ডাকা হয়। আমার মতে, কবিতা মাত্রই ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সরল। মি. দত্ত, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমার বন্ধুটির পেশা হচ্ছে কন্ট্রাকটারি করা? কিন্তু আজ দেখছি উনি হঠাৎ কাব্য সমালোচক হওয়ার চেষ্টা করছেন। বাংলা কাব্যজগতের বিপদ আসন্ন!

দত্ত। কাব্যজগতের বিপদের কথা নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই। এখানে এসে একটা জরুরি মামলা নিয়ে ভারী জড়িয়ে পড়েছি।

অমিয়। এই বিজন অরণ্যে জরুরি মামলা! কীসের মামলা?

দত্ত। মামলাটা যে কীসের, এখনও তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তবে বড়োই রহস্যময় ব্যাপার। পরে শুনবেন। আজ তো আপনারা এইখানেই আছেন?

সরল। অবশ্য যদি স্থানাভাব না হয়—

অমিয়। স্থানাভাব হলেও আমাদের থাকতে হবে। সামনে রাত্রি, সঙ্গে মহিলা, গভীর অরণ্য। তাড়িয়ে দিলেও যেতে পারব না।

দত্ত। (হেসে) সে ভয় নেই। মিসেস সেন, আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখাচ্ছে, বাংলোর ভেতরে গিয়ে আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমার বাবুর্চি এখনই চা তৈরি করে দেবে।

সরল। মি. দত্ত, আপনি আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করলেন। আপনার বাবুর্চি যখন আছে তখন নিশ্চয়ই এখানে 'দীয়তাম ভুজ্যতাম'-এর অভাব হবে না! হ্যাঁ লতিকা দেবী, এতক্ষণ পরে আমার মনে হচ্ছে, আপনার কথা সত্য বটে! এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চমৎকার!

লতিকা। (হাস্য করে) বাবুর্চির নামেই কবিবরের সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়ে উঠল নাকি? আচ্ছা, ততক্ষণ আপনি চপ-কাটলেটের স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রকৃতিকে উপভোগ করুন, আমি জামা-কাপড় বদলে আসি।

(প্রস্থান)

দত্ত। সরলবাবু, আপনার সৌন্দর্যবোধকে আমি এইবারে দুঃখ দিতে চাই।

সরল। তার মানে? আপনার বাবুর্চির ভাণ্ডারে কি অন্নাভাব হয়েছে?

দত্ত। তা নয়। কিন্তু আপনি যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছেন, আমি সেখানে দেখছি কেবল অপ্রাকৃতিক বিভীষিকা।

সরল। বিভীষিকা?

দত্ত। হ্যাঁ, দারুণ বিভীষিকা। সেই কথা বলব বলেই মিসেস সেনকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলুম। আপনারা আজ রাত্রিবাস করতে এসেছেন মৃত্যুপুরীর মধ্যে!

অমিয়। কী বলছেন দত্তসায়েব!

দত্ত। অত্যুক্তি করছি না। মাসখানেক আগে সরকারি কাজে ইঞ্জিনিয়ার কুমুদ মিত্র এই বাংলোয় এক রাত বাস করতে আসেন। পরদিন সকালে অনেক বেলাতেও তাঁর ঘুম ভাঙেনি দেখে সকলে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। বিছানা খালি, ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ, কিন্তু

কুমুদবাবু অদৃশ্য! বাংলোর সর্বত্র, আশপাশের সমস্ত জঙ্গল পাহাড় তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কুমুদবাবুর কোনও চিহ্নই আর পাওয়া যায়নি!

অমিয়। কী সর্বনাশ!

দত্ত। তার এক হপ্তা পরে বাংলোর ভেতর থেকে অদৃশ্য হয়েছে এক চাকর। ঠিক একই ব্যাপার। সে-ও কর্পূরের মতন শূন্যে মিলিয়ে গেছে বন্ধ-দ্বার ঘরের ভেতর থেকে। ব্যাপার দেখে বাংলোর বাকি চাকররা ভয়ে দলবেঁধে পালিয়ে গিয়েছে—তাদের ধারণা, এসব ভৌতিক কাণ্ড!

অমিয়। তাদের ধারণা হয়তো ভুল নয় দত্তসাহেব!

দত্ত। আপনারাও ভূত মানেন?

সরল। দিনের বেলায় নয়, রাত হলেই আমরা ভূত মানি।

দত্ত। কিন্তু পুলিশের আইনে ভূতের অস্তিত্ব নেই। সে দারোগার এলাকায় এই বাংলো, গেল হপ্তায় তিনি এসেছিলেন এখানে তদারক করতে। কিন্তু তিনিও আর থানায় ফিরে যাননি।

সরল ও অমিয়। (একসঙ্গে) অ্যাঁঃ, বলেন কী?

দত্ত। হ্যাঁ। দারোগা সমস্ত দরজা-জানলা নিজে ভেতর থেকে বন্ধ করে শুয়েছিলেন। বাইরে ঘরের দরজার কাছে পাহারায় নিযুক্ত ছিল দুজন চৌকিদার। কিন্তু সকালে বেলা দশটার সময়ও দারোগার ঘুম ভাঙল না দেখে দরজা ভেঙে ফেলা হয়। শূন্য খাট, সব জানলা ভেতর থেকে বন্ধ, কিন্তু দারোগা অদৃশ্য!

অমিয়। চৌকিদাররা রাত্রে কোনও শব্দ-টব্দও শোনেনি?

দত্ত। খালি একবার তাদের কানে গিয়েছিল, ঘরের ভেতরে খাটখানা মড়মড় করে উঠেছিল, আর কিছু নয়।

অমিয়। তাহলে নিশ্চয় এসব ভৌতিক কাণ্ড!

দত্ত। তর্কের অনুরোধে আপনার কথা না হয় স্বীকারই করলুম। ভূতরা যেন অশরীরী, তাদের ছায়া-দেহ না হয় দেওয়াল বা দরজা-জানলার পাল্লা ভেদ করে ঘরের ভেতরে ঢুকতে পারে কিন্তু যে তিনজন মানুষ অন্তর্হিত হয়েছে, তারা তো আর সূক্ষ্ম দেহের অধিকারী নয়? তাদের দেহ কেমন করে বাতাসে মিলিয়ে গেল? আর এমনভাবে একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন চাকর আর একজন দারোয়ানের দেহ হরণ করে কোনও নিম্নশ্রেণির প্রেতাত্মারও এতটুকু লাভ হবে না। ওই তিনজন মানুযের কী হল? কেউ যে তাদের হত্যা করেছে, ঘরের মধ্যে এমন কোনও চিহ্নই পাওয়া যায়নি। এখানকার জঙ্গলে বাঘ-ভালুক আছে বটে, কিন্তু তারা তো দেওয়াল ভেদ করে ঘরে ঢুকতে পারে না! কুমুদবাবু আর দারোগাবাবুর গায়ের জামা আর পায়ের জুতোও পাওয়া গেছে ঘরের মধ্যে। খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁরা

কোথাও যেতে পারেন না। এই অদ্ভুত সমস্যা সমাধান করবার জন্যেই আজ পাঁচ দিন ধরে আমি এখানে বাস করছি, এইবারে হয়তো আমাকেই অদৃশ্য হতে হবে!

সরল। মি. দত্ত, মি. দত্ত! আপনার বাবুর্চি যদি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়, তাহলেও তার হাতের রান্না খাওয়ার জন্যে আমার আর একটুও লোভ নেই। হা ভগবান, 'নিয়তিঃ কে ন বাধ্যতে'!

অমিয়। তাই তো সরল, এ আমরা কোথায় এসে পড়লুম! আবার ফিরে গিয়ে ভাঙা গাড়িতেই বসে থাকব নাকি?

সরল। বাপ, সেটা হবে আরও ভয়ানক! যে মুল্লুকে ঘরের ভেতরই এমন কাণ্ড, রাত্রে সেখানে বাইরে থাকলে কি আর রক্ষা আছে?

দত্ত। আমার সঙ্গে মিলিটারি পুলিশ আছে, আর আপনাদেরও হাতে বন্দুক আছে দেখছি। সুতরাং অতটা ভয় পাওয়ার কারণ নেই।

সরল। না স্যার, বিলক্ষণ ভয় পাওয়ার কারণ আছে। আমাদের দেহই যদি বাতাসে মিলিয়ে যায়, বন্দুক নিয়ে করব কী?

অমিয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল। বনের ভেতরে ফেউ ডাকছে, নিশ্চয়ই বাঘ বেরিয়েছে। কপালে যা আছে তাই হবে, কিন্তু এখন আমাদের আর বাইরে থাকা উচিত নয়।

দত্ত। হ্যাঁ, এইবারে ভেতরে চলুন। কিন্তু দেখবেন, মিসেস সেন যেন ঘুণাক্ষরেও কোনও কথা না শোনেন! সরলবাবু আজ আমার সঙ্গেই শোবেন, অমিয়বাবুর ঘরের চারদিকেই পাহারার ব্যবস্থা থাকবে। এ ক'দিন যখন কিছুই হয়নি, তখন আজকের রাতটাও হয়তো ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে।

সরল। মি. দত্তের কথাই যেন সত্য হয়! আজ যদি অদৃশ্য না হই, তাহলে কাল অমিয়ের গাড়ি তৈরি না হলেও আমি পদব্রজেই বেগে পলায়ন করব।

দত্ত। ভেতরে চলুন।

/

বাংলোর একখানি ঘর। লতিকা জানলার ধারে চেয়ারে বসে আছে।

অমিয়ের প্রবেশ।

অমিয়। খোলা জানলার ধারে বসে কী করছ?

লতিকা। পাহাড়ের মাথায় চাঁদের সোনার মুকুট। আলো-ঝলমল বনে গাছের পাতায় জ্যোৎস্নার জয়গান, আর হিরে-মানিক ছড়াতে ছড়াতে ঝরনা গাইছে পরিলোকের গান। এইসব দেখছি আর শুনছি।

অমিয়। দেখছ, এখানকার জানলায় গরাদে নেই?

লতিকা। গরাদে-দেওয়া জানলা আমার ভালো লাগে না। মনে হয় যেন, জেলখানায় বসে আছি।

অমিয়। লতিকা, কবিত্ব সবসময়ে নিরাপদ নয়। মনে রেখো আমরা গহন বনের মধ্যে আছি, এ হচ্ছে হিংস্র পশুদের রাজ্য। জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়াই উচিত।

লতিকা। দ্যাখো, তুমি যখন সাবধান করে দিলে, তখন একটা কথা বলব?

অমিয়। কী কথা?

লতিকা। আমার কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

অমিয়। অস্বস্তি?

লতিকা। হ্যাঁ, অস্বস্তি আর ভয়। তুমি হেসো না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সামনের পাহাড়ের ওই ঝোপটার ভেতর থেকে ভয়ংকর দুটো চোখ মেলে কে যেন আমার পানে তাকিয়ে আর তাকিয়েই আছে...ওকী, ওকী, তোমার মুখ অমন সাদা হয়ে গেল কেন? ভয় নেই, এটা শুধু আমার মনেরই ভ্রম!

অমিয়। (ভিতু ব্যস্ত কণ্ঠে) কোন ঝোপের ভেতর থেকে লতিকা, কোন ঝোপের ভেতর থেকে?

লতিকা। কী আশ্চর্য, তুমি এতটা ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বলছি তো, আমার মনের ভ্রম! দ্যাখো না, ওখানে কেউ নেই!

অমিয়। (সামলে নিয়ে) ওখানে কোনও বন্য জন্তু থাকাও অসম্ভব নয়! জানলাগুলো আমি বন্ধ করে দি। (একটা জানলা বন্ধ করে) দ্যাখো লতিকা, ওই ঝোপটা সত্যি-সত্যিই কেমন নড়ে উঠল!

লতিকা। জোরে বাতাস বইছে, ঝোপ তো নড়তেই পারে।

অমিয়। বাতাসে ঝোপ একদিকেই নুয়ে পড়ে। কিন্তু যেদিক থেকে বাতাস আসছে, ও-ঝোপটা সেদিকেও নুয়ে নুয়ে পড়ল। এসব ভালো লক্ষণ নয়। আমি আগে জানলাগুলো বন্ধ করে দি। (জানলাগুলো একে একে বন্ধ করতে লাগল)

লতিকা। এমন চাঁদের আলো তুমি কি নষ্ট করে দিতে চাও?

অমিয়। (জানলা সশব্দে বন্ধ করতে করতে) হ্যাঁ, চাই। প্রাণ থাকলে অমন ঢের চাঁদের আলো দেখবার সময় পাব!

লতিকা। তোমার আজ কী হল বলো দেখি? ভয়ে তোমার সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে! তোমার এরকম ভয়ের কারণ কী?

অমিয়। আমি ভয় পাইনি লতিকা, আমি খালি সাবধান হতে চাই।

লতিকা। ডিনার খেতে বসে দেখলুম, তোমরা সবাই যেন কেমন একরকম হয়ে গেছ! কারুর মুখেই হাসি নেই, কেউ ভালো করে কথা কয় না, আমাদের পেটুক কবিমশাইও আজ খিদে নেই বলে ছুরি-কাঁটা ফেলে উঠে পড়লেন, তোমাদের ওই পুলিশসাহেবও থেকে থেকে

উঠে গিয়ে লোকজনদের চুপিচুপি কীসব হুকুম দিয়ে আসেন, চারদিকে বন্দুক-ঘাড়ে সেপাইদের পাহারা, এ সমস্তই আমি লক্ষ করেছি! আসল ব্যাপারটা কী বলো তো?

অমিয়। যা লক্ষ করেছ, সবই তোমার মনের ভুল! রাত হল, এখন শুয়ে পড়ো।

লতিকা। ও কী, তুমি যে বন্দুকটা পাশে নিয়েই শুয়ে পড়লে! বন্দুকের আজ এত আদর কেন?

অমিয়। এটা হচ্ছে ভীষণ জঙ্গল। আত্মরক্ষার উপায় করে রাখলুম।

লতিকা। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ, কার কাছ থেকে তুমি আত্মরক্ষা করতে চাও?

অমিয়। তোমার অর্থহীন প্রশ্নের পর প্রশ্নের জ্বালায় যে অস্থির হয়ে উঠলুম লতিকা! নাও, শুয়ে পড়ো!

লতিকা। হুকুম তামিল করলুম, প্রভু! কিন্তু সরলবাবু কোথায় শুলেন?

অমিয়। মি. দত্তের সঙ্গে। তুমি না থাকলে আমিও সেইখানেই আস্তানা পাততুম।

লতিকা। তাই নাকি? মি. দত্তের সঙ্গ কি এতই লোভনীয়?

অমিয়। জঙ্গল হচ্ছে বিপজ্জনক জায়গা। এখানে নারীর আবির্ভাব হচ্ছে আবার বিপদের ওপরে বিপদের মতো! দয়া করে আর প্রশ্ন না করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।

(কিছুক্ষণের স্তব্ধতা)

লতিকা। ওগো?

অমিয়। কী?

লতিকা। শুনছ?

অমিয়। কী শুনব?

লতিকা। কেমন একরকম শব্দ?

অমিয়। (খানিকক্ষণ কান পেতে শুনে) বাইরে জেগে রয়েছে খালি বনের কান্না, আর মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার উচ্ছ্বাস। আর-কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছি না তো!

লতিকা। না, শব্দটা থেমে গেছে।

অমিয়। রাত অনেক হল লতিকা! মিছে জেগে জেগে কাল্পনিক শব্দ শুনে আমাকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। ঘুমিয়ে পড়ো।

লতিকা। (কাতর স্বরে) ওগো, আমার যে বড্ড ভয় করছে! আবার মনে হচ্ছে, কে যেন তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখছে!

অমিয়। লতিকা, এইবার সত্যি-সত্যিই তুমি হাসালে। জানলা-দরজা সব বন্ধ, ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে, কোথাও একটা ছায়া পর্যন্ত নেই। আমি ছাড়া এখানে তোমার মুখের পানে কে আর তাকিয়ে থাকবে?

লতিকা। কেউ এখানে নেই বটে, কিন্তু তবু তার নিষ্পলক চোখ দুটো যেন থেকে থেকে আমার বুকের ভেতরে এসে বিঁধছে!

অমিয়। (বিরক্ত স্বরে) লতিকা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তোমার ওসব পাগলামির কথা আর আমি শুনব না, এই আমি ঘুমলুম।

অল্পক্ষণের নীরবতা

লতিকা। (হঠাৎ সভয়ে উচ্চ আর্তনাদ করে) ওগো, ওগো, ওগো ওঠো গো!

অমিয়। (ধড়মড়িয়ে উঠে বসে) অ্যাঁ অ্যাঁ! কী হল, কী হল?

লতিকা। (হাঁপাতে হাঁপাতে) কালো বিদ্যুৎ—কালো বিদ্যুৎ।

অমিয়। (হতভম্বের মতো) কালো বিদ্যুৎ! সে আবার কী?

লতিকা। ঠিক যেন একটা কালো বিদ্যুৎ দেওয়ালের ওপরে ছড়িয়ে পড়েই আবার সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল!

অমিয়। কোথায়? কোন দিকে?

লতিকা। ওইখানে গো, ওইখানে!

(বাহির থেকে দ্বারে ঘন ঘন ধাক্কা)

সরলের **কণ্ঠস্বর**। দরজা খোলো, দরজা খোলো!

(অমিয় দরজা খুলে দিলে। বন্দুক হাতে করে মি. দত্তের ও সরলের ভিতরে প্রবেশ)

দত্ত। মিসেস সেন অমন চেঁচিয়ে উঠলেন কেন?

সরল। কী হয়েছে লতিকা দেবী, আপনার মুখ মড়ার মতন সাদা কেন? আপনার দেহ যে ঠকঠক করে কাঁপছে। কী দেখেছেন আপনি?

অমিয়। কালো বিদ্যুৎ!

দত্ত। (সবিস্ময়ে) কালো বিদ্যুৎ আবার কাকে বলে?

অমিয়। জানি না দত্তসাহেব! হয়তো লতিকার চোখের ভ্রম!

লতিকা। (ক্রন্দনস্বরে) না-গো, না! ভ্রম নয় গো, আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি! ঠিক ওইখানে। দে [illegible] দিয়েই মিলিয়ে গেল!

সরল। এ ঘর নিরাপদ নয়! আমার নাকে কেমন একটা বন্য গন্ধ আসছে!

অমিয়। কবিদের ঘ্রাণশক্তি দেখছি সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রখর! আমি কিন্তু কোনও গন্ধই পাচ্ছি না।

দত্ত। (গম্ভীর স্বরে) মি. সেন, এটা কৌতুকের সময় নয়। মিসেস সেন নিশ্চয়ই কিছু দেখেছেন! (নিম্ন স্বরে) জানেন মি. সেন, কুমুদ মিত্র আর দারোগাবাবু এই ঘর থেকেই অদৃশ্য হয়েছিলেন!

সরল। কিন্তু কালো বিদ্যুৎ বলতে কী বুঝব? আর, এই বন্য গন্ধটা? মি. দত্ত, আপনি কি কোনও গন্ধ পাচ্ছেন না?

দত্ত। পাচ্ছি বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু গন্ধটার উৎপত্তি কোথায়? দরজা-জানলা বন্ধ। ঘরের চার দেওয়াল, খড়ের চাল, খাটের তলা সব পরিষ্কার-স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখানে অন্য জীবের মধ্যে উড়ছে কেবল গোটা-কয়েক মশা! তবু এখানে কালো বিদ্যুৎ খেলে কেন, আর বন্য গন্ধই বা আসে কেন? এ যে অসম্ভব রহস্য!

(আচম্বিতে বাইরে বিষম একটা কোলাহল উঠল। উপরি উপরি বন্দুকের শব্দ)

দত্ত। (সচমকে) ও কীসের গোলমাল? সেপাইরা বন্দুক ছোড়ে কেন?

(দরজার সামনে একজন চৌকিদার ছুটে এল)

চৌকিদার। (ভীত চিৎকারে) হুজুর! কালা শয়তান—কালা শয়তান!

দত্ত। কালা শয়তান!

(ঘরের খড়ের চালের ওপরে ভীষণ ঝটাপটির শব্দ)

সরল। ও আবার কী ব্যাপার! চালখানা ভেঙে পড়বে নাকি?

অমিয়। (সভয়ে) দত্তসায়েব—দত্তসায়েব! দেওয়ালের ওপরে, চালের তলাকার ফাঁকের দিকে তাকিয়ে দেখুন!

দত্ত। (স্তম্ভিত স্বরে) প্রকাণ্ড কালোমতো কী ওটা?

সরল। তীব্র হিংসা-ভরা দু-দুটো চক্ষু যেন অগ্নিবৃষ্টি করছে!

অমিয়। বন্দুক ছোড়ো—বন্দুক ছোড়ো! অজগর! ও যে অজগর সাপ!

(মি. দত্ত, অমিয় ও সরল তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে বন্দুক তুলে গুলিবৃষ্টি করলেন। ভীষণ গর্জন করে সাংঘাতিক রূপে আহত মস্তবড়ো সর্পের সুদীর্ঘ দেহ মাটির ওপরে আছড়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল।)

লতিকা। (অভিভূত স্বরে) মা গো!

অমিয়। লতিকা অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছে—ওকে নিয়ে আমি বাইরে যাই!

দত্ত। সকলকেই বাইরে যেতে হবে, ওর ল্যাজের একটা ঝাপটা গায়ে লাগলে দেহ গুঁড়িয়ে যাবে!

(সকলের তাড়াতাড়ি বাইরে প্রস্থান)

অমিয়। আমাদের গুলিতে সাপটার মাথা গুঁড়ো হয়ে গেছে!

সরল। বাপরে বাপ, এতবড়ো অজগর জীবনে আমি দেখিনি! ওর দেহটা বোধহয় সতেরো-আঠারো হাত লম্বা!

দত্ত। (একটা আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) এতক্ষণে সব রহস্য পরিষ্কার হল। ঘরের চাল

আর দেওয়ালের মাঝখানকার ফাঁক দিয়ে ওই ভীষণ জীবটা ভেতরে ঢোকবার পথ আবিষ্কার করেছিল। ওর দেহের একপাকে মুহূর্তের মধ্যে মানুষ মারা পড়ত। তারপর মৃতদেহটা গ্রাস করে ও আবার ঘর থেকে ওই পথেই বেরিয়ে যেত। আজকেও ও শিকার ধরতে ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু ঘরের লোক জাগ্রত দেখে কালো বিদ্যুতের মতোই সাৎ করে আবার বাইরে অদৃশ্য হয়। সেখানেও সেপাইদের বন্দুকের গুলি খেয়ে বা শব্দে ভয় পেয়ে আবার ভেতরে আসতে বাধ্য হয়। তারপর আমাদের গুলিতে ওর সব লীলাখেলা ফুরিয়ে গিয়েছে!

সরল। লতিকা দেবীর উপমা দেওয়ার শক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হচ্ছি। কালো বিদ্যুৎ! চমৎকার উপমা!

দত্ত। মিসেস সেন অনায়াসেই পুরস্কার দাবি করতে পারেন! কারণ ধরতে গেলে একরকম ওঁর জন্যেই এতবড়ো একটা রহস্যের কিনারা হল, আমারও মান বাঁচল।

লতিকা। (শ্রান্ত, ক্ষীণ স্বরে) হ্যাঁ মি. দত্ত, আপনার কাছ থেকে আমি একটা পুরস্কার দাবি করতে পারি।

দত্ত। কী পুরস্কার, বলুন।

লতিকা। কাল ভোরেই আপনার মোটরে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারবেন?

দত্ত। নিশ্চয়, নিশ্চয়!

বনের ভেতরে নতুন ভয়

॥ এক ॥

কুচবিহার থেকে মোটর ছুটেছে—আলিপুর গেল, কুমারগ্রাম পিছনে পড়ে রইল, এখন জয়ন্তীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বিমল ও কুমার শিকারে বেরিয়েছে। কুমারের মেসোমহাশয় কুচবিহারে বড়ো চাকরি করেন, তাঁরই নিমন্ত্রণে কুমার ও তাঁর বন্ধু বিমল কুচবিহারে এসে আজ কিছুদিন ধরে বাস করছে। তাদের শিকারের তোড়জোড় করে দিয়েছেন তিনিই।

জয়ন্তীতে কুচবিহারের মহারাজার শিকারের একটি ঘাঁটি বা আস্তানা আছে। স্থির হয়েছে, বিমল ও কুমার দিন দুই-তিন সেখানে থাকবে এবং শিকারের সন্ধান করবে। জয়ন্তীর অবস্থান হচ্ছে কুচবিহার ও ভুটানের সীমান্তে। এখানকার নিবিড় বনে বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর অভাব নেই।

শীতের বিকাল। রোদের আঁচ কমে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই পাহাড়ে শীতের আমেজ একটু একটু করে বেড়ে উঠছে। ধুলোয় ধূসরিত আঁকা-বাঁকা পথের দুই পাশে চাষাদের গ্রামগুলো

গাছপালার ছায়ায় গা এলিয়ে দিয়েছে। এপাশে-ওপাশে বুনো কুলগাছের ঝোপের পর ঝোপ। মাঠে মাঠে যে গোরুগুলো চরছে, তাদের কোনও-কোনওটা মোটর দেখে নতুন কোনও দুষ্টু জন্তু ভেবে ল্যাজ তুলে তেড়ে আসছে এবং দেশি কুকুরগুলোও গাড়ির শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে খাপ্পা হয়ে ঘেউ ঘেউ করে ধমকের পর ধমক দিচ্ছে।

এইসব দেখতে দেখতে ও শুনতে শুনতে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে উঠল এবং গাড়িও জয়ন্তীর ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছল।

একতলা সমান উঁচু শালকাঠের খুঁটির ওপরে শিকারের এই ঘাঁটি বা কাঠের বাংলো। একজন কুচবিহারী রক্ষী এখানে থাকে। আগেই তাকে খবর দেওয়া হয়েছিল, সে এসে গাড়ি থেকে মোটমাট নামিয়ে নিতে লাগল।

একটি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বিমল ও কুমার বাংলোর ওপরে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে চারদিকের দৃশ্য টার্নারের আঁকা একখানি ছবির মতো।

একদিকে ভুটানের পাহাড় আকাশের দিকে মটুক পরা মাথা তুলে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার নীচের দিকটা গভীর জঙ্গলে ডুব দিয়ে অদৃশ্য। অস্তগত সূর্যের ফেলে যাওয়া খানিকটা রাঙা রং তখনও আকাশকে উজ্জ্বল করে রাখাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। পাতলা অন্ধকারে চারদিক ঝাপসা হয়ে গেছে। পৃথিবীর সমস্ত শব্দ ক্রমেই যেন ঝিমিয়ে পড়ছে এবং বহুদূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে দুই-একটা গোরুর হাম্বা রব।

বিমল পাহাড় ও অরণ্যের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কুমার, ও জঙ্গলে কেবল বাঘ নয়, হাতিও থাকতে পারে।'

কুমার বললে, 'ভালোই তো, কলকাতায় অনেকদিন ধরে লক্ষ্মীছেলের মতো হাত গুটিয়ে বসে আছি, একটুখানি নতুন উত্তেজনা আমাদের দরকার হয়েছে।'

॥ দুই ॥

কিন্তু সে-বারে উত্তেজনা এল সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধরে, অপ্রত্যাশিতভাবে।

কুচবিহারি শীত ভুটানের সীমান্তে দার্জিলিঙের প্রায় কাছাকাছি যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার সঙ্গে করে যে শীত নিয়ে এল, তিনটে পুরু গরম জামার ওপরে মোটা আলোয়ান চাপিয়েও তার আক্রমণ ঠেকানো যায় না।

রক্ষী ঘরের ভেতরে এসে জিনিসপত্তর গুছোচ্ছে, বিমল তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে, তোমার নামটি কী শুনি?'

'আজ্ঞে, শ্রীনিধিরাম দাস।'

'আচ্ছা নিধিরাম, তুমি এখানে কতদিন আছ?'

'আজ্ঞে, অনেকদিন!'

'কাল ভোরে আমরা যদি বেরুই, কাছাকাছি কোথাও কোনও শিকার পাওয়া যাবে?'

'আজ্ঞে, ওই জঙ্গলে বরা (বরাহ) তো পাওয়া যাবেই, বাঘও আছে। কাল রাতেই আমি বাঘের ডাক শুনেছি। আজ সকালে উঠে দেখেছি, কাছেই একটা ঝোপে বাঘে গোরু মেরে আধখানা খেয়ে ফেলে রেখে গেছে।'

'তাহলে গোরুর বাকি আধখানা খাওয়ার লোভে বাঘটা হয়তো বেশি দূরে যায়নি। নিধিরাম, জঙ্গল ঠেঙাবার জন্যে কাল আমার সঙ্গে জনকয়েক লোক দিতে পারো?'

নিধিরাম একটু ভেবে বললে, 'হুজুর, লোক পাওয়া শক্ত হবে!'

'কেন, আমরা তাদের ভালো করেই বকশিশ দেব!'

'সে তো জানি হুজুর। হপ্তাখানেক আগে হলে যত লোক চাইতেন দিতে পারতুম, কিন্তু এখন ডবল বকশিশ দিলেও বোধহয় লোক পাওয়া যাবে না!'

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, 'কেন নিধিরাম, হপ্তাখানেকের মধ্যেই এখানে কি বাঘের উপদ্রব বড়ো বেড়েছে?'

নিধিরাম মাথা নেড়ে বললে, 'না হুজুর, বাঘের সঙ্গে থেকে এখানকার লোকের কাছে বাঘ গা-সওয়া হয়ে গেছে! বাঘকে আমরা খুব বেশি ভয় করি না, কারণ সব বাঘ মানুষ খায় না।'

কুমার এগিয়ে এসে বিমলের হাতে এক পেয়ালা কফি দিয়ে বললে, 'নিধিরাম, তোমার কথার মানে বোঝা যাচ্ছে না! বাঘের ভয় নেই, তবু লোক পাওয়া যাবে না কেন?'

নিধিরাম শুষ্কস্বরে বললে, 'হুজুর, বনে এক নতুন ভয় এসেছে!'

বিমল বললে, 'নতুন ভয়!'

কুমার বললে, 'নিধিরাম বোধহয় পাগলা হাতির কথা বলছে!'

নিধিরাম প্রবল মাথা-নাড়া দিয়ে বলল, 'না হুজুর, বাঘও নয়—পাগলা হাতি-টাতিও নয়! এ এক নতুন ভয়! এ ভয় যে কী, এর চেহারা যে কীরকম, কেউ তা জানে না! কিন্তু সকলেই বলেছে, এই নতুন ভয় ওই পাহাড় থেকে নেমে বনে এসে ঢুকেছে!'

বিমল ও কুমারের বিস্ময়ের সীমা রইল না, তারা পরস্পরের সঙ্গে কৌতূহলী দৃষ্টি বিনিময় করলে।

নিধিরাম বললে, 'জানেন হুজুর, এই নতুন ভয় এসে এক হপ্তার ভেতরে তিনজন মানুষকে প্রাণে মেরেছে?'

'বলো কী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ছিদাম একদিন বনের ভেতরে গিয়েছিল। হঠাৎ সে চিৎকার করতে করতে বন থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ধড়াস করে মাটিতে পড়ে মরে গেল! সকলে ছুটে গিয়ে দেখলে, তার ডান পায়ের ডিমে একটা বাণ বিঁধে আছে!'

'বাণ?'

হ্যাঁ, ছোটো একটি বাণ। এক বিঘতের চেয়ে বড়ো হবে না! কোনও মানুষ ধনুক থেকে সে-রকম বাণ ছোড়ে না!'

কুমার প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'তারপর?'

'দিনচারেক আগে এক কাঠুরেও দুপুরবেলায় বনের ভেতর থেকে তেমনি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বেরিয়ে এসে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মারা পড়ল! তারও গোড়ালির ওপরে তেমনি একটা ছোটো বাণ বেঁধা ছিল!'

'তারপর, তারপর?'

'কাল বনের ভেতরে আমাদের গাঁয়ের অছিমুদ্দির লাশ পাওয়া গেছে। তার পায়ের ওপরেও বেঁধা ছিল সেইরকম একটা ছোটো বাণ! বলুন হুজুর, এর পরেও কেউ কি আর ওই ভেতরে যেতে ভরসা করে?'

বিমল ও কুমার স্তব্ধভাবে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

শূন্য পেয়ালাটা রেখে দিয়ে বিমল ধীরে ধীরে বললে, 'নিধিরাম, তুমি যা বললে তা ভয়ের কথাই বটে! তিন তিনটি মানুষের প্রাণ যাওয়া কি যে সে কথা? কিন্তু যারা এই খুন করেছে তাদের কোনও সন্ধানই কি পাওয়া যায়নি?'

'কিছু না হুজুর! লোকে বলে, এ মানুষের কাজ নয়, এত ছোটো বাণ কোনও মানুষ কখনও ছুড়েছে বলে শোনা যায়নি!'

'প্রত্যেক বাণই এসে বিঁধেছে পায়ের ওপরে, এও একটা ব্যাপার!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কোনও বাণই পায়ের ডিম ছাড়িয়ে ওপরে ওঠেনি!'

'আর পায়ে কেবল অতটুকু বাণ বিঁধলে মানুষ মারা পড়ে না, কাজেই বোঝা যাচ্ছে, বাণের মুখে বোধহয় বিষ মাখানো ছিল!'

'কবরেজমশাই ও লাশগুলো দেখে ওই কথাই বলেছেন!'

বিমল বললে, 'একটা বাণ দেখতে পেলে ভালো হত!'

'দেখবেন হুজুর? আমি এখনই একটা বাণ নিয়ে আসছি'—এই বলে নিধিরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

বিমল জানলা দিয়ে কুয়াশামাখা ম্লান চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট অরণ্যের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কুমার, অ্যাডভেঞ্চার বোধহয় আমাদের অনুসরণ করে—কাল আমরাও ওই বনের ভেতরে প্রবেশ করব! কে জানে, শিকার করতে গিয়ে আমরাই কারও শিকার হব কি না!'

কুমার বললে, 'কিন্তু এমন অকারণে নরহত্যা করার তো কোনও অর্থ হয় না!'

বিমল বললে, 'হয়তো বনের ভেতরে কোনও পাগল আড্ডা গেড়ে বসেছে! নইলে এত জায়গা থাকতে পায়েই বা বাণ মারে কেন?'

এমন সময় নিধিরামের পুনঃপ্রবেশ। তার হাতে একটা কাগজের মোড়ক, সে খুব ভয়ে ভয়ে সেটাকে বিমলের হাতে সমর্পণ করলে।

বিমল মোড়কটা খুলে টর্চের তীব্র আলোকে জিনিসটা সাম্পিল ধরে পরীক্ষা করলে, কুমারও তার পাশে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

মুখে বিস্ময়ের স্পষ্ট আভাস জাগিয়ে বিমল বললে, 'কুমার, দেখছ?'

'কী?'

'এ তো বাণের মতো দেখতে নয়! এ যে ঠিক ছোট্ট একটি খেলাঘরের বর্শার মতন দেখতে!'

সত্যই তাই! এক বিঘত লম্বা পুঁচকে একটি কাঠি, তার ডগায় খুব ছোট্ট এক ইস্পাতের চকচকে ফলা! অবিকল বর্শার মতো দেখতে!

কুমার বললে, 'মানুষ যদি দূর থেকে এই একরত্তি হালকা বর্শা ছোড়ে, তাহলে নিশ্চয়ই তার লক্ষ স্থির থাকবে না!'

বিমল ভাবতে ভাবতে বললে, 'তাই তো, এ যে মনে বড়ো ধাঁধা লাগিয়ে দিলে! হ্যাঁ নিধিরাম, বনের ভেতরে অছিমুদ্দির লাশ যেখানে পাওয়া গেছে, অন্তত সেই জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিয়ে আসতে পারবে তো?'

নিধিরাম বললে, 'তা যেন পারব, কিন্তু হুজুর, এর পরেও কি আপনারা ভূতুড়ে বনে যেতে চান?'

বিমল হেসে বললে, 'ভয় নেই নিধিরাম, এত সহজে মরবার জন্যে ভগবান আমাদের পৃথিবীতে পাঠাননি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! আমরা কাল সকালেই ওই বনের ভেতরে ঢুকতে চাই! কুমার, আমাদের শিকারি-বুট পরতে হবে, কারণ এই অদ্ভুত শত্রুর দৃষ্টি হাঁটুর নীচে পায়ের ওপরেই!'

॥ তিন ॥

ওইটুকু পলকা কাঠির তির বা বর্শা যে শিকারি-বুট ভেদ করতে পারবে না, বিমল এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল। শরীরের অন্যান্য স্থানেও তারা ডবল করে জামা প্রভৃতি চড়িয়ে, দুটো পা পর্যন্ত ঝোলা ওভারকোট পরে নিল।

বিমল বললে, 'সাবধানের মার নেই, কী জানি, বলা তো যায় না!'

উপরি উপরি দুই দুই পেয়ালা কফি পান করে হাড়ভাঙা শীতের ঠকঠকানি যতটা সম্ভব কমিয়ে বিমল ও কুমার বাংলো থেকে নীচে নেমে এল। সামনের বনের মাথায় দূরে তখনও

কুয়াশার পাতলা মেঘ জমে আছে। কাঁচা রোদ চারদিকে সোনার জলছড়া দিচ্ছে, ভোরের পাখিদের মনের খুশি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে গানে গানে।

বিমল ও কুমারের মাঝখানে থেকে নিধিরাম ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছিল। তার ভাব দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, সামান্য বিপদের আভাস পেলেই সে সর্বাগ্রে অদৃশ্য হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে! একটা পায়ে চলা পথ ধরে তারা যখন একেবারে বনের কাছে এসে পড়ল, নিধিরামের সাহসে আর কুলাল না, হঠাৎ হেঁট হয়ে সেলাম ঠুকে সে বললে, 'হুজুর, ঘরে আমার বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, আমি গোঁয়ারের মতো প্রাণ দিতে পারব না!'

কুমার হেসে বললে, 'তোমাকে বলি দেওয়ার জন্যে আমরা ধরে আনিনি, নিধিরাম! খালি দেখিয়ে দিয়ে যাও, অছিমুদ্দির লাশ কোথায় পাওয়া গিয়েছিল!'

'ওইখানে হুজুর, ওইখানে! বনের ভেতরে ঢুকেই এই পথটা যেখানে ডানদিকে মোড় ফিরে গেছে, ঠিক সেইখানে!'—বলেই নিধিরাম সেলাম ঠুকুতে ঠুকতে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল!

বিমল ও কুমার আর কিছু না বলে নিজেদের বন্দুক ও রিভলভার ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখলে। তারপর সাবধানে বনের ভেতরে প্রবেশ করলে।

সব বন যেমন হয়, এও তেমনি! বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া ডালপাতাভরা মাথাগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঠেকিয়ে যেন সূর্যের আলো যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে, সেই চেষ্টাই করছে! গাছের ডালে ডালে ঝুলছে অজানা বন্য লতা এবং গাছের তলার দিক অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোপে-ঝাপে-আগাছায়।

কিন্তু সব বন যেমন হয় এও তেমনি বন বটে, তবু এখানকার প্রত্যেক দৃশ্যের ও প্রত্যেক শব্দের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত রহস্য মাখানো আছে, এই বনকে যা সম্পূর্ণ নতুন ও অপূর্ব করে তুলেছে!

পথ যেখানে ডানদিক মোড় ফিরেছে সেখানে রয়েছে একটা মস্ত বড়ো ঝোপ।

সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বিমল বললে, 'এইখানেই অছিমুদ্দি পৃথিবীর খাতা থেকে নাম কাটিয়েছে! কুমার, এ ঝোপে অনায়াসেই প্রকাণ্ড বাঘ থাকতে পারে! লুকিয়ে আক্রমণ করবার পক্ষে এ একটা চমৎকার জায়গা!'

কুমার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার ঝোপটার দিকে তাকালে, তারপর হঠাৎ একটানে বিমলকে সরিয়ে এনে উত্তেজিত—কিন্তু মৃদু কণ্ঠে বললে, 'ও ঝোপে সত্যিই বাঘ রয়েছে!'

চোখের নিমেষে দুজনে বন্দুক তুলে তৈরি হয়ে দাঁড়াল!

বিমল বললে, 'কই বাঘ?'

'ঝোপের বাঁ-পাশে তলার দিকে চেয়ে দ্যাখো!'

ঝোপের তলায় বড়ো বড়ো ঘাসের ফাঁক দিয়ে আবছা আলোতে মস্ত একটা বাঘের মুখ দেখা গেল! মাটির ওপরে মুখখানা স্থির হয়ে পড়ে আছে,—এমন উজ্জ্বল ভোরের আলোতেও ব্যাঘ্রমহাশয়ের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হয়নি।

তারা দুজনেই সেই মুখখানা লক্ষ করে একসঙ্গে বন্দুক ছুড়লে, কিন্তু বাঘের মুখখানা একটুও নড়ল না!

দুটো বন্দুকের ভীষণ গর্জনে যখন সারা বন কেঁপে উঠল, গাছের উপরকার পাখিগুলো সভয়ে কলরব করতে করতে চারদিকে উড়ে পালাল, তখন বিমল ও কুমার বাঘের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বলে আর একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পেলে না!

বন্দুকের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের ঝোপের তলাকার দীর্ঘ ঘাস বনগুলো হঠাৎ যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল—যেন তাদের ভেতর দিয়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো জীব চমকে এদিকে-ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে! সেগুলো খরগোশও হতে পারে, সাপও হতে পারে!

বিমল আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ঘুমন্ত বাঘ গুলি খেয়েও একটু নড়ল না! তবে কি ওটা মরা বাঘ?'

দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। তারপর বন্দুক দিয়ে ঝোপটা দু-ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখলে, বাঘটা সত্যি-সত্যিই মরে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে, তার সর্বাঙ্গ ভরে ভনভন করছে মাছির পাল!

কুমার হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে বাঘটার তলপেট থেকে কী একটা জিনিস টেনে বার করলে। তারপর সেটাকে বিমলের চোখের সামনে উঁচু করে তুলে ধরলে।

বিমল অবাক হয়ে দেখলে, সেই ছোট্ট কাঠির ডগায় এতটুকু একটা বর্শার ফলা চকচক করছে!

॥ চার ॥

বিমল বললে, 'সেই খুদে বর্শা আর সেই মারাত্মক বিষ! এ বনে বাঘেরও নিস্তার নেই!'

কুমার বললে, 'বর্শাটা ছিল বাঘের তলপেটে। অমন জায়গায় বর্শা মারলে কেমন করে?'

বিমল খানিকক্ষণ ভেবে বললে, 'দ্যাখো কুমার, ব্যাপারটা বড়োই রহস্যময়। এতটুকু হালকা বর্শা দূর থেকে নিশ্চয়ই কেউ ছুড়তে পারে না। তিনজন মানুষ মরেছে—প্রত্যেকেই চোট খেয়েছে হাঁটুর নীচে। বাঘটাও তলপেটে চোট খেয়েছে। সুতরাং বলতে হয়, যে এই বর্শা ছুড়েছে নিশ্চয়ই সে ছিল বাঘের পেটের নীচে। হয়তো বনের এই অজানা বিপদ থাকে নীচের দিকেই,—ঝোপঝাপে লুকিয়ে।

কুমার বললে, 'কিংবা বাঘটা যখন চিত হয়ে শুয়েছিল, বর্শা মারা হয়েছে তখনই।'

আচম্বিতে বিমলের চোখ পড়ে গেল কুমারের শিকারি-বুটের ওপরে। সচকিত স্বরে সে বলে উঠল, 'কুমার, কুমার! তোমার জুতোর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো!'

কুমার হেঁট হয়ে সভয়ে দেখলে, তার শিকারি-বুটের ওপরে বিঁধে রয়েছে একটা ছোটো বর্শা! আঁতকে উঠে তখনই সেটাকে টেনে সে ছুড়ে ফেলে দিলে!

বিমল বললে, 'ও বর্শা নিশ্চয়ই তোমার বুটের চামড়া ভেদ করতে পারেনি। কারণ, তোমার পায়ের মাংস ভেদ করলে তুমি নিশ্চয়ই টের পেতে!'

'ওঃ, ভাগ্যে শিকারি-বুট পরেছিলুম। কিন্তু কী আশ্চর্য বিমল, এই অদৃশ্য শত্রু কোথায় লুকিয়ে আছে?'

বিমল ও কুমার সাবধানে ওপরে নীচে আশেপাশে চতুর্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল, কিন্তু উঁচু গাছের ডালে একটা ময়ূর, একটা হিমালয়ের পায়রা, গোটাকয়েক শকুনি ছাড়া আর কোনও জীবকে সেখানে আবিষ্কার করতে পারলে না। বনের তলায় আলো-আঁধারির মধ্যেও জীবনের কোনও লক্ষণ নেই—যদিও কেমন একটা অস্বাভাবিক রহস্যের ভাব সেখানকার প্রত্যেক আনাচ-কানাচ থেকে যেন অপার্থিব ও অদৃশ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং সুযোগ পেলেই যে-কোনও মুহূর্তেই সে যেন ধারণাতীত মূর্তি ধারণ করে বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে পারে!

হঠাৎ সামনের লম্বা লম্বা ঘাসগুলো সরসর করে কাঁপতে লাগল, তার ভেতর দিয়ে কী যেন ছুটে যাচ্ছে—ঠিক যেন দ্রুত গতির একটা দীর্ঘ রেখা কেটে!

মাটি থেকে টপ করে একটা নুড়ি তুলে নিয়ে কুমার সেই দিকে ছুড়লে, সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেল!

'ওটা কী জন্তু দেখতে হবে' বলে কুমার যেখানে নুড়ি ছুড়েছিল সেইদিকে দৌড়ে গেল! তারপর পা দিয়ে ঘাস সরিয়ে হেঁট হয়ে দেখেই সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল!

'কী কুমার, কী, কী?'

কিন্তু কুমার আর কোনও জবাব দিতে পারলে না—সে যেন একেবারেই থ হয়ে গেছে।

বিমল তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে সে-ও যেন শিউরে উঠে বললে, 'কুমার, কুমার, এও কি সম্ভব?'

॥ পাঁচ ॥

মাটির ওপরে শুয়ে আছে, অসম্ভব এক নকল মানুষ-মূর্তি!

লম্বায় সে বড়োজোর এক বিঘত! কুমারের নুড়ির ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

এক বিঘত লম্বা বটে, কিন্তু তার ছোট্ট দেহের সবটাই অবিকল মানুষের মতো—মাথার চুল, মুখ, চোখ, ভুরু, নাক, চিবুক, কান, হাত, পা—মানুষের যা-যা থাকে তার সে-সবই আছে!...তার পাশে হাতের খুদে মুঠো খুলে পড়ে রয়েছে সেই রকম এক কাঠির বর্শা!

বিমল ও কুমার নিজেদের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে রাজি হল না! বিমল সেই এক বিঘতি মানুষটিকে দুই আঙুলে তুলে একবার নিজের চোখের কাছে ধরলে—সেই একফোঁট্টা মানুষের এতটুকু বুক নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে বারবার উঠছে আর নামছে! বিমল তুলে ধরতেই তার মাথাটা কাঁধের ওপরে লুটিয়ে পড়ল! শিউরে উঠে আবার সে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলে!

কুমার হতভম্বের মতো বললে, 'বিমল, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?'

বিমল বললে, 'এও যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে আমরাও স্বপ্ন!'

'পাহাড় থেকে নেমে এসে তাহলে এই ভয়ই বনবাসী হয়েছে?'

'তা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? এদের চেহারাই খালি আমাদের মতো নয়, এই পকেট সংস্করণের মানুষ আমাদেরই মতো বর্শা তৈরি করে, ইস্পাতের ফলা ব্যবহার করতে জানে, আবার বিষ তৈরি করে বর্শার ফলায় মাখিয়ে বড়ো বড়ো শত্রু মারতেও পারে! সুতরাং এর বুদ্ধিও হয়তো মানুষের মতো! জানি না, এর দলের আরও কত লোক এখানে লুকিয়ে আছে!...ওই যাঃ, কুমার—কুমার—'

ইতিমধ্যে কখন যে এক বিঘতি মানুষের জ্ঞান হয়েছে, তারা কেউ তো টের পায়নি! যখন তাদের হুঁশ হল তখন সেই পুতুল-মানুষ তিরবেগে ঘাস জমির ওপর দিয়ে দৌড় দিয়েছে!

ব্যর্থ আক্রোশে বিমল নিজের বন্দুকটা তুলে নিয়ে কেন যে গুলি ছুঁড়লে তা সে নিজেই জানে না, তবে এটা ঠিক যে, সেই পুতুল-মানুষকে হত্যা করবার জন্যে নয়!

কিন্তু যেমনি গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হল, অমনি তাদের এপাশে-ওপাশে, সামনে পিছনে লম্বা লম্বা ঘাসের বন যেন সচমকে জ্যান্ত হয়ে উঠল—ঘাসে ঘাসে এলোমেলো দ্রুত গতির রেখার পর রেখা, যেন শত শত জীব লুকিয়ে লুকিয়ে চারদিক দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে!

বিমল ও কুমারও পাগলের মতো চতুর্দিকে ছুটাছুটি করতে লাগল, অন্তত আর-একটা পুতুল-মানুষকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে!

—কিন্তু মিথ্যা চেষ্টা!

তারপরেও বিমল ও কুমার বহুবার বনের ভেতরে খুঁজতে গিয়েছিল। কিন্তু আর-কোনও পুতুল-মানুষ সে অঞ্চলে আর দেখা দেয়নি বা বিষাক্ত বর্শা ছুড়ে আমাদের মতো বড়ো বড়ো মানুষকে হত্যা করেনি। বোধহয় বন ছেড়ে তারা আবার পালিয়ে গিয়েছিল ভুটানের পাহাড় জগতে।

একখানা উলটে-পড়া চেয়ার
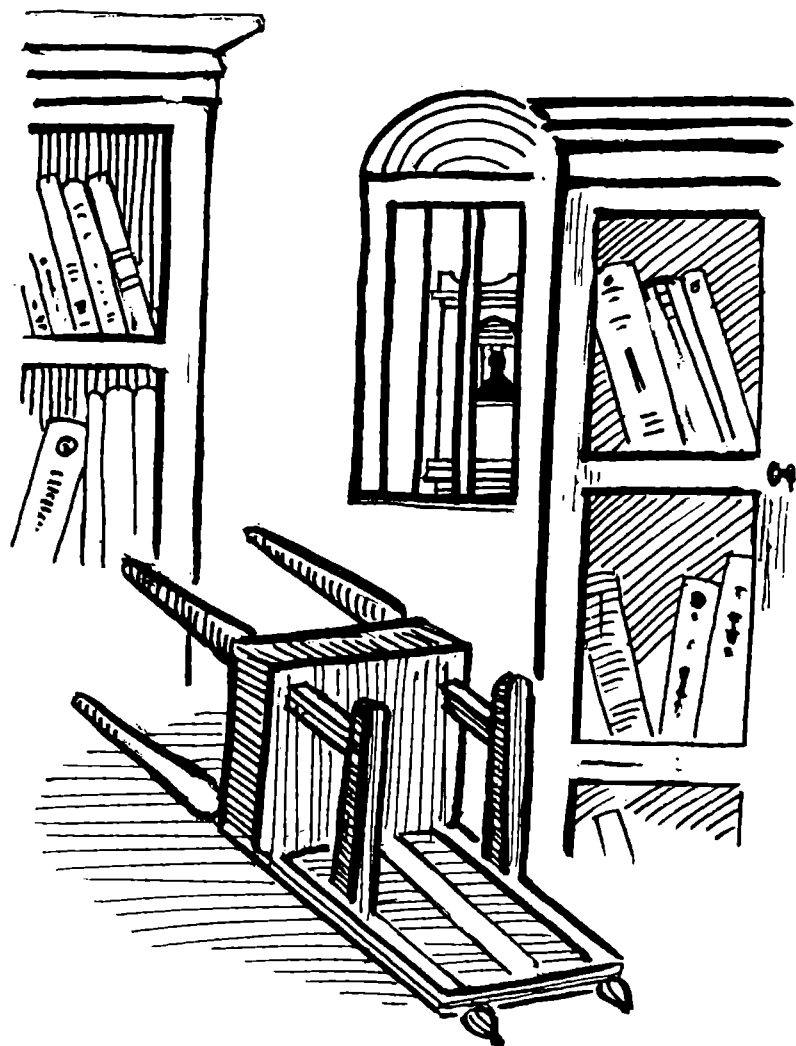
সদাশিব মুখোপাধ্যায়। যখন জয়ন্ত ও মানিককে গোয়েন্দা বলে কেউ জানত না, তিনি তখন থেকেই তাদের বন্ধু।

জমিদার মানুষ। বাস করেন শিবপুরের গঙ্গার ধারে, মস্ত এক বাড়িতে। জয়ন্ত ও মানিক আজ তাঁর কাছে এসেছে সান্ধ্য ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

তখনও সন্ধ্যার শাঁখ বাজেনি। সদাশিববাবুর সাজানো-গুছানো লম্বা-চওড়া বৈঠকখানায় বসে জয়ন্ত ও মানিক গল্প করছে সকলের সঙ্গে। সকলে মানে, সদাশিববাবু ও তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশী বন্ধু। তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন ভূরিভোজনের লোভে নয়, জয়ন্তের নাম শুনেই। জয়ন্তের মুখে তার কোনও কোনও মামলার কথা শুনবেন, এই তাঁদের আগ্রহ।

কিন্তু জয়ন্তের আগ্রহ জাগ্রত হচ্ছে না নিজের মুখে নিজের কথা ব্যক্ত করবার জন্যে।

ভদ্রলোকেরা তবু নাছোড়বান্দা। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলী হচ্ছেন আবার তিনকড়িবাবু, তিনি সদাশিববাবুর বাড়ির খুব কাছেই থাকেন। আগে কোনও সরকারি অফিসের কর্মচারী ছিলেন, এখন কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বয়সে ষাট পার হয়েছেন। বিপত্নীক ও নিঃসন্তান।

অবশেষে অনুরোধ উপরোধের ঠেলায় পড়ে জয়ন্ত বলতে বাধ্য হল: আচ্ছা, তাহলে এমন কোনও কোনও মামলার কথা বলতে পারি, আমি যেগুলো হাতে নিয়ে ব্যর্থ হয়েছি।

তিনকড়িবাবু বললেন, না, না, তাও কি হয়! আমরা আপনাদের সফলতার ইতিহাসই শুনতে চাই। ব্যর্থ মামলা তো অসমাপ্ত গল্প!

জয়ন্ত শেষটা নাচার হয়ে বললে, মানিক, আমাকে রক্ষা করো ভাই! আমি নিজের গুণকীর্তন করতে পারব না কিছুতেই। তুমিই না-হয় ওঁদের দু-একটা মামলার কথা শোনাও।

তাই হল। জয়ন্তের কাহিনি নিয়ে মানিক ঘণ্টা দুই সকলকে মাতিয়ে রাখলে।

তারপর সদাশিববাবু ঘোষণা করলেন, আর নয়, এইবারে খাবার সময় হয়েছে।

আসর ভাঙল।

কিন্তু খেতে বসতে না বসতেই আকাশ বলে ভেঙে পড়ি! বজ্রের হুঙ্কার, ঝড়ের চিৎকার, গঙ্গার হাহাকার! বিদ্যুতের পর বিদ্যুতের অগ্নিবাণের আঘাতে কালো আকাশ যেন খানখান হয়ে গেল। তারপর ঝড় কাবু না হতে হতেই শুরু হল বৃষ্টির পালা। আর সে কি যে সে বৃষ্টি। দেখতে দেখতে মাটির বুক হয়ে গেল জলে জলে জলময়!

সদাশিব বললেন, জয়ন্ত, মানিক! আজ আর বাড়ি যাবার নাম মুখে এনো না। বাড়িতে ফোন করে দাও, আজ এখানেই তোমরা রাত্রিবাস করবে।

জয়ন্ত বললে, তথাস্তু।

॥ দুই ॥

সকালে সদাশিব বললেন, যাবার আগে চা পান করে যাও।

মানিক বললে, সাধু প্রস্তাব।

অনতিবিলম্বে চায়ের সঙ্গে এল আরও কিছু কিছু। এবং চায়ের পেয়ালায় দু-একটা চুমুক দিতে না দিতেই হস্তদন্তের মতো ছুটে এসে তিনকড়িবাবু বললেন, আমার সর্বনাশ হয়েছে।

সদাশিব বললেন, ব্যাপার কী তিনকড়িবাবু?

—চোরে আমার বিশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

জয়ন্ত বললে, থানায় খবর পাঠিয়েছেন?

—পাঠিয়েছি। পুলিশ এখনও আসেনি। কিন্তু পুলিশ আসবার আগে আপনাকে আমি চাই।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, আমাকে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পুলিশের চেয়ে আপনার উপরেই আমার বেশি বিশ্বাস।

—আমাকে মাপ করবেন। এ সব সাধারণ চুরির মামলা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। পুলিশ অনায়াসেই এ রকম মামলার কিনারা করতে পারবে।

তিনকড়ি করুণ স্বরে বললেন, সদাশিববাবু, আমার মতন লোকের কাছে এ চুরি সাধারণ চুরি নয়। ওই বিশ হাজার টাকার দাম আমার কাছে কত, আপনি তা জানেন। আপনি দয়া করে আমার জন্যে জয়ন্তবাবুকে একটু অনুরোধ করেন—

সদাশিব বললেন, বেশ, তা করছি। জয়ন্ত, আমারও ইচ্ছা—

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, আর বলতে হবে না, তোমার ইচ্ছা কী বুঝেছি। কিন্তু নিমন্ত্রণ খেতে এসে চুরির মামলা নিয়ে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। বড়ো জোর তিনকড়িবাবুর মুখে চুরির বিবরণ শুনে ঘটনাস্থলে একবার চোখ বুলিয়ে আসতে পারি। তার বেশি আর কিছু আমি পারব না।

তিনকড়ি আশান্বিত হয়ে বললে, আমার পক্ষে তাই হবে যথেষ্ট।

॥ তিন ॥

জয়ন্ত শুধোলে, আপনার টাকাগুলো কোথায় ছিল?

—একতলায়, আমার পড়বার ঘরে বইয়ের আলমারির ভিতরে।

—বলেন কী, অত টাকা রেখে দিয়েছিলেন বইয়ের আলমারির ভিতরে!

—দোতলার ঘরে আমার লোহার সিন্দুক আছে বটে, কিন্তু বছর চারেক আগে একবার চোর এসে সিন্দুক থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছিল, তাই তার ভিতরে আর দামি কিছু রাখতে ভরসা হয় না।

—টাকাগুলো ব্যাংকে জমা রাখেননি কেন?

—তাই তো রেখেছিলুম জয়ন্তবাবু। কিন্তু গেল বছরে ভিতরে ভিতরে খবর পাই, আমার ব্যাংক লাল বাতি জ্বালবার আয়োজন করছে। তাড়াতাড়ি টাকা তুলে আনলুম আর তারই দিন ছয়েক পরে ব্যাংক দরজা বন্ধ করলে, অনেক হতভাগ্যের সর্বনাশ হল। ব্যাপার দেখে আমি এমন নার্ভাস হয়ে গেলুম যে, টাকাগুলো আর কোনও ব্যাংকেই জমা রাখতে পারলুম না।

—আপনার বাড়িতেই যে অত টাকা আছে, এ খবর আর কেউ জানত?

—আমি তো জনপ্রাণীর কাছে ও টাকার কথা বলিনি।

—কিন্তু ব্যাংক থেকে যে আপনি টাকা তুলে এনেছেন এটা তো অনেকেই জানে?

—তা জানে বটে।

—আর নতুন কোনও ব্যাংকে আপনি টাকা জমা রাখেননি, এ খবরটাও তো কেউ কেউ রাখতে পারে?

—তাও পারে বটে। কিন্তু চোর কেমন করে জানবে যে এত জায়গা থাকতে আমি বইয়ের আলমারির ভিতরেই অত টাকা লুকিয়ে রেখেছি?

—তিনকড়িবাবু, এ চোর হচ্ছে সন্ধানী। সে কেমন করে আপনার পড়বার ঘরে ঢুকেছে?

—সেটা খালি আমার পড়বার ঘর নয়, আমার বৈঠকখানাও। তার দক্ষিণ দিকে হাত-আষ্টেক চওড়া আর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটুখানি জমি আছে, তার পরেই সরকারি রাস্তা। চোর সেই বেড়া টপকে এসেছে। প্রথমে খড়খড়ির পাখি তুলে ফাঁক দিয়ে আঙুল গলিয়ে জানলা খুলেছে। তারপর কোনও তীক্ষ্ণ অস্ত্র বা বাটালি দিয়ে একটা গরাদের গোড়ার দিককার কাঠ খানিকটা কেটে ফেলে গরাদটাও সরিয়ে ফেলেছে। তারপর ঘরে ঢুকে নিজের চাবি দিয়ে আলমারি খুলে টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। কিন্তু এখনও আমি এই ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছি যে টাকা সে আবিষ্কার করলে কেমন করে?

—কেন?

—টাকাগুলো আমি সাধারণ ভাবে রাখিনি। দপ্তরিকে ফরমাজ দিয়ে আমি ঠিক কেতাবের মতো দেখতে একটি বাক্স তৈরি করিয়ে ছিলুম আর তারই ভিতরে রেখেছিলুম বিশ খানা হাজার টাকার নোট। আলমারির বাইরে থেকে দেখলে বাক্সটাকে সোনার জলে নাম লেখা একখানা সাধারণ বই ছাড়া আর কিছুই মনে করবার উপায় ছিল না।

—পড়বার ঘরই আপনার বৈঠকখানা? সেখানে তাস-দাবা-পাশার আসরও বসত?

—তা বসত বই কি, রোজ নয়—শনি-রবিবারে আর ছুটির দিনে।

—সে আসরে নিয়মিত ভাবে অনেকেই আসতেন?

—আমার বন্ধুর সংখ্যা বেশি নয় জয়ন্তবাবু। নিয়মিত ভাবে আমাদের বৈঠকে যে ছয়-সাত জন লোক আসেন, চুরির খবর পেয়ে তাঁরা সকলেই আমার বাড়িতে ছুটে এসেছেন, আপনি সেখানে গেলেই তাঁদের দেখতে পাবেন।

—বেশ, তবে তাই হোক। পুলিশের আগেই আমি ঘটনাস্থলে হাজির হতে চাই।

॥ চার ॥

একখানা ছোটোখাটো দোতলা বাড়ি। সামনে অপেক্ষা করছে জনকয়েক কৌতূহলী লোক, জয়ন্ত ও মানিক তাদের মধ্যে কারুকে কারুকে গতকল্য সন্ধ্যায় দেখেছিল সদাশিববাবুর বাড়িতেও।

তিনকড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে তাঁর পাঠগৃহের দরজার তালা খুলে ফেললেন।

জয়ন্ত গলা তুলে সকলকে শুনিয়ে বলল, তিনকড়িবাবু, বাইরে এঁদের এইখানেই অপেক্ষা করতে বলুন। আগে আমরা ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখি, তারপর অন্য কথা।

মাঝারি আকারের ঘর। মাঝখানে একখানা গালিচা-বিছানো তক্তাপোষ। একদিকে একটি ছোটো টেবিল ও দু খানা চেয়ার। আর একদিকে দুটি বই-ভরা আলমারি এবং আর একদিকেও পুস্তক-পূর্ণ সেলফ। একটি আলমারির সামনে মেঝের উপরে উলটে পড়ে রয়েছে একখানা চেয়ার। ঘরের এখানে-ওখানে যেখানে-সেখানেও ছড়ানো রয়েছে নানা আকারের কেতাব ও মাসিকপত্র প্রভৃতি। দেখলেই বোঝা যায় যে তিনকড়িবাবু হচ্ছেন দস্তুরমতো গ্রন্থকীট।

জয়ন্ত মিনিট দুয়েক ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তিনকড়িবাবু, টাকা চুরি গিয়েছে কোন আলমারির ভিতর থেকে?

তিনকড়ি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন।

—ওর সামনে একখানা চেয়ার উলটে রয়েছে কেন?

—জানি না। তবে ওটা হচ্ছে চোরেরই কীর্তি। কারণ কাল রাত্রে আমি যখন এ ঘর থেকে দরজা বন্ধ করে যাই, চেয়ারখানা তখন চার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল।

—আপনি কাল যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যান চেয়ারখানা তখন কোথায় ছিল?

—ওদিককার টেবিলের সামনে।

—তা হলে চোরই চেয়ারখানা আলমারির সামনে টেনে এনেছে।

—তা ছাড়া আর কী?

জয়ন্ত পকেট থেকে রুপোর ছোট্ট ডিপে বার করে নস্য নিতে নিতে (এটা হচ্ছে তার আনন্দের লক্ষণ—নিশ্চয়ই সে কোনও উল্লেখযোগ্য সূত্র আবিষ্কার করেছে) বললে, বটে বটে, বটে! আপনার সেই জাল কেতাবে পুরে আসল নোটগুলো আলমারির কোন তাকে রেখেছিলেন?

তিনকড়ি থতমত খেয়ে বললেন, জাল কেতাব?

—হ্যাঁ জাল কেতাব। অর্থাৎ যা কেতাবের মতো দেখতে, কিন্তু কেতাব নয়।

—ও বুঝেছি। সেই কেতাব-বাক্সটা ছিল আলমারির সব-উপর তাকে।

—যা ভেবেছি তাই, বলতে বলতে জয়ন্ত আলমারির কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আলমারিটা পরীক্ষা করতে করতে আবার বললে, আলমারির কলে যে চাবিটা লাগানো রয়েছে সেটা কি আপনার?

তিনকড়ি বললেন, আজ্ঞে না। ওটা নিশ্চয়ই চোরের সম্পত্তি।

—তাহলে এ চোর পেশাদার চোর নয়।

—কী করে বুঝলেন?

—পেশাদার চোরের কাছে প্রায়ই চাবির গোছা থাকে, এ রকম একটিমাত্র চাবি থাকে না। এখানে চোর এসেছিল একটিমাত্র চাবি নিয়ে। তার মানে সে জানত, এই একটিমাত্র চাবি দিয়েই সে কেল্লা ফতে করতে পারবে। যদি বলেন সে এতটা নিশ্চিত হয়েছিল কেন? তবে তার উত্তর হচ্ছে, সে আগে থাকতেই যে-কোনও সুযোগে এই আলমারির কলে একটা মোমের বা অন্য কিছুর ছাঁচ তুলে নিয়ে বিশেষ একটি চাবি গড়ে তবে এখানে এসেছিল। চুরি তার ব্যাবসা নয়, এ চাবি পরে তার কোনও কাজে লাগবে না, তাই চাবিটাকে সে এখানে পরিত্যাগ করেই প্রস্থান করেছে। ...তিনকড়িবাবু, দেখছি ওই জানালাটার একটা গরাদ নেই। চোর কি ঐ খান দিয়েই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

জয়ন্ত জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর জানালাটা ভালো করে পরীক্ষা করে ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

মাটির উপরে কিছুক্ষণ হুমড়ি খেয়ে বসে কী পর্যবেক্ষণ করলে। তারপর উঠে বললে, মানিক, কাল রাত্রে কখন বৃষ্টি থেমেছিল তুমি তা জানো তো?

মানিক বললে, হ্যাঁ আমি তখনও জেগেছিলুম। বৃষ্টি থেমেছিল রাত দুটোর সময়ে।

—তাহলে এখানে চোরের আবির্ভাব হয়েছে রাত দুটোর পরে।

সদাশিব শুধোলেন, এ কথা কেমন করে জানলেন?

জয়ন্ত বললে, খুব সহজেই। ভিজে মাটির উপরে রয়েছে কয়েকটা স্পষ্ট পায়ের দাগ। নিশ্চয়ই চোরের পদচিহ্ন। কালকের প্রবল বৃষ্টিপাতের ভিতরে চোর এখানে এলে সব পায়ের দাগ ধুয়ে মুছে যেত। হ্যাঁ, পায়ের দাগেও বেশ বিশেষত্ব আছে।

তিনকড়ি সাগ্রহে বললেন, কী বিশেষত্ব?

—'যথাসময়ে প্রকাশ্য' বলতে বলতে জয়ন্ত আবার জানালার ফাঁক দিয়ে গলে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। তারপর নিম্নস্বরে আবার বললে, তিনকড়িবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

—আজ্ঞা করুন।

—আপনি কি আলমারির ভিতর থেকে কেতাবখানা মাঝে মাঝে বার করতেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, করতুম। দেখতুম নোটগুলো যথাস্থানে আছে কি না।

—তখন নিশ্চয়ই ঘরের ভিতরে আপনি একলা থাকতেন?

—সে কথা জিজ্ঞাসা করাই বাহুল্য।

জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত নিজের মনে কী ভাবতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর শুধোলে, রাস্তার ওপারে ওই যে লাল রঙের বাড়ি রয়েছে, ওখানা কার বাড়ি?

—যদুবাবুর। আমার এক বিশেষ বন্ধু।

—তার পাশের ওই হলদে বাড়িখানা?

—মাধববাবুর। তিনিও আমার বিশেষ বন্ধু।

—আচ্ছা, অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি, একটি ছোট্টখাট্ট ভদ্রলোক বারবার দরজার ওপাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মারছেন, উনি কে?

তিনকড়ি বললেন, আমিও দেখেছি। ওঁরই নাম যদুবাবু।

যদুবাবুও জয়ন্তের প্রশ্ন শুনতে পেলেন। দরজার সামনে এসে তিনি বললেন, জয়ন্তবাবু, ক্ষমা করবেন। আমি আমার কৌতূহল সংবরণ করতে পারছিলুম না। কে না জানে, আপনি হচ্ছেন এক আশ্চর্য যাদুকর গোয়েন্দা। আজ এখানে এসে আবার কি যাদু সৃষ্টি করেন তাই দেখবার জন্যে আমার আগ্রহের আর সীমা নেই।

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট যে কোনও যাদু সৃষ্টি করবার দরকার নেই। আমার যা জানবার তা জেনেছি। এখন আপনারা সকলেই ঘরের ভিতরে আসতে পারেন।

—তাই নাকি? তাই নাকি? বলতে বলতে ও হাসতে হাসতে সর্বপ্রথমেই ঘরের ভিতরে পদার্পণ করলেন যদুবাবু। ছোট্টখাট্ট বললেই তাঁর চেহারা বর্ণনা করা যায় না, ভগবানের দয়ায় তিনি বামন হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন—কারণ তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য সাড়ে চার ফুটের চেয়ে বেশি নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই অনুসারেই মানানসই—যদিও তাঁর দেহখানি ছোটোর ভিতরেই দিব্য নাদুস-নুদুস।

যদুবাবুর পর দেখা দিলেন মাধববাবু, দস্তুরমতো দশাসই চেহারা—উচ্চতাতেও ছয় ফুটের কম হবে না। এলেন আরও জনচারেক ভদ্রলোক।

তিনকড়ি একে একে সকলের সঙ্গে জয়ন্তের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, আমার তাস-দাবা খেলার সাথি হচ্ছেন এঁরাই।

জয়ন্ত মুখে কিছু বললে না, কেবল একবার করে চোখ বুলিয়ে প্রত্যেকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিলে।

মাধববাবু বললেন, বলেন কী জয়ন্তবাবু, ব্যাপারটা এখনই আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব স্পষ্ট।

—কিন্তু আমরা তো স্পষ্ট কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—এখানে কাল রাতে চুরি হয়ে গিয়েছে।

—তাই তো শুনছি।

—চোর ওই গরাদ খুলে এই ঘরে ঢুকেছে।

—তাই তো দেখছি।

—তাহলে ব্যাপারটা কি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না?

—উঁহু! চোর কে?

—সেটা পুলিশ এসে আবিষ্কার করবে। আমি এখানে চোর ধরতে আসিনি, আপনাদের মতো মজা দেখতে এসেছি।

যদুবাবু আপত্তি করে বললেন, আমরা এখানে মজা দেখতে আসিনি, বন্ধুর দুঃখে সহানুভূতি জানাতে এসেছি।

মাধববাবু বললেন, আমরা ভেবেছিলুম, আপনি যখন এসেছেন, চোর ধরা পড়তে দেরি লাগবে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, পুলিশ যদি চোরকে ধরতে পারে তাহলে দেখবেন, চোর আপনার মতো মাথায় ছ'ফুট উঁচু নয়।

মাধববাবু সবিস্ময়ে বললেন, বলেন কী? কেমন করে জানলেন?

—সে কথা বলবার সময় হবে না। ওই পুলিশ এসে পড়েছে!

॥ পাঁচ ॥

ইনস্পেকটার হরিহরবাবু একজন সহকারীকে নিয়ে গট গট করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। বয়সে প্রৌঢ়, মোটাসোটা দেহ, মুখে উদ্ধত ভাব।

রুক্ষ স্বরে তিনি বললেন, ঘরে এত ভিড় কেন? বাড়ির কর্তা কে?

তিনকড়ি এগিয়ে এসে বললেন, আজ্ঞে আমি।

—আপনারই টাকা চুরি গিয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওঁরা কে?

—এঁরা আমার বন্ধু। আর উনি হচ্ছেন বিখ্যাত শৌখিন গোয়েন্দা জয়ন্তবাবু।

কৌতূহলী চোখে হরিহর একবার জয়ন্তের মুখের পানে তাকালেন। তারপর বললেন, ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে মাঝে মাঝে আপনি কোনও কোনও মামলায় সাহায্য করেন।

জয়ন্ত বিনীত ভাবে বললে, আজ্ঞে, ঠিক সাহায্য করি বলতে পারি না, তবে সাহায্য করবার চেষ্টা করি বটে।

মুখ টিপে হেসে হরিহর বললেন, এখানেও কি সেই চেষ্টা করতে এসেছেন?

—আজ্ঞে না, মশায়ের চেহারা দেখেই বুঝেছি, আপনার কাছে আমার চেষ্টা নগণ্য।

—ঠিক। সুন্দরবাবুর সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার মত হচ্ছে, শখের গোয়েন্দার কাছে পেশাদার গোয়েন্দার শেখবার কিছুই নেই।

জয়ন্ত বললে, আপনার মত অভ্রান্ত। আমিও ওই মত মানি।

হরিহর বললেন, এইবার মামলার বৃত্তান্তটা আমি শুনতে চাই।

তিনকড়ি আবার সব কথা বলে গেলেন একে একে।

হরিহর সব শুনে বললেন, যে লোক এই বাজারে বিশ হাজার টাকা রাখে বৈঠকখানার কেতাবের আলমারিতে, তাকেই আমি অপরাধী বলে মনে করি। এ হচ্ছে চোরকে নিমন্ত্রণ করা আর খামকা পুলিশের কাজ বাড়ানো।

তিনকড়ি চুপ করে রইলেন কাঁচুমাচু মুখে।

জয়ন্ত বললে, টাকা ছিল ওই আলমারির ভিতরে।

হরিহর বললেন, টাকা যখন লোপাট হয়েছে, তখন আলমারিটা হাতড়ে আর কোনও লাভ হবে না।

—ওই যে চেয়ারখানা আলমারির সামনে উলটে পড়ে রয়েছে, ওখানা ছিল ওই টেবিলের সামনে।

—বসবার জন্যে চোর ওখানা টেনে এনেছিল আর কী!

—হতেও পারে, না হতেও পারে।

—না হতেও পারে কেন?

—চোর চটপট কাজ হাসিল করে সরে পড়তে চায়। সে চেয়ার পেতে বসে বিশ্রাম করে না। আর করলেও সে টেবিলের সামনেই গিয়ে বসতে পারত, চেয়ারখানা এত দূরে টেনে আনত না। বিশ্রাম করবার জন্যে এখানে ঢালা বিছানাও রয়েছে, তবে চেয়ার নিয়ে টানাটানি কেন?

হরিহর ঠাট্টার সুরে বললেন, কেন? তার জবাব আপনিই দিন না!

—আপনি না পারলে পরে আমাকেই জবাব দিতে হবে বই কি!

হরিহর মুখ ভার করে বললেন, আপনার জবাব শোনবার জন্যে আমার কোনোই আগ্রহ নেই। তিনকড়িবাবু, আলমারির কলে একটা চাবি লাগানো রয়েছে দেখছি।

—ও চাবি আমার নয়।

—চোরের?

—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—চাবিটা নতুন।

—আলমারিটা খোলবার জন্যে চোর হয়তো এই চাবিটা গড়িয়েছিল।

—তাহলে সে আগে এখানে এসে লুকিয়ে কলের ছাঁচ তুলে নিয়ে গিয়েছে!

—তাই তো জয়ন্তবাবু বললেন, এ কোনও সন্ধানী চোরের কাজ।

—জয়ন্তবাবু না বললেও এটুকু আমি বুঝতে পারতুম। তিনকড়িবাবু, আপনার বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে কে আছে?

—আমার স্ত্রী। আমার ছেলে নেই, কেবল একটি বিবাহিত মেয়ে আছে। সে শ্বশুরবাড়িতে। এখানে একজন রাত-দিনের চাকর আছে। বামুন আর ঝি ঠিকে।

হরিহর ফিরে নিজের সহকারীকে বললেন, সুশীল, বামুন আর চাকরকে সেপাইদের হেপাজতে রেখে এসো।

তিনকড়ি বললেন, আপনি কি তাদের সন্দেহ করছেন? তারা যে খুব বিশ্বাসী।

হরিহর ধমক দিয়ে বললেন, আরে রাখুন মশাই! জানেন তো সব! এরকম বেশির ভাগ চুরির জন্যেই দায়ী গৃহস্থের বামুন-চাকররা। যাও সুশীল।

জয়ন্ত বললে, চোর ওই গরাদ খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকেছে।

হরিহর উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। খোলা গরাদটা হাতে করে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে বললেন, এর মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নেই।

—না। কিন্তু জানালার বাইরে কর্দমাক্ত জমির উপরে চোরের পায়ের ছাপ আছে।

—বটে, বটে! সেগুলো তো দেখতে হয়!

—গরাদ-খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে ছাপগুলো আমি দেখে এসেছি। কিন্তু আপনি কি তা পারবেন?

প্রবল মস্তকান্দোলন করে হরিহর বললেন, মোটেই নয়, মোটেই নয়। ওইটুকু ফাঁক দিয়ে কিছুতেই আমার গতর গলবে না। আমার দেহ গলবার জন্যে দরকার একটা গোটা দরজার ফাঁক। তিনকড়িবাবু, ওই জমিতে যাবার অন্য পথ আছে তো?

আছে। আসুন। এই বলে তিনকড়ি অগ্রবর্তী হলেন।

যদুবাবু চুপিচুপি বললেন, জয়ন্তবাবু, একটা আরজি জানাতে পারি?

জয়ন্ত বললে, নিশ্চয় পারেন।

—আমি গোয়েন্দার গল্প পড়তে ভারী ভালোবাসি। কিন্তু সত্যিকার গোয়েন্দারা কেমন করে কাজ করেন তা কখনও দেখিনি। শুনেছি, পায়ের ছাপ দেখে গোয়েন্দারা অনেক কথাই বলতে পারেন। আপনাদের কাজ দেখবার জন্যে আমার বড়ো আগ্রহ হচ্ছে।

—বেশ তো, আসুন না।

মাধববাবু বললেন, আমাদেরও আগ্রহ কম নয়। আমরাও যেতে পারি কি?

জয়ন্ত বললে, আপনারা সবাই আসুন।

॥ ছয় ॥

ছোটো একফালি জমি—লম্বায় পঁচিশ হাত, চওড়ায় আট হাত। দক্ষিণ দিকে বাঁশের বেড়া, তারপর রাজপথ।

হরিহরের আগেই জয়ন্ত সেই জমির উপরে গিয়ে দাঁড়াল—তার পিছনে পিছনে যদুবাবু এবং আর সবাই।

জমির সব জায়গাই তখনও ভিজে রয়েছে। জয়ন্ত বললে, যদুবাবু, আমার পাশে পাশে আসুন। মাটির উপরে সাবধানে পা ফেলুন, চোরের পায়ের ছাপ মাড়িয়ে ফেললে হরিহরবাবু মহা খাপ্পা হয়ে উঠবেন।

তারা তিনকড়িবাবুর বৈঠকখানার গরাদে খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে জয়ন্ত বললে, মাটির উপরে ওই দেখুন চোরের পায়ের ছাপ। বেশ বোঝা যায়, সে বাঁশের বেড়া টপকে যেদিক থেকে এসেছে, আবার চলে গিয়েছে সেই দিকেই।

যদুবাবু বললেন, চোরটা কী বোকা! এতবড়ো একটা সূত্র পিছনে রেখে গিয়েছে।

জয়ন্ত হেসে বললে, চোরটা হচ্ছে কাঁচা, নইলে সে সাবধান হত।

এমন সময়ে তিনকড়ি প্রভৃতিকে নিয়ে হরিহর এসে পড়লেন। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পায়ের ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনকড়ি বললেন, জুতো-পরা পায়ের ছাপ। হরিহরবাবু, আমার বামুন আর চাকর জুতো পরে না।

হরিহর বললেন, হয়তো বাইরের চোরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। রুলের গুঁতো খেলেই পেটের কথা বেরিয়ে পড়বে।

জয়ন্ত বললে, হরিহরবাবু, পায়ের ছাপগুলো দেখে কী বুঝলেন?

—যা বোঝবার তা বুঝেছি। আপনাকে বলব কেন?

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, বেশ আপনি কী বুঝেছেন জানতে চাই না। কিন্তু আমি যা বুঝেছি, বলব কি?

হরিহর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, বলতে ইচ্ছা করেন, বলতে পারেন। আমার শোনবার আগ্রহ নেই।

জয়ন্ত বললে, প্রত্যেক পায়ের দাগের মাঝখানকার ব্যবধানটা লক্ষ করুন। এটা আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য যে, ঢ্যাঙা লোক পা ফেলে বেশি তফাতে তফাতে আর খাটো লোক পা ফেলে কম তফাতে তফাতে। এখানে পায়ের দাগের ব্যবধান দেখে কী মনে হয়?

হরিহর মাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, এগুলো নিশ্চয় কোনও ছোটো ছেলে—অর্থাৎ বালকের পায়ের ছাপ!

—ধরলুম তাই। এইবারে তিনকড়িবাবুর বৈঠকখানার দৃশ্যের কথা ভেবে দেখুন। তাঁর নোটগুলো ছিল আলমারির উপর তাকে। মাথায় ছোটো চোরের হাত উঁচুতে পৌঁছয়নি। তাই সে টেবিলের সামনে থেকে চেয়ারখানা আলমারির সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে নোটগুলো হস্তগত করে। তারপর তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে তার গায়ের ধাক্কা লেগে চেয়ারখানা উলটে পড়ে যায়। এ ব্যাপারটা গোড়াতেই আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। এদিকে আপনারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম। কিন্তু অধীনের কথা আপনি গ্রাহ্যের মধ্যেও আনতে রাজি হননি।

অপ্রতিভ ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন হরিহর।

তিনকড়ি বললেন, বালক চোর? কী আশ্চর্য।

যদুবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, একটা পুঁচকে ছোকরা বিশ হাজার টাকা হাতিয়ে লম্বা দিয়েছে! আজব কাণ্ড!

মাধববাবু বললেন, কালে কালে হল কী?

॥ সাত ॥

জয়ন্ত বললে, হরিহরবাবু, এই জুতো পরা পায়ের ছাপের আর-একটা বিশেষত্ব লক্ষ করুন। চোর যে জুতো পরে এখানে এসেছিল, তার ডান পাটির তলায় বাঁ-দিকের উপর কোণের চামড়ার খানিকটা চাকলা উঠে গিয়েছে। এই দেখুন, প্রত্যেক ডান পায়ের ছাপেই তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

হরিহরের মুখের উপর থেকে মুরুব্বিয়ানার ভাব মিলিয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, তাই তো বটে, তাই তো বটে! তাকে পেলে তার বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে আর কোনও কষ্ট হবে না। তারপরেই একটু থেমে, মুষড়ে পড়ে তিনি আবার বললেন, কিন্তু তাকে আর পাব কি?

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, চোর নিজেই আমাদের কাছে এসে ধরা দেবে।

হরিহর সচমকে শুধোলেন, কী বললেন?

—চোরের খোঁজ আমি পেয়েছি।

—কোথায়, কোথায়?

—এইদিকে একটু এগিয়ে আসুন। এই পায়ের ছাপগুলো দেখে কী বুঝছেন?

—এও তো চোরেরই পায়ের ছাপ।

—কোনও তফাত নেই তো?

ভালো করে দেখে সন্দিগ্ধ স্বরে হরিহর বললেন, মনে হচ্ছে এ ছাপ যেন টাটকা।

জয়ন্ত বললে, ঠিক তাই। এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে এইমাত্র। নির্বোধ চোর খেয়ালে আনেনি, কাল রাতের বিষম বৃষ্টির জন্যে মাটি এখনও ভিজে আছে।....আরে, আরে যদুবাবু, খরগোশের মতো দৌড়ে কোথা যান? মানিক, হুঁশিয়ার!

সকলে বিপুল বিস্ময়ে দেখলে, যদুবাবুর বামনাবতারের মতো অতিখর্ব দেহখানি দৌড় মেরেছে তীব্র বেগে বাঁশের বেড়ার দিকে। কিন্তু বেড়া টপকাবার আগেই মানিক তাঁকে ছুটে গিয়ে গ্রেপ্তার করে ফেললে।

তিনকড়ি বিস্মিত স্বরে বললেন, যদু, তুমি কার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে?

জয়ন্ত বললে, পুলিশের ভয়ে। এখনই ওঁর বাড়ি খানাতল্লাশ করলে আপনার বিশ হাজার টাকার সন্ধান পাওয়া যাবে।

তিনকড়ি এ কথা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না, ফ্যালফ্যাল করে যদুবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

জয়ন্ত বললে, যখন চেয়ারের রহস্য আন্দাজ করলুম, পায়ের ছাপগুলো পরীক্ষা করলুম, আর স্বচক্ষে যদুবাবুর বালকের মতো খাটো মূর্তিখানি দর্শন করলুম, তখনই জেগে উঠেছিল আমার সন্দেহ। ওঁর আর তিনকড়িবাবুর সামনাসামনি বাড়ি। তিনকড়িবাবু যে বাড়িতে বিশ হাজার টাকা এনে রেখেছেন, ওঁর পক্ষে একথা জানা খুবই স্বাভাবিক। ওঁর বন্ধু যখন মাঝে মাঝে আলমারির ভিতর থেকে নোটগুলো বার করতেন, তখন সে দৃশ্য তিনি যে নিজের বাড়ি থেকেই দেখতে পেতেন, এইটুকুও অনুমান করা যায় খুবই সহজেই। বৈঠকখানায় ছিল তাঁর নিয়মিত আসা-যাওয়া। আলমারির কলের ছাঁচ তোলবার অবসর পেতে পারেন উনিই। সুতরাং অধিক বলা বাহুল্য। তবে এ কথা ঠিক যে, নিম্নশ্রেণির নির্বোধের মতো আজ যেচে ভিজে মাটি মাড়িয়ে উনি যদি আমার ফাঁদে পা না দিতেন, তাহলে এত তাড়াতাড়ি ওঁকে হরিহরবাবুর কবলে আত্মসমর্পণ করতে হত না।

হ্যাঁ, ভালো কথা। যদুবাবুর ডানপাটির জুতোর তলাটা একবার পরীক্ষা করে দেখলে ভালো হয়।

পরীক্ষার ফল হল সন্তোষজনক। জুতোর তলায় যথাস্থানে ছিঁড়ে গিয়েছে খানিকটা চামড়া।

জয়ন্ত বললে, মানিক, এখন শেষকৃত্যের ভার পুলিশের হাতে সমর্পণ করে চলো আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি। কিন্তু যাবার আগে একটি জিজ্ঞাস্য আছে। হরিহরবাবু, শখের গোয়েন্দারা কি একেবারেই ঘৃণ্য জীব?

হরিহর অনুতপ্ত স্বরে বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। আজ আমার চোখ ফুটল।

আমার গোয়েন্দাগিরি

রবিবারে রবিবারে প্রশান্তবাবুর বৈঠকখানায় বসত একটি তাস-দাবা-পাশার আসর। দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়ার পর সভ্যরা একে একে সেখানে গিয়ে দেখা দিতেন। তারপর খেলা চলত প্রায় বৈকাল পাঁচটা পর্যন্ত।

মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বসতুম আমিও। তাস বা পাশার দিকে মোটেই ঘেঁসতুম না, কিন্তু দাবার দিকে আমার ঝোঁক ছিল যথেষ্ট। ওখানে জন-তিনেক পাকা দাবা খেলোয়াড় আসতেন, তাঁদের সঙ্গে আমি করতুম শক্তি পরীক্ষা।

বলা বাহুল্য, খেলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও চলত। বাজারে মাছের দর ও বক্তৃতা মঞ্চে চড়ে জহরলাল নেহরুর লম্পঝম্প, গড়ের মাঠের ফুটবল খেলা ও বিলাতি পার্লামেন্টে চার্চিলের বাক্যবন্দুকনিনাদ, বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনেতা শিশির ভাদুড়ি ও পণ্ডিচারি আশ্রমের ঋষি অরবিন্দ—অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোনও কিছুই বাদ থাকত না আমাদের উত্তপ্ত আলোচনার বাইরে।

সেদিন তখনও খেলা শুরু হয়নি, এমন সময়ে পুলিশ কোর্টের একটা মামলার কথা উঠল। সম্প্রতি একসঙ্গে তিনটে নরহত্যা হয়েছিল এবং ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু কেসটা হাতে নিয়ে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে আসামিকে আদালতে হাজির করেছেন।

একজন শুধোলেন, মানিকবাবু, এ মামলাতেও আপনাদের হাত আছে তো?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললুম, তার মানে?

—লোকে তো বলে, সুন্দরবাবুর সব মামলার পিছনে থাকেন আপনি আর আপনার বন্ধু জয়ন্তবাবু।

—লোকের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত। অবশ্য কোনও কোনও মামলায় সুন্দরবাবু আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসেন বটে। পরে সেসব ক্ষেত্রে জয়ন্তই হয় আসল পরামর্শদাতা, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে হাজির থাকি মাত্র।

হঠাৎ পিছন থেকে জিজ্ঞাসা শুনলুম, জয়ন্তবাবুর সঙ্গে সঙ্গে এতদিন থেকে গোয়েন্দাগিরিতেও আপনার কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে তো?

ফিরে দেখি নরেন্দ্রবাবু—সুবিখ্যাত ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ সেন। বিলাত ফেরত। যেমন তাঁর হাতযশ, তেমনি তাঁর পশার। তাঁর আয়ের পরিমাণ শুনলে মাথা ঘুরে যায়। পাশের বাড়িতেই থাকেন। মাঝে মাঝে হাঁপ ছাড়বার জন্যে এই আসরে উঁকিঝুঁকি মারতে আসেন।

নরেনবাবু আবার শুধোলেন, জয়ন্তবাবুর পার্শ্বচর হয়ে গোয়েন্দাগিরিতে আপনারও কিঞ্চিৎ বুৎপত্তি জন্মেছে তো?

আমি হেসে বললুম, হ্যাঁ নরেনবাবু, জয়ন্তের সঙ্গে আমার তুলনা চলে না বটে, কিন্তু গোয়েন্দাগিরিতে সাধারণ লোকের চেয়ে আমি কিছু বেশি জ্ঞান অর্জন করেছি বই কি।

নরেনবাবু একখানা কাষ্ঠাসনের উপরে নিজের অঙ্গভার ন্যস্ত করে বললেন, তাহলে ছোট্ট একটি মামলার কথা শুনবেন?

আমি বললুম, আমার বন্ধু জয়ন্তের মতে গোয়েন্দাগিরিতে ছোটো বা বড়ো মামলা বলে কোনও কথা নেই। একমাত্র দ্রষ্টব্য হচ্ছে, মামলাটা চিত্তাকর্ষক কি না? এই দেখুন না, পুলিশকোর্টের যে মামলা নিয়ে আজ গোয়েন্দাগিরির কথা উঠেছে, একদিক দিয়ে সেটা বড়ো যে-সে মামলা নয়। একসঙ্গে তিন-তিনটে খুন! কিন্তু অপরাধী ঘটনাক্ষেত্রে এত সূত্র রেখে গিয়েছিল যে ধরা পড়েছে অতি সহজে। আসলে একেই বলে ছোটো মামলা। কারণ এটা চিত্তাকর্ষক নয়, এর মধ্যে মস্তিষ্কের খেলাও নেই। আবার এমন সব মামলাও আছে, যেখানে অপরাধ হয়তো তুচ্ছ, অথচ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার মতো সূত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এমন সব মামলাতে সফল হলেই গোয়েন্দার প্রকৃত কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

নরেনবাবু বললেন, আমি যদি ওই রকম কোনও মামলারই ভার আপনার হাতে দিতে চাই, আপনি গ্রহণ করতে রাজি আছেন কি?

বললুম, আমার আপত্তি নেই। মনে মনে ভাবলুম, একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক না, জয়ন্তের কোনও সাহায্য না নিয়েই নিজের বুদ্ধির জোরে মামলাটার কিনারা করতে পারি কি না!

ঘরের অন্যান্য লোকেরা প্রশ্ন করতে লাগলেন, কীসের মামলা ডাক্তারবাবু? খুনের না চুরির, না আর কিছুর?

নরেনবাবু বললেন, এখন আমি কোনও কথাই ভাঙব না, আসুন মানিকবাবু, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলুন।

॥ দুই ॥

নরেনবাবুর বাড়ি। একখানা মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে দেওয়াল ঘেঁসে একখানা গদি মোড়া বড়ো চেয়ার, তার সামনে একটি টেবিল। টেবিলের উপরে দোয়াতদানে লাল ও কালো কালির দোয়াত। কলমদানে দুটি কলম। ব্লটিংয়ের প্যাড—তার উপরে খানিকটা অংশ লাল কালি মাখা। একটি টেলিফোন যন্ত্র। টেবিলের তিন পাশে খানকয়েক কাঠের চেয়ার। ঘরের দেওয়ালে একখানা অ্যালম্যানাক ছাড়া আর কোনও ছবি নেই। মেঝে মার্বেল পাথরের। কোনওরকম বাহুল্য বর্জিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর।

এইসব লক্ষ করছি, নরেনবাবু বললেন, এই ঘরে বসে প্রত্যহ সকালে আর সন্ধ্যায়

আমি রোগীদের সঙ্গে দেখা করি। পরশু সন্ধ্যায় এইখানেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে।

—কী রকম ঘটনা?

—মোহনতোষবাবুর এক বন্ধুর নাম বিনোদবাবু। বিনোদলাল চ্যাটার্জি। ভদ্রলোক কন্যাদায়ে পড়েছিলেন। মোহনতোষবাবুর বিশেষ অনুরোধ তাঁকে আমি পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলুন।

—মোহনতোষবাবু কে?

—তিনি আমার প্রতিবেশীও বটে, রোগীও বটে। কিন্তু তাঁর একটা বড়ো পরিচয় আছে। আপনি কি শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের বিখ্যাত অভিনেতা মোহনতোষ চৌধুরির নাম শোনেননি?

—কারুর কারুর মুখে শুনেছি বটে।

—তাঁর কথাই বলছি।

—তারপর?

—পরশু সন্ধ্যার সময়ে আমি এই ঘরে বসে আছি, এমন সময়ে বিনোদবাবু এসে তাঁর ঋণ পরিশোধ করে গেলেন। পাঁচখানি হাজার টাকার নোট।* ঠিক তারই মিনিট পাঁচেক পরে ফোনে একটা অত্যন্ত জরুরি ডাক এল। বসন্তপুরের মহারাজা বাহাদুর ব্লাডপ্রেসারের দরুন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন, আমাকে সেই মুহূর্তেই যেতে হবে। তখনই যাত্রা করলুম। তাড়াতাড়িতে যাবার সময়ে নোট পাঁচখানা ব্লটিংয়ের প্যাডের তলায় ঢুকিয়ে রেখে গেলুম। রাজবাড়ি থেকে যখন ফিরে এলুম রাত তখন সাড়ে ন-টা। এসে এই ঘরে ঢুকে দেখি, প্যাডের উপর লাল কালির দোয়াতটা উলটে পড়ে রয়েছে আর প্যাডের তলা থেকে অদৃশ্য হয়েছে হাজার টাকার নোট পাঁচখানা।

আমি বললুম, নিশ্চয় প্যাডের তলা থেকে যখন নোটগুলি টেনে নিচ্ছিল, সেই সময়ে দৈবগতিকে তার হাত লেগে লাল কালির দোয়াতটা উলটে পড়ে গিয়েছিল।

—খুব সম্ভব তাই।

—কারুর উপরে আপনার সন্দেহ হয়?

—বিশেষ কারুর উপর নয়।

—পুলিশকে খবর দিয়েছেন?

—না।

—কেন?

—কেলেঙ্কারির ভয়ে। আমি বেশ জানি পুলিশ এসে আমার বাড়ির লোকদেরই

---

*তখনও বাজারে হাজার টাকার নোট অপ্রচলিত হয়নি।

টানাটানি করবে। আমার পক্ষে সেটা অসহনীয়। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়ির কোনও লোকের দ্বারা এ কাজ হয়নি—হতে পারে না। অন্দরমহলে থাকেন আমার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী, আমার দুই বালিকা কন্যা আর শিশুপুত্র। তাদের কারুরই এ ঘরে আসবার কথা নয়। বাড়ির প্রত্যেক দাসদাসী পুরাতন আর বিশ্বস্ত। নোটগুলো যখন প্যাডের তলায় রাখি, তখন তাদের কেউ যে এ অঞ্চলে ছিল না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। সুতরাং তাদের কেউ প্যাড তুলে দেখতে যাবে কেন?

—বাইরের কোনও জায়গা থেকে কেউ কি আপনার কার্যকলাপের উপরে দৃষ্টি রাখতে পারে না?

—মানিকবাবু, পরশু দিন সন্ধ্যার আগেই এই দুর্দান্ত শীতেও হঠাৎ বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, মনে আছে কি? দেখুন, এই ঘরের উত্তর দিকে আছে চারটে জানলা আর পূর্ব দিকে আছে দুটো জানলা আর দুটো দরজা। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক একেবারে বন্ধ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে উত্তরের জানলাগুলোর ভিতর দিয়ে এই দরজা দেখা যায় বটে, কিন্তু বৃষ্টির ছাট আসছিল বলে উত্তর দিকের সব জানলাই বন্ধ ছিল। খোলা ছিল খালি পূর্ব দিকের জানলা-দরজা। ওদিকে আছে আমার বাড়ির উঠান, তারপর বারো ফুট উঁচু পাঁচিল, তারপর মোহনতোষবাবুর বাড়ি। আমার বাড়ির উঠানে আলো জ্বলছিল, আমি সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখতে পাইনি। বৃষ্টি আর শীতের জন্যে মোহনতোষবাবুর বাড়ির জানলাগুলো নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল, নইলে ও বাড়ির ঘরের আলোগুলো আমার চোখে পড়ত। সেদিন আমি কী করছি না করছি, কেউ তা দেখতে পায়নি।

—আপনি রাজবাড়িতে গেলে পর সেদিন অন্য কোনও রোগীর বাড়ি থেকে আর কেউ কি আপনাকে ডাকতে আসেনি?

—এসেছিল বই কি! হরিচরণের মুখে শুনেছি, পাঁচজন এসেছিল।

—হরিচরণ কে?

—সে বালক বয়স থেকেই এ বাড়িতে কাজ করে, এমন বিশ্বাসী আর সৎলোক আমি জীবনে আর দেখিনি। আমার সমস্ত আলমারি দেরাজ বাক্সের চাবি থাকে তার হাতে, আমার সমস্ত টাকা সেই-ই ব্যাংকে জমা দিয়ে আসে, তাকে না হলে আমার চলে না। আমার অবর্তমানে সেই-ই বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কয়।

—হরিচরণ কী বলে?

—সেদিন পাঁচজন লোক আমাকে ডাকতে এসেছিল। তাদের মধ্যে তিনজন লোক আমি নেই শুনেই চলে যায়, একজন লোক ঠিকানা রেখে আমাকে কল দিয়ে যায়, কেবল একজন লোক বলে, আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। হরিচরণ তখন তাকে এই ঘরে এনে বসিয়ে নিজের অন্য কাজে চলে যায়। কিন্তু মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে লোকটিকে

সে আর দেখতে পায়নি। তবে এ জন্যে তার মনে কোনও সন্দেহ হয়নি। কারণ এখানে কোনও মূল্যবান জিনিসই থাকে না, আর বাইরের লোকের আনাগোনার জন্যে এ ঘরটা সর্বদাই খোলা পড়ে থাকে। হরিচরণের বিশ্বাস, আমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে লোকটি আর অপেক্ষা না করে চলে গিয়েছিল।

—সে নাম-ধাম কিছু রেখে যায়নি?

—না।

—তার চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন?

—পেয়েছি। তার দোহারা চেহারা, শ্যাম বর্ণ, দেহ দীর্ঘ। শীতের জন্যে সে মাথা থেকে প্রায় সমস্ত দেহটাই ঢেকে আলোয়ান জড়িয়ে রেখেছিল, দেখা যাচ্ছিল কেবল তার মুখখানা। তার চোখে ছিল কালো চশমা, মুখে ছিল কাঁচা-পাকা গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কম হবে না।

—লোকটির চেহারার বর্ণনা কিছু অসাধারণ। আপনার কি তারই উপর সন্দেহ হয়?

—মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় যে, কোনও একজন বাইরের লোক আমার ঘরে এসে হঠাৎ টেবিলের প্যাডখানা তুলে দেখতে যাবে কেন? এ-রকম কৌতূহল অস্বাভাবিক নয় কি?

আমি নিরুত্তর হয়ে চিন্তা করতে লাগলুম। জয়ন্ত বলে, কোনও নূতন মামলা হাতে পেলে গোয়েন্দার প্রধান আর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সকলকেই সন্দেহ করা। কিন্তু খানিকক্ষণ ভাবনা-চিন্তার পর আমার সন্দেহ ঘনিভূত হয়ে উঠল, দুইজন লোকের উপরে। কে ওই আলোয়ান মুড়ি দেওয়া কালো চশমাপরা, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িওয়ালা রহস্যময় আগন্তুক? নরেনবাবুর প্রস্থানের পরেই ঘটনা ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব এবং কেমন করেই বা জানতে পারলে, প্যাডের তলায় আছে পাঁচ হাজার টাকার নোট? তার মূর্তি, তার প্রবেশ ও প্রস্থান, তার কার্যকলাপ সমস্তই এমন অদ্ভুত যে যুক্তি প্রয়োগ করেও কিছু ধরবার বা বোঝবার উপায় নাই।

শেষটা আমি সাব্যস্ত করলুম, এতটা যুক্তিহীনতা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ওই মূর্তির কোনও অস্তিত্বই নেই, ও কাল্পনিক মূর্তি, ঘটনাক্ষেত্রে তাকে টেনে আনা হয়েছে, অন্য কোনও ব্যক্তির স্বার্থের অনুরোধে।

সেই ব্যক্তি কে? নিশ্চয়ই হরিচরণ! তার সাধুতা আর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নরেনবাবুর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সার্টিফিকেট মূল্যহীন, সাধুতার আবরণে সর্বদাই নিজেদের ঢেকে রাখে বলেই অসাধুরা আমাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করতে পারে। আবার মানুষের মন এমন আশ্চর্য বস্তু যে, সত্যিকার সাধুও সময়ে সময়ে হঠাৎ অসাধু হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, হরিচরণ, ওই হরিচরণ! কালো চশমাপরা মূর্তিটার সৃষ্টি হয়েছে তারই উর্বর মস্তিষ্কের

মধ্যে। নিজে নিরাপদ হবে বলে হরিচরণই ওই রহস্যময় **কাল্পনিক মূর্তিটাকে টেনে এনেছে** ঘটনাক্ষেত্রে। অতএব—

অতএব হরিচরণকে ডেকে এনে খানিক নাড়াচাড়া **করলেই পাওয়া যাবে মামলার** মূল সূত্র।

॥ তিন ॥

ঠিক এই সময়েই ঘরের বাইরে ডাক শুনলুম—মানিক, অ মানিক! তুমি এখানে আছ নাকি?

এ জয়ন্তের কণ্ঠস্বর! তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, উঠানের রোয়াকের উপরে হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত।

—ব্যাপার কী! তুমি কোত্থেকে

—তোমার রবিবাসরীয় আড্ডায় গিয়েছিলুম তোমাকে অন্বেষণ করতে কিন্তু সেখানে গিয়ে খবর পেলুম তোমার আজকের আসর এইখানে।

নরেনবাবুর সঙ্গে জয়ন্তের পরিচয় করিয়ে দিলুম। তিনি তাকে সাদরে ঘরের ভিতরে নিয়ে এলেন।

জয়ন্ত শুধোলে, ডাক্তারবাবু, আপনি হঠাৎ আমার মানিক অপহরণ করেছেন কেন?

—আজ্ঞে, মানিকবাবুর হাতে আমি একটা মামলার ভার অর্পণ করেছি।

—বটে, বটে, বটে! মানিকও তাহলে আজকাল স্বাধীনভাবে গোয়েন্দার ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়! বেশ, বেশ উন্নতিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

আমি একটু লজ্জিত ভাবে বললুম, না ভাই জয়ন্ত, আমি তোমার উপযুক্ত শিষ্য হতে পেরেছি কি না, সেইটেই আমি আজ পরীক্ষা করতে এসেছি।

—দেখছেন ডাক্তারবাবু, বন্ধুবর মানিকের বিনয়েরও অভাব নেই। এ হচ্ছে আসল গুণীর লক্ষণ! তারপর মানিক, মামলাটার মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে পেরেছ তো?

—মনে হচ্ছে পেরেছি। মামলাটার কথা তুমি শুনতে চাও?

—আপত্তি নেই।

তারপর দুই চক্ষু মুদে জয়ন্ত আমার মুখে মামলাটার আদ্যপান্ত শ্রবণ করলে। সেই কালো চশমাধারী মূর্তি ও হরিচরণ সম্বন্ধে আমার মতামতও তাকে চুপি চুপি জানিয়ে রাখতে ভুললুম না।

জয়ন্ত চোখ খুলে উঠে দাঁড়িয়ে, তারপর টেবিলের সামনে গিয়ে ডাক্তারবাবুর নিজস্ব

চেয়ারের উপর বসে পড়ল। তারপর পূর্ব দিকের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নিষ্পলকনেত্রে। তারপর মুখ নামিয়ে টেবিলের প্যাডের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। তারপর মৃদু হেসে চুপ করে বসে রইল প্রায় সাত-আট মিনিট ধরে। তার মুখ সম্পূর্ণ ভাবহীন; কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম, তার মন এখন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তারবাবু, ঘটনার দিন যখন আপনি বাইরে যান, তখন এই টেবিলের প্যাডের উপরে আর কোনও কাগজপত্র ছিল?

—না।

—তোমার বিশ্বাস ভুল।

—কী করে জানলে?

—ওই দ্যাখো প্যাডের পরে ছড়ানো লাল কালির মাঝখানে রয়েছে একটা চতুষ্কোণ (কিন্তু সমচতুষ্কোণ নয়) সাদা জায়গা। এ জায়গায় কালি লাগেনি কেন?

—ওখানে বোধহয় কোনও কাগজপত্র ছিল। কালির ধারা তার উপর দিয়েই বয়ে গেছে।

—এতক্ষণে তোমার বুদ্ধি কিঞ্চিৎ খুলেছে দেখে সুখী হলুম।

নরেনবাবু বলে উঠলেন, না মশাই, সেদিন ওই প্যাডের উপরে নিশ্চয়ই কোনও কাগজপত্র ছিল না।

জয়ন্ত সায় দিয়ে বলল, আপনিও ঠিক কথাই বলেছেন ডাক্তারবাবু। তবু এই সাদা অংশটার সৃষ্টি হল কেন, শুনুন। চোর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রথম প্যাডের তলা থেকে নোটগুলো বার করে নেয়। তারপর সেগুলো প্যাডের উপরেই রেখে গুনে দেখে। ঠিক সেই সময়েই তার গায়ের আলোয়ান বা অন্য কিছু লেগে লাল কালির দোয়াতটা হঠাৎ উলটে যায়।

আমি চমৎকৃত হয়ে বললুম, তা হলে লাল কালি পড়েছিল সেই নোটগুলোর উপর?

জয়ন্ত আমার কথার জবাব না দিয়ে বললে, ডাক্তারবাবু, নোটগুলোর নম্বর নিশ্চয়ই আপনার কাছে নেই?

—না মশাই, নম্বর টুকে নেবার সময় পাইনি। তবে বিনোদবাবুর কাছে খবর নিলে নম্বরগুলো পাওয়া যেতে পারে।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজকে এখনই খবর দিন। নম্বরগুলো পেলেই আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। এখন আমি বিদায় নিলুম, হয় কাল সন্ধ্যার সময়ে নয় দুই-এক দিন পরেই আপনার সঙ্গে আবার দেখা করব—এটা চিত্তাকর্ষক হলেও সহজ মামলা। চলো মানিক। নমস্কার ডাক্তারবাবু!

রাস্তায় এসে জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলুম, কে চোর সে-বিষয়ে তুমি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ।

জয়ন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললে, আমি এইটুকুই আন্দাজ করতে পেরেছি যে তুমি হচ্ছ একটি গাড়ল, একটি গর্দভ, একটি ইগ্নোমেরাস।

আমি একেবারে দমে গেলুম।

॥ চার ॥

সোমবারের সন্ধ্যা। জয়ন্তের পিছনে গুটি গুটি যাত্রা করলুম নরেনবাবুর বাড়ির দিকে। দেখছি কাল বৈকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এবং আজ সকাল থেকে বৈকাল পর্যন্ত সে বাড়ির বাইরেই কাটিয়ে দিয়েছে। তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি ছোটোখাটো ইঙ্গিত পর্যন্ত আমাকে দেয়নি। আজও তার মুখ এমন গম্ভীর যে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা হল না।

নরেনবাবু বসেছিলেন আমাদেরই অপেক্ষায়। সাগ্রহে শুধোলেন, কিছু খবরাখবর পেলেন নাকি!

পকেট থেকে একখানা খাম বার করে জয়ন্ত বললে, এই নিন।

খামের ভিতর থেকে বেরুল পাঁচখানা নোট—প্রত্যেকখানা হাজার টাকার!

জয়ন্ত বললে, দেখছেন ডাক্তারবাবু! সব নোটের উপরেই কিছু না কিছু লাল কালির দাগ আছে। একখানা নোটে একদিকের প্রায় সবটাই লাল কালিমাখা—একখানা ছিল সব উপরে।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে নরেনবাবু প্রায় আধ মিনিট নীরবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, নোটগুলোর উপরে লাল কালির দাগ এতটা ফিকে কেন?

—চোর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।

—কিন্তু চোর কে?

জয়ন্ত বললে, ক্ষমা করবেন, চোরের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তার নাম প্রকাশ করব না। কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, সে আপনার বাড়ির লোক নয়। ভবিষ্যতে সৎ পথে থাকার জন্যে আমি তাকে সুযোগ দিতে চাই, কারণ এটা হচ্ছে তার প্রথম অপরাধ। আজ আমরা আসি, নমস্কার!

॥ পাঁচ ॥

বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, ভাই জয়ন্ত আমার কাছেও কি তুমি চোরের নাম প্রকাশ করবে না।

জয়ন্ত হেসে বললে, নিশ্চয়ই করব। চোরের নাম মোহনতোষ চৌধুরি।

সবিস্ময়ে বললুম, তাকে তুমি কেমন করে সন্দেহ করলে?

—কেবল পূর্ব দিকের দরজা-জানলা দিয়েই সেদিন নরেনবাবুর ঘরের ভিতরটা দেখবার সুযোগ ছিল। আর নরেনবাবুর চেয়ারে বসে পূর্ব দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলুম কেবল মোহনতোষের বাড়ির দোতলার ঘর। এই হল আমার প্রথম সন্দেহ। তারপর সেই কালো চশমাপরা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটার কথা ভাবতে লাগলুম। সে শীতের ওজরে আবার মাথা থেকে প্রায় সর্বাঙ্গে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে এসেছিল। কালো চশমা, সর্বাঙ্গে আবরণ—এ সব যেন আত্মগোপনের চেষ্টা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িও সন্দেহজনক। লোকটা হয়তো ছদ্মবেশের সাহায্য নিয়েছিল। কেন? পাছে হরিচরণ তাকে চিনে ফেলে, সে নিশ্চয়ই পরিচিত ব্যক্তি। তার আকস্মিক প্রস্থানও অল্প সন্দেহজনক নয়। আগেই শুনেছি, মোহনতোষ একজন অভিনেতা, তার ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণ আছে। এই হল আমার দ্বিতীয় সন্দেহ। তার বন্ধু বিনোদ যে ঘটনার দিনেই সন্ধ্যাবেলায় নরেনবাবুর টাকা শোধ দিতে যাবে, এটাও নিশ্চয়ই সে জানতে পেরেছিল। আমার তৃতীয় সন্দেহ। তারপর আমি এখানে-ওখানে ঘুরে যেসব তথ্য সংগ্রহ করলুম তা হচ্ছে এই মোহনতোষ বিবাহ করেনি, বাড়িতে একাই থাকে। বাড়ির একতলা সে ভাড়া দিয়েছে। তার আরও একখানা ভাড়া বাড়ি আছে। এইসব থেকে তার মাসিক আয় প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা। ওই আয়ে তার মতো একক লোকের দিন অনায়াসে চলে যেতে পারে, কিন্তু তার চলত না। কারণ সে ছিল বিষম জুয়াড়ি। বাজারে তার কয়েক হাজার টাকা ঋণ হয়েছিল। সে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেও টাকা ধার করতে ছাড়েনি। এই ঋণ কতক শোধ করতে না পারলে শীঘ্রই তাকে আদালতে আসামি হয়ে দাঁড়াতে হবে।

মানিক, সব কথা আর সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আজ আমি মোহনতোষের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। এই তার প্রথম অপরাধ। আমাকে দেখেই ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। তারপর আমি তখন কীভাবে সে কার্য সিদ্ধি করেছে তার একটা প্রায় সঠিক বর্ণনা দিলুম আর জানালুম যে নোটের নম্বর আমরা পেয়েছি, এখন এই কালিমাখা নোটগুলো ভাঙাতে গেলেই বিপদ অনিবার্য, তখন সে একেবারেই ভেঙে পড়ল।

তার নিজের মুখেই শুনলুম, কোনওরকম চুরি করবার ইচ্ছাই তার ছিল না, জীবনে কখনও চুরি-চামারি করেওনি। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে তার অত্যন্ত মাথা ধরেছিল, ঘরের আলো নিবিয়ে সে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকেই সে দেখতে পায় তার বন্ধু বিনোদ এসে নোটগুলো দিয়ে গেল নরেনবাবুকে আর তিনিও হঠাৎ ফোনে ডাক পেয়ে সেগুলো প্যাডের তলায় গুঁজে রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় গজিয়ে উঠল সস্তায় কিস্তি মাত করবার দুর্বুদ্ধি। কিন্তু মানিক, তার প্রথম অপরাধ আমরা ক্ষমা করেছি।

—আর সেই সঙ্গে তুমি ব্যর্থ করে দিলে আমার প্রথম গোয়েন্দাগিরি। দুঃখিত ভাবে আমি বললুম।

নেতাজির ছয় মূর্তি

'নেতাজির ছয় মূর্তি' গ্রন্থটি 'মমতাজ বেগমের কালো মুক্তো' নামেও প্রকাশিত হয়েছে।

॥ এক ॥

অসাধারণ পাগলামি

চায়ের পালা শেষ।

জয়ন্ত বললে, মানিক অতঃপর কিংকর্তব্য। এক চাল দাবা-বোড়ে খেলবে নাকি?

—রাজি! মানিক উঠে দাবা-বোড়ের ছক আনতে গেল।

—সুন্দরবাবু কী করবেন? খেলা দেখবেন, না থানায় ফিরবেন?

—ওই ইজিচেয়ারে আরাম করে পা ছাড়িয়ে শুয়ে আমি একটা গোটা চুরুটকে ভস্মে পরিণত করব।

—হাতে বুঝি নতুন মামলা নেই?

—বিশেষ কিছু নাই।

—তবু শুনি না। ঘুঁটি সাজাতে সাজাতে বললে জয়ন্ত।

—এ একটা নিতান্ত বাজে মামলা ভাই, ল্যাজা কি মুড়ো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। এ মামলায় গোয়েন্দা না ডেকে ডাক্তার ডাকাই উচিত।

—অর্থাৎ?

—পাগলামি আর কী? কিন্তু অদ্ভুত রকম পাগলামি। সুভাষচন্দ্র বসুকে সারা দেশ ভক্তি করে তো? কিন্তু দেশে এমন লোকও আছে, যে নেতাজির প্রতিমূর্তি দেখলেই খেপে গিয়ে আছড়ে চুরমার করে দেয়।

—ধেৎ, ও নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। জয়ন্ত একটা বোড়ের চাল দিলে।

—হ্যাঁ, পাগলামি সারাবার জন্যে ডাক্তার ডাকা উচিত। কিন্তু কেউ যদি নেতাজির উপরে নিজের আক্রোশ মেটাবার জন্যে পরের বাড়িতে ঢুকে নেতাজির প্রতিমূর্তি চুরি করে, তাহলে পুলিশ না ডেকে উপায় থাকে না।

জয়ন্ত খেলা ভুলে সিধে হয়ে বসে বললে, মূর্তি ভাঙবার জন্যে মূর্তি চুরি? ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে! বলুন তো খুলে!

—চিৎপুর রোডে 'শিল্পশালা' বলে এক দোকান আছে, তার মালিক হচ্ছেন অনিল বসু। ওখানে বিক্রি হয় নানারকম ছবি আর মূর্তি। দোকানের এক কর্মচারী সামনের দিক ছেড়ে পেছন দিকে গিয়ে কোনও কাজে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ একটা লোক দোকানে ঢুকে কাউন্টারের উপর থেকে নেতাজির প্রতিমূর্তি তুলে নিয়ে মাটির উপরে আছড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তারপর এত তাড়াতাড়ি সে পালিয়ে যায় যে কেউ তাকে ধরতে পারেনি। এ হচ্ছে চার দিন আগেকার কথা। দোকানের মালিক বিটের পাহারাওয়ালার কাছে অভিযোগ

করেছিল বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত! প্লাস্টারে গড়া মূর্তি, দাম দশ টাকা মাত্র—তুচ্ছ ব্যাপার!

তারপর দ্বিতীয় ঘটনা। এটা কিঞ্চিৎ গুরুতর, অদ্ভুত বটে। ঘটেছে কাল রাত্রে।

ডাক্তার চক্রবর্তীর নাম শুনেছ তো? তাঁর বাসভবন হচ্ছে সিমলায়, আর ডাক্তারখানা কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে। তিনি নেতাজির গোঁড়া ভক্ত। ওই শিল্পকলা থেকেই তিনি নেতাজির দুটি প্রতিমূর্তি কিনেছিলেন। তার একটিকে রেখেছিলেন বসত বাড়িতে আর একটিকে ডাক্তার খানায়। কাল রাত্রে বাড়িতে চোর ঢুকেছিল; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সে নেতাজির মূর্তি ছাড়া আর কিছুই চুরি করেনি। বাড়ির বাইরেকার বাগানে গিয়ে মূর্তিটা দেওয়ালে আছড়ে ভেঙে সে লম্বা দিয়েছে।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, আজব কাণ্ড। তিনটে মূর্তিই কি এক ছাঁচ থেকে গড়া?

—হ্যাঁ। তারপর শোনো। আজ সকালে চারুবাবু ডাক্তারখানায় ঢুকে দেখেন, সেখানেও কাল রাত্রে কে এসে নেতাজির মূর্তি নিয়ে ভেঙেছে আর মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে তার ভাঙা টুকরোগুলো! এই তো ব্যাপার, জয়ন্ত! এ কীরকম মামলা ভায়া?

—কেবল অদ্ভুত নয়, সৃষ্টিছাড়া বলাও চলে। কিন্তু লোকটা যদি পাগল হয়, তাহলে তার পাগলামির ভিতর বেশ একটি পদ্ধতি আছে দেখছি।

—পদ্ধতি?

—হ্যাঁ! চারুবাবুর বাড়ি থেকে মূর্তিটা সে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল পাছে মূর্তি ভাঙার শব্দে বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙে যায় এই ভয়ে! ডাক্তারখানায় অন্য লোকের ভয় নেই, তাই মূর্তিটা ভাঙা হয়েছে ঘরের ভিতরেই। ঘটনাগুলো আপাতত অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু জানেন তো সুন্দরবাবু গোয়েন্দার কাছে অকিঞ্চিৎকর নয় কিছুই। আমি একবার ঘটনাস্থলে একগাছা ভাঙা লাঠি পেয়ে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করেছিলুম। যাক সে কথা। এই পাগল আবার যদি কোনও কাণ্ড করে আমাকে জানাবেন। এখন আপনি খান চুরুট, আমরা খেলি দাবা-বোড়ে।

॥ দুই ॥

হারাধনবাবুর দগ্ধাদৃষ্ট

নতুন ঘটনা ঘটতে দেরি লাগল না।

পরদিন প্রভাত। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শুনে রিসিভারটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত শুনলে সুন্দরবাবু বলেছেন: শিগগির এসো। পনেরো নম্বর পঞ্চানন পাল স্ট্রিটে।

রিসিভারটা যথাস্থানে স্থাপন করে মানিকের দিকে ফিরে জয়ন্ত বললে, চটপট চুমুক দিয়ে চা শেষ করো। সুন্দরবাবুর আমন্ত্রণ এসেছে।

—ব্যাপারটি কী?

—ঠিক বোঝা গেল না। খুব সম্ভব সেই মূর্তি ধ্বংসকারী উন্মত্তের নতুন কীর্তি।

পঞ্চানন পাল স্ট্রিটের পনেরো নম্বর হচ্ছে একখানা সাধারণ বাড়ি, দরজার সামনে রাস্তার উপরে কৌতূহলী জনতা।

জয়ন্ত বললে, এত ভিড় কেন? নিশ্চয় যা তা ব্যাপার নয়। ওই যে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দরবাবুর। কী মশাই খবর কী?

সুন্দরবাবু গম্ভীর মুখে বললেন বাড়ির ভিতরে এসো।

বৈঠকখানায় বসে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর ভাবভঙ্গি অত্যন্ত উত্তেজিত।

সুন্দরবাবু বললেন, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত রিপোর্টার হারাধনবাবু। তোমাদের পরিচয় আর দিতে হবে না, ইনি তোমাদের চেনেন।

—জরুরি তলব করেছেন কেন?

—হুম, আবার সেই নেতাজির মূর্তির মামলা।

—আবার নতুন কোনও মূর্তিভঙ্গ হয়েছে?

—আবার মূর্তিভঙ্গের উপর হত্যাকাণ্ড! হারাধনবাবু ব্যাপারটা খুলে বলুন তো।

বিরসবদনে হারাধনবাবু বললেন, এ যেন প্রকৃতির নির্দয় পরিহাস। পরের খবর সংগ্রহ করতে করতে সারাজীবন কাটিয়ে দিলুম, আর আমার নিজের বাড়ির এত বড়ো খবরটা নিয়ে কাগজে পাঠাতে পারছি না, আমার মাথা এমন ভয়ানক গুলিয়ে গিয়েছে। বাইরের রিপোর্টারের মতন আমি যদি এখানে আসতুম, প্রত্যেক কাগজের জন্য অন্তত দু-কলম করে খবর পাঠাতে পারতুম। তা তো হলই না, উলটে এর ওর তার কাছে বারবার বলে খবর ক্রমেই বাসি করে ফেলছি। তবে আপনার কথা আলাদা জয়ন্তবাবু। আপনি যদি সব শুনে এই অদ্ভুত রহস্যের কোনও হদিস দিতে পারেন তবে আমার মস্ত লাভ হতে পারে।

জয়ন্ত চুপ করে শুনলে, কিছু বললে না।

হারাধনবাবু বললেন, মাস চারেক আগে শ্যামবাজারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে আমি নেতাজির একটি প্রতিমূর্তি কিনেছিলাম। মনে হচ্ছে সেই মূর্তির জন্যেই এই অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা। বাড়ির সব উপরকার ঘরে বসে অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে হয়, কালও করছিলুম।

গভীর রাতে বাড়ির একতলায় একটা যেন শব্দ হল। খানিকক্ষণ কান পেতে রইলুম, কিন্তু আর কিছু শুনতে না পেয়ে ভাবলুম, শব্দটা এসেছে বাড়ির বাহিরে থেকেই। মিনিট-পাঁচেক কাটল। তারপর বিষম এক আর্তনাদ। জয়ন্তবাবু অমন ভয়াবহ আর্তনাদ আমি জীবনে আর কখনও শুনিনি। তার স্মৃতি জীবনে আর কোনওদিন ভুলতে পারব না, ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে দু-এক মিনিট চুপ করে বসে রইলুম তারপর একগাছা লাঠি নিয়ে নীচে নেমে

এলুম। বৈঠকখানায়—অর্থাৎ এই ঘরে ঢুকে দেখি, টেবিলের উপর থেকে, অদৃশ্য হয়েছে নেতাজির প্রতিমূর্তিটা! সব ফেলে এই কম দামি জিনিসটা নিয়ে গিয়ে চোরের কী লাভ হবে, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

এমন সময় নজর পড়ল, বৈঠকখানা থেকে রাস্তার দিকে যাবার দরজাটা রয়েছে খোলা। এই পথ দিয়েই চোর পালিয়েছে বুঝে আমিও অগ্রসর হলুম। বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, হঠাৎ একটা দেহের উপর ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলুম কোনও গতিকে। দেহটার অস্বাভাবিক স্পর্শ পেয়েই বুঝলুম, সে হচ্ছে মৃতদেহ!

দৌড়ে বাড়িতে এসে একটা লণ্ঠন নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখি যেন রক্ত-নদীর ভিতর ভাসছে একটা মানুষের মৃতদেহ, গলার উপরে তার প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। চিত হয়ে সে পড়ে আছে, হাঁটুদুটো গুটানো, মুখটা বিশ্রী ভাবে হাঁ করা! মশাই, এবার থেকে রোজ সে বোধ হয় স্বপ্নে আমাকে দেখা দেবে। পুলিশ, পুলিশ! বলে বারকয়েক চিৎকার করে আমি তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলুম। তারপর কী হয়েছিল জানি না, কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান আসায় দেখলুম আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে এক পাহারাওয়ালা।

সব শুনে জয়ন্ত বললে, কিন্তু মৃতদেহটা কার?

সুন্দরবাবু বললেন, হুম, সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। লাশটা শবাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে গেলেই দেখতে পাবে। এখন পর্যন্ত আমরা কিছুই ঠিক করতে পারিনি। লোকটা বেশ ঢ্যাঙা-ঢোঙা, গায়ের রং রোদে-পোড়া, দেখতে রীতিমতো জোয়ান, বয়স ত্রিশের বেশি নয়। পরনে তার গরিবের কাপড়, কিন্তু তাকে শ্রমিক বলে মনে হয় না। তার পাশে রক্তের ভিতরে পড়েছিল একখানা চাকু ছুরি—সেখানা তার নিজের না হত্যাকারীর তা জানবার উপায় নেই। তার জামার পকেটের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে সস্তায় তোলা একখানা ফোটোগ্রাফ। এই দ্যাখো।

কর্কটের মতন একটা মূর্তির ছবি, চেহারা দেখলে কার্তিক বলে ভ্রম হয় না। মুখ যেন বেবুনের মতো। পুরু পুরু ভুরু।

ফটোখানা ভালো করে পরীক্ষা করে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে নেতাজি মূর্তির খবর কী?

—তোমার আসবার একটু আগে সে খবর পেয়েছি। এখান থেকে খানিক তফাতে মনোমোহন রোডে একখানা খালি বাড়ির সামনেকার বাগানে খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায় মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। আমি সেখানে যাচ্ছি, তুমিও আসবে নাকি?

—নিশ্চয়! হারাধনবাবু কি তাঁর সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ দেখতে চান? হারাধনবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, সময় নেই মশাই, সময় নেই। এই হত্যাকাণ্ডের খবর এতক্ষণে নিশ্চয় অন্য অন্য রিপোর্টারদের হাতে গিয়ে পড়েছে, অথচ আমার বাড়িতে খুন, আর আমি কিছু লিখতে পারলুম না। হায়রে, এমনি আমার দগ্ধাদৃষ্ট।

॥ তিন ॥

হিরালাল

যে-মহামানুষকে নিয়ে ভারতে এবং ভারতের বাইরে বিস্ময়কর আন্দোলনের সাড়া পড়ে গিয়েছিল, যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে সত্যিকার ভাই বলে মেনে নিয়েছিল এবং যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে বাধা দিতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধিকে পর্যন্ত প্রকাশ্যে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল তাঁরই খণ্ড-বিখণ্ড প্রতিমূর্তির স্বাভাবিক পরিণাম দেখে জয়ন্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর সে ভগ্নমূর্তির এক-একটা টুকরো একে একে কুড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে লাগল।

তার মুখ দেখেই মানিক বুঝতে পারল যে এতক্ষণ পরে জয়ন্ত একটা না একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছে।

জয়ন্ত বললে, স্পষ্ট গন্ধ পেতে এখনও দেরি আছে কিন্তু তবু—তবু—তবু—হ্যাঁ, একটু আলোর আভাস পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে যেন। অদ্ভুত অপরাধীটি এই মামলার সঙ্গে জড়িত, তার কাছে এই যৎসামান্য পুতুলের মূল্য যে-কোনও মানুষের প্রাণের চেয়েও বেশি! অথচ পুতুলটা হস্তগত করেই সে ভেঙে ফেলে!

—পাগলের পাগলামি আর কাকে বলে?

—না, তা নয় সুন্দরবাবু। একটা মস্ত কথা ভেবে দেখুন। মূর্তিটা সে হারাধনবাবুর বাড়ির ভিতরেও ভাঙেনি, বাইরেও ভাঙেনি, ভেঙেছে এত দূরে এসে—অথচ তার উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিটা হাতে পেলে ভেঙে ফেলা।

—যে লোকটা খুন হয়েছে, সে হঠাৎ এসে পড়াতেই হয়তো মূর্তিটাকে ঘটনাস্থলে ভেঙে ফেলা সম্ভবপর হয়নি।

—হতে পারে। কিন্তু বাগানের ভিতরে এই বাড়ির অবস্থানের দিকে আপনি ভালো করে লক্ষ করেছেন কি?

সুন্দরবাবু চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আরে লক্ষ করে আবার করব কী? এটা হল খালি বাড়ি, আসামি তাই বুঝেছিল যে, কেউ তার কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারবে না।

—আপনি হয়তো দেখেননি, কিন্তু আমি দেখেছি যে হারাধনবাবুর বাড়ি থেকে এখানে আসবার আগেই পাওয়া যায় আর একখানা খালি বাড়ি! আসামি সেখানেই মূর্তিটা ভাঙেনি কেন? সে কেবল মূর্তি চুরি করেনি, একটা নরহত্যাও করেছে, যত দূর মূর্তিটা বহন করে নিয়ে আসবে তার পক্ষে ততই বেশি বিপদের সম্ভাবনা। তবু কেন সে গ্রহণ করেনি মূর্তি ভাঙবার প্রথম সুযোগ?

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই।

মাথার উপরকার আলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জয়ন্ত বললে, আগেকার খালি বাড়িতে আলো ছিল না, কিন্তু এখানে আলো আছে। আসামি অন্ধের মতো মূর্তি ভাঙতে রাজি নয়, মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলো ভালো করে স্বচক্ষে দেখতে চায়।

—এথেকে কী বুঝব?

—আপাতত কিছুই বোঝবার দরকার নেই। পরে হয়তো এটা একটা বড়ো সূত্র বলে গণ্য হবে। যাক। এখন আপনি কী করতে চান সুন্দরবাবু?

—আমি। আমি আগে দেখব মৃতদেহটা কেউ শনাক্ত করতে পারে কি না। সে কে আর তার বন্ধুবান্ধবই বা কারা, এটা জানতে পারলে মামলাটার কিনারা করা কিছুই কঠিন হবে না। তাই নয় কি?

—খুব সম্ভব তাই। আমি কিন্তু অন্যভাবে মামলাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাই।

—কী রকম?

—আপাতত আমার মত আপনার ঘাড়ে চাপাতে আমি রাজি নই। আমরা স্বাধীন ভাবে কাজ করি আসুন। খানিকটা অগ্রসর হবার পর আবার দুজনে মিলে পরামর্শ করা যাবে, কী বলেন?

—বহুৎ আচ্ছা।

মৃতের পকেট থেকে যে-ফটোখানা পাওয়া গেছে সেখানা আমায় দিতে পারেন?

—এই নাও, কিন্তু ছবিখানা কালকেই ফিরিয়ে দিয়ো।

—উত্তম! এখন বিদায় হলুম!

খানিক দূরে এসে জয়ন্ত ডাকলে, মানিক!

—উঃ।

—হারাধনবাবু নেতাজির মূর্তিটি কিনেছিলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে। চলো, সেখানে যাই।

শ্যামবাজারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে গিয়ে শোনা গেল, দোকানের মালিক অনুপস্থিত। বৈকালের আগে ফিরবেন না।

জয়ন্ত বললে, আপাতত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আমাদের ঠাঁই হল না। অতঃপর হাঁড়ির অন্য ভাত টিপে দেখতে হবে। চলো মানিক চিৎপুর রোডের শিল্পশালায়।

শিল্পশালার মালিক অনিলবাবু জয়ন্তের প্রশ্ন শুনে বললেন, হ্যাঁ মশাই। ওই কাউন্টারের উপরেই ছিল নেতাজির মূর্তিটা। যদি কোনও বদমাইশ যখন খুশি যেখানে-সেখানে ঢুকে যা ইচ্ছে তাই করে লম্বা দিতে পারে, তাহলে মিথ্যে আমরা টেক্সো দিয়ে মরি কেন?

—ডাক্তার চারু চক্রবর্তীও তো আপনার কাছ থেকে নেতাজির আর-দুটো মূর্তি কিনেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সেখানেও তো শুনছি এই কাণ্ড হয়েছে। এ সব আর কিছু নয়, কমিউনিস্টদের কীর্তি।

—আপনার এখানে নেতাজির আর-কোনও মূর্তি আছে?

—না মশাই আর নাই।

—ওই মূর্তি তিনটি আপনি কোথা থেকে কিনেছিলেন?

—বড়োবাজারে আগরওয়ালা অ্যান্ড সন্স থেকে। ওঁদের অনেক দিনের মস্তবড়ো কারবার।

—এই ফটোখানা কার বলতে পারেন?

—উঁহু। না, না, চিনেছি? হিরালাল!

—হিরালাল কে?

—পাথরের কারিগর। অল্পস্বল্প মূর্তি গড়তে আর ছবির ফ্রেম গিলটি করতে পারে। গেল হপ্তাতেও সে এখানে কাজ করে গেছে। তার ঠিকানা আমি জানি না। সে চলে যাবার ঠিক দু-দিন পরেই আমার দোকানের নেতাজির মূর্তিটা ভেঙে দিয়ে পালিয়ে যায়।

শিল্পশালার বাইরে এসে মানিক বললে, তুমি কোন তালে আছ কিছুই বুঝছি না জয়ন্ত। এইবারে কোন দিকে যাত্রা?

—বড়োবাজারে। আগরওয়ালা অ্যান্ড সন্স কারখানায়।

বড়োবাজারে—অন্ধকার ও দুর্গন্ধের মুল্লুক। সংকীর্ণ অলিগলির অশ্রান্ত জনস্রোত ভেদ করে জয়ন্ত ও মানিক যথাস্থানে এসে হাজির হল। ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে একটা দ্বারপথ দিয়ে তারা দেখতে পেলে, উঠানে বসে কারিগরদের কেউ পাথর কাটছে, কেউ ছাঁচ থেকে মূর্তি গড়ছে।

ম্যানেজার মাড়োয়ারি। জয়ন্তের জিজ্ঞাসার জবাবে পুরাতন খাতা খুলে দেখে বললেন, আমরা নেতাজির অনেক মূর্তি গড়েছি। বছরখানেক আগে একই ছাঁচ থেকে নেতাজির যে মূর্তি গড়া হয় তার মধ্যে তিনটে গিয়েছে 'শিল্পশালা'য় আর বাকি তিনটি পাঠানো হয়েছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'। পরে ওই ছাঁচ থেকে আরও অনেক মূর্তি গড়া হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলি পাঠানো হয়েছে কলকাতার বাইরে।

—মূর্তিগুলি কেমন করে তৈরি করা হয়।

—মুখের দুই ধার থেকে নেওয়া দুটো ছাঁচ। তারপর ছাঁচ দুটো একসঙ্গে যুক্ত করে মূর্তি গড়া হয়। ভিতরটা থাকে ফাঁপা। ভিজে প্লাস্টার শুকিয়ে গেলে গুদামজাত করা হয় মূর্তিগুলো।

জয়ন্ত ফটোখানা বার করে বললে, একে চেনেন কি?

ম্যানেজারের মুখে-চোখে ফুটে উঠল ক্রোধের চিহ্ন। উত্তপ্ত ভাবে তিনি বললেন, সেই বদমাইশ হিরালাল। ওকে আবার চিনি না, খুব চিনি! ওরই জন্যে আমাদের কারখানায় হাঙ্গামা হয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। হিরালাল জয়পুরের লোক। সে আর এক জয়পুরিয়াকে ছোরা মেরে এসে ভালোমানুষের মতো কারখানায় বসে কাজ করছিল, তারপর পুলিশ আমাদের কারখানায় ঢুকে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, আর আমাদেরও ছুটোছুটি করে মরতে হয় থানায় আর আদালতে। ওরকম বাঁদরমুখো মানুষকে কাজ দিয়ে আমরাই অন্যায় করেছিলুম। কিন্তু মশাই, সে খুব পাকা কারিগর।

—বিচারে তার শাস্তি হয়?

হ্যাঁ। যাকে ছোরা মেরেছিল সে মরেনি বলে হিরালাল সে যাত্রা বেঁচে যায়। মাত্র এক বছর জেল খেটে এখন সে বোধ হয় মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু সে আর এমুখো হবার ভরসা করবে না। তার এক সম্পর্কীয় ভাই এখানে কাজ করে, তারও সঙ্গে কথা কইবেন নাকি?

জয়ন্ত ব্যস্তভাবে বলে উঠল, না না, তাকে ডাকবার দরকার নেই। অনুগ্রহ করে তাকে আমাদের কোনও কথাই জানাবেন না।

—ব্যাপারটা কি গোপনীয়?

—হ্যাঁ, অত্যন্ত। তারপর আর একটি জিজ্ঞাস্য আছে। পাকা খাতা দেখে আপনি তো বললেন যে নেতাজির ওই ছয়টি মূর্তি গেল বছরের ৩রা জুন তারিখে এখান থেকে বাইরে গিয়েছে। আচ্ছা, হিরালাল গ্রেপ্তার হয় কোন তারিখে বলতে পারেন?

—ঠিক তারিখ মনে নেই। তবে সে কোন তারিখে শেষ মাইনে নিয়েছে খাতা দেখে তা বলতে পারি।

—বেশ, তাহলেই আমার চলবে।

খাতার পাতা উলটে ম্যানেজার বললেন, হিরালাল শেষ মাইনে নিয়েছে গেল বছরের ১০ই মে তারিখে। সে প্রায় ওই সময়েই গ্রেপ্তার হয়।

—ধন্যবাদ। আর আপনাকে জ্বালাতন করব না। এসো মানিক।

বৈকালবেলায় জয়ন্ত ও মানিকের আবির্ভাব হল শ্যামবাজারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। মস্ত-বড়ো দোকান—অনেকগুলো বিভাগ। তারা একেবারে ম্যানেজারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে।

তাদের পরিচয় পেয়ে ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ মশাই, হারাধনবাবুর বাড়ির খবর আমরা পেয়েছি। তিনি আমাদের পুরানো খরিদ্দার। নেতাজির মূর্তিটি আমাদের এখান থেকেই কিনেছিলেন বটে।

জয়ন্ত শুধোলে, আপনাদের এখানে আরও দুটি নেতাজির মূর্তি আছে?

—না মশাই নেই। বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যাঁরা কিনেছেন তাঁরাও আমাদের চেনা খরিদ্দার। খাতায় তাঁদের নাম আর ঠিকানা আছে।

—তাই আমি চাই।

—খাতা দেখে ম্যানেজার বললেন, একজনের নাম প্রফেসার সুরেশচন্দ্র বসু, ঠিকানা-

চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেন, কলকাতা। আর-একজন শ্যামাপ্রসাদ সেন। ঠিকানা—সাত নম্বর চন্দ্রকান্ত রোড, শ্রীরামপুর।

—আপনাদের কর্মচারীরা ইচ্ছা করলেই এ খাতার উপরে চোখ বুলোতে পারে তো?

—তা পারবে না কেন! এ খাতা তো গোপনীয় নয়।

—ফটোর এই লোকটাকে কখনও দেখেছেন?

—জীবনে নয়! অমন বাঁদুরে চেহারা একবার দেখলে ভোলা অসম্ভব!

—হ্যাঁ, আর একটা প্রশ্ন। আপনার এখানে জয়পুরের কোনও লোক কাজ করে?

—করে বইকি! একজন নয়, তিনজন।

—আচ্ছা মশাই, নমস্কার।

॥ চার ॥

খুশি মুখ আরও খুশি

সান্ধ্য চায়ের বৈঠক।

মানিক বললে, তোমার মুখ যে আজ ভারী খুশি খুশি দেখাচ্ছে জয়ন্ত।

—বুঝতে পেরেছ?

—তোমাকে দেখে আমি বুঝতে পারব না? তোমার মুখ যে আমার কাছে দশবার-পড়া কেতাবের মতো পুরানো।

—উপমায় তুমি দেখছি কালিদাস।

—খুশি হবার কারণটা কী বলো দেখি?

—সবুর করো, সবুরে মেওয়া ফলে। আমি এখন সুন্দরবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছি। না না আর অপেক্ষা করতে হবে না। সিঁড়ির উপরে যে ওই তাঁর পায়ের শব্দ।

মানিক চেঁচিয়ে বললে, ইংরেজিতে প্রবাদ আছে যে স্মরণ করলেই শয়তান দেখা যায়। তুমি সুন্দরবাবুকে স্মরণ করেছ, সুতরাং—

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে সুন্দরবাবু বললেন, তোমার কথা আমি শুনতে পেয়েছি মানিক। আমাকে কার সঙ্গে তুলনা করছ?

—তুলনা নয়, আমি একটা প্রবাদের কথা বলছিলুম।

—চুলোয় যাক তোমার প্রবাদ। ওসব ছেঁড়া কথায় কান দেবার সময় আমার নেই। হ্যাঁ হে জয়ন্ত, তোমার খবর কী?

—ভালো। নেতাজির মূর্তি নিয়ে আজ যথেষ্ট গবেষণা করা গিয়েছে।

—নেতাজির মূর্তির পিছনে এখনও তুমি লেগে আছ? বেশ, বেশ—যার যা পদ্ধতি, আমি আপত্তি করব না। আমি কিন্তু এবারে তোমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি।

—অ্যাঁ, তাই নাকি?

—যে লোকটা খুন হয়েছে তাকে শনাক্ত করতে পেরেছি।

—বলেন কী!

—খুনের কারণও আবিষ্কার করে ফেলেছি!

—সাধু সাধু!

—অবনীবাবুকে জানো তো? ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের, যত মেড়ুয়াবাদীর নাম-ধাম-চেহারা তাঁর নখদর্পণে। লাশটা দেখেই তিনি চিনে ফেলেছেন। যার লাশ তার নাম হচ্ছে রাধাকিষণ, দেশ জয়পুরে। লোকটা নাকি পয়লা নম্বরের গুন্ডা, একটা মস্ত দলের সর্দার। অথচ সে হচ্ছে ভদ্র বংশের ছেলে। দেশে সুমিত্রা নামে তার এক ভগ্নী আছে, সে-ও একবার একটা চুরির মামলায় জড়িয়ে পড়ে কিন্তু প্রমাণ অভাবে খালাস পায়। তাহলেই ব্যাপারখানা কতটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, বুঝেই দ্যাখো। আমার কী আন্দাজ জানো? যে তাকে খুন করেছে সেও তার দলের লোক। যে-কোনও কারণে রাধাকিষণ তাকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল। ঘটনার রাতে হঠাৎ তাকে হারাধনবাবুর বাড়িতে ঢুকতে দেখে সে তার অপেক্ষায় পথের উপরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সে বেরিয়ে এলে তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে রাধাকিষণ নিজেই পটল তুলতে বাধ্য হয়। কী বলো জয়ন্ত, আমার আন্দাজ কি ভুল?

জয়ন্ত হাততালি দিয়ে বলে উঠল, খাসা সুন্দরবাবু! কিন্তু একফোঁটা চোনা রয়ে গেল নাকি?

—কেন?

—খুনি নেতাজির মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলে কেন?

—আরে রেখে দাও নেতাজির মূর্তি। ও কথা কি কিছুতেই ভুলতে পারবে না। তুচ্ছ পুতুল চুরি, বড়োজোর ছয় মাস জেল। কিন্তু আসলে এটা খুনের মামলা আর সেইটাই হচ্ছে কর্তব্য।

—এরপর আপনার কী কর্তব্য হবে?

—খুব সোজা। অবনীবাবুকে নিয়ে যাব বড়োবাজারের বস্তিতে, খুব সম্ভব ফটোর লোকটাকে তাহলে আজকেই গ্রেপ্তার করতে পারব। তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে?

—উঁহু। আমার বিশ্বাস আরও সহজে আসামির দেখা পেতে পারি। অবশ্য আমি জোর করে কিছুই বলতে চাই না। আপনি যদি আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে আসেন, আর দৈব যদি সহায় হয়, তাহলে হত্যাকারী নিজেই আপনার হাতের মুঠোর ভিতরে এসে পড়বে।

—কোথায় যেতে হবে শুনি? বড়োবাজারে?

—না, চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেনে। আমি অঙ্গীকার করছি সুন্দরবাবু, আমার আন্দাজ ভুল হলে কাল আমি আপনার সঙ্গে বড়োবাজারের বস্তিতে ভ্রমণ করতে যাব। কী বলেন, রাজি?

—হুম।

মানিক সকৌতুকে বলল, হুম? এখানে 'হুম' মানে কী দাদা? হুঁ!

—তাই ধরে নাও।

জয়ন্ত টেবিলের সামনে গিয়ে একখানা কাগজে তাড়াতাড়ি কী লিখে সেখানা খামের ভিতর পুরলে। তারপর খামের উপরে ঠিকানা লিখতে লিখতে চেঁচিয়ে ডাকল, মধু! ওরে অ-মধু! শ্রীমধুসূদন! পুরাতন ভৃত্য মধু এসে হাজির। —আজ্ঞে বাবু।

—যাও তো বাপু, এই চিঠিখানা নিয়ে। তুমি তো পড়তে জানো। খামের উপরে ঠিকানা লেখা আছে, পারো তো দৌড়ে যাও—বড্ড জরুরি চিঠি!

মধুর প্রস্থান। জয়ন্তের গাত্রোত্থান। সে বললে, সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি বাড়িতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে খানিকটা গড়িয়ে নিন। রাত সাড়ে দশটার সময়ে আবার এখানে পদার্পণ করলেই চলবে। আমরা সাড়ে এগারোটার ভিতরে যাত্রা করব।

সুন্দরবাবু প্রস্থান। জয়ন্ত বললে, মানিক, আমাকে এখন পাশের ঘরে গিয়ে পুরানো খবরের কাগজের ফাইল ঘাঁটতে হবে। আজ রাত্রে বোধ হয় অনিদ্রারই ব্যবস্থা। তুমি ইচ্ছা করলে অল্পবিস্তর বিশ্রাম করতে পারো।

রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে পাশের ঘর থেকে জয়ন্ত বেরিয়ে এল ধূলি-ধূসরিত হস্তে।

সোফার উপরে লম্বা হয়ে শুয়েছিল মানিক। বললে, কী বন্ধু তোমার খুশি মুখ যে আরও খুশি হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে!

দুই ভুরু নাচিয়ে জয়ন্ত বললে, আমি যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি।

॥ পাঁচ ॥

হিরালালও কুপোকাত

রাত সাড়ে এগারোটা। সদর দরজায় অপেক্ষা করছিল জয়ন্তর মোটর। সুন্দরবাবুও মানিকের সঙ্গে সে মোটরে গিয়ে উঠল।

—সুন্দরবাবু যে সশস্ত্র সে-বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। মানিক, তুমিও রিভলভার এনেছ তো? জয়ন্ত বললে।

—সে কথা আবার বলতে? মানিকের উত্তর।

গাড়ি ছুটল। এ-রাস্তা ও-রাস্তা মাড়িয়ে গাড়ি যখন একটা চৌমাথায় হাজির হল, কলকাতা শহর তখন যেন ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

জয়ন্ত চালককে ডেকে বললে, গুট্টা সিং, গাড়ি থামাও। এখানেই তুমি আমাদের জন্য অপেক্ষা করো। আমাদের এখন শ্রীচরণই ভরসা। নামো মানিক, নামুন সুন্দরবাবু!...আরে

মশাই আপনার নাসাযন্ত্র যে সংগীত সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। বলি ঘুমোলেন নাকি?

সুন্দরবাবু ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে প্রকাণ্ড একটি হাই তুলে বললেন, ঘুমোইনি হে, ঘুমোইনি। এই বিষম গরমে শীতল সমীরণ সেবন করে কিঞ্চিৎ তন্দ্রাতুর হয়েছিলুম আর কী? আমি এখন সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত। কী বলবে বলো—হুম।

—এইবার গাড়ি থেকে অবতরণ করবার সময় এসেছে।

—এসেছে নাকি? এই আমি নেমে পড়লুম।

—গাড়ি নিয়ে বেশি দূর যাওয়া সঙ্গত নয়। এইবার পদব্রজে মিনিট পাঁচেক অগ্রসর হতে হবে।

হুম—যো হুকুম। আমি প্রাচীন সৈনিক, যা বলো তাতেই রাজি। এই আমি সবেগে পদচালনা করলুম।

পথে আর লোক চলাচল নেই বললেই চলে। গোটা কয়েক কুকুর শহরের মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা করছে এবং রাস্তার এখানে ওখানে দুই-তিন বা ততোধিক ষাঁড় গা এলিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে নির্বিকার ভাবে করছে রোমন্থন।

চার নম্বর রাজেন রক্ষিত লেন। রেলিং ঘেরা জমির ভিতর একখানা মাঝারি আকারের বাড়ি তার গায়ে কোথাও নেই আলোর রেখা। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করছে। রাস্তার ইলেকট্রিক পোস্টের আলোয় সুন্দরবাবু নামটা পাঠ করলেন—প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু।

জয়ন্ত বললে, রাত্রেও এ বাড়ির ফটক বন্ধ হয় না দেখছি। চলুন সুন্দরবাবু, বাগানে ওই হাস্নুহানার ঝোপের আড়ালে গিয়ে আমরা লুকিয়ে থাকি। নয়তো অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের মশকদংশন সহ্য করতে হবে। হয়তো সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেও আমাদের ভাগ্যে লাভ হবে প্রকাণ্ড একটি অশ্বডিম্ব! উপায় কী, যে পূজার যে মন্ত্র।

কিন্তু জয়ন্তের আশঙ্কা সফল হল না। আধ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই কোথা থেকে আচমকা দেখা দিল একটা ছোট্ট কালো মূর্তি, তিরের মতন বাগানের ভিতর ছুটে এসেই সে বাড়ির ছায়ার ভিতরে কোথায় হারিয়ে গেল। ঠিক যেন একটা বানর। কয়েক মূহূর্ত কেটে গেল নীরবে। তারপর একটা শব্দ—কে যেন একটা জানালা খুলছে ধীরে ধীরে। তারপর আবার সব চুপচাপ।

জয়ন্ত বললে, এসো মানিক, আমরা জানলার নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। চোর বাইরে বেরুলেই গ্রেপ্তার করব।

কিন্তু তারা দুই-এক পা এগুবার আগেই বাড়ির ভিতর থেকে আবার হল সেই মূর্তিটার আবির্ভাব। তার হাতের তলায় রয়েছে সাদা মতন কী একটা জিনিস। সে চারদিকটা একবার চটপট দেখে নিলে। এখনকার নীরবতার ও নির্জনতায় বোধ হয় আশ্বস্ত হল। হাতের জিনিসটা মাটির উপরে নামিয়ে রাখলে। তারপর জেগে উঠল ফটাফট শব্দ।

জয়ন্ত সঙ্গীদের নিয়ে বেগে ছুটে এল তার দিকে। লোকটা তখন হেঁট হয়ে এমন একাগ্র মনে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে যে কিছু বুঝতে পারলে না। তার পিঠের উপরে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল জয়ন্ত। এবং সে কোনও বাধা দেবার আগেই মানিকের সাহায্যে সুন্দরবাবু হাতকড়া দিয়ে তার দুই হাত করলেন বন্দী। তাকে চিত করে ফেলতেই দেখা গেল তার হাড়কুৎসিত বেবুনের মুখখানা অবিকল সেই ফটোগ্রাফের প্রতিচ্ছবি।

জয়ন্ত মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—সেখানে ইতস্তত বিকীর্ণ হয়ে আছে নেতাজির আর একটি মূর্তির ভাঙা টুকরো। সে একে একে টুকরোগুলো তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় বাড়ির ভিতরে জ্বলে উঠলো আলো এবং দরজা খুলে বেরিয়ে বাগানের উপর এসে দাঁড়াল আর এক মূর্তি।

জয়ন্ত মুখ তুলে শুধোলে, আপনিই বোধ হয় প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর আপনি নিশ্চয়ই জয়ন্তবাবু? আপনার পত্র আমি যথাসময়েই পেয়েছি আর কাজ করেছি, আপনার উপদেশ মতোই। যাক বদমাইশটা ধরা পড়েছে দেখে খুশি হলুম। আসুন, একটু চা-টা খেয়ে যান।

সুন্দরবাবু বললেন, এই কি চা খাবার সময় মশাই? এই পরমসুন্দর মানুষটিকে লক-আপে পুরতে না পারলে আমি ঘুমোবারও সময় পাব না। দেখি সোনার চাঁদ, তোমার পকেটে কী সম্পত্তি আছে!

বন্দি কোনও কথা কইলে না। কিন্তু সুন্দরবাবু তার দিকে হাত বাড়াতেই সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খাঁক করে তাঁর হাতে কামড়ে দিতে এল।

সুন্দরবাবু চট করে নিজের হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, ওরে বাবা হয়েছিল আর কী? তুই বেটা মানুষের ছদ্মবেশে বুনো জন্তু নাকি? হুম, এর মুণ্ডুটা দুই হাতে আচ্ছা করে চেপে ধরো তো মানিক! সাবধান যেন কামড়ে না দেয়? এর পকেটগুলো হাতড়ে না দেখলে চলবে না।

আসামির পকেট হাতড়ে পাওয়া কেবল তিন টাকা দশ পয়সা আর একখানা ছোরা।

জয়ন্ত ছোরাখানা আলত পরীক্ষা করে বললে, হুঁ এর হাতলে এখনও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে দেখছি। নিশ্চয়ই গুণ্ডা রাধাকিষণের রক্ত।

সুন্দরবাবু বললেন, ওহে রূপবান পুরুষ, কোন নাম ধরে তোমাকে সম্বোধন করব বাপু?

বন্দি নিরুত্তর।

—নাম বললে না? জীতা রহো বেটা! কিন্তু তুমি তো জানো না ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অবনীবাবুর কাছে গেছে তোমার নাম-ধাম আর যাবতীয় গুণাবলী কিছুই আর ধামাচাপা থাকবে না।

জয়ন্ত বললে, রাত বাড়ছে সুন্দরবাবু।

—হ্যাঁ, আমরাও এইবার গা তুলব। কিন্তু ভাই জয়ন্ত, তুমি যে কেমন করে জানতে পারলে এই খুনেটা আজ আসবে, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

—আপাতত বুঝে কাজ নেই, কারণ আমার কাছেও এখনও সব রহস্য পরিষ্কার হয়নি। এ লোকটা নেতাজির মূর্তি ভাঙে কেন?

—আরে থো করো ও কথা! এটা হচ্ছে খুনের মামলা, খুনি গ্রেপ্তার হয়েছে, এখনও তুমি নেতাজির মূর্তি নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করছ কেন?

—না, সুন্দরবাবু, এটা খুনের মামলা নয়, এটা হচ্ছে নেতাজির মূর্তির মামলা। আমার ধারণা খুনোখুনির কারণই হচ্ছে নেতাজির মূর্তি, সে-কারণ আবিষ্কার করতে না পারলে আদালতে আপনার খুনের মামলা ফেঁসে যাবে।

—অত বাক্যব্যয় কেন, কারণটা ব্যক্তই করো না বাপু!

—কারণ অনুমান করেছি বটে, কিন্তু সে অনুমান সত্য বলে প্রমাণ করবার উপায় আমার হাতে নেই। তবে আসছে পরশুদিন বৈকালে আপনি যদি আমার বাড়িতে শুভাগমন করেন, তাহলে মেঘ সরিয়ে আপনাকে সূর্যালোক দেখাবার আশা করলেও করতে পারি।

॥ ছয় ॥

মমতাজ বেগমের কালো মুক্তা

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে সুন্দরবাবু দেখা দিলেন জয়ন্তের বৈঠকখানায়।

জয়ন্ত বললে, খবর শুভ তো?

সুন্দরবাবু গর্বিত ভাবে বললেন, তোমার আগেই আমি সূর্যালোক দেখতে পেরেছি জয়ন্ত।

—আপনি ভাগ্যবান।

—না, ঠাট্টা নয়। অবনীবাবু খোঁজখবর নিয়ে এর মধ্যেই আসামির সব গুপ্তকথা জানতে পেরেছেন। তার নাম হিরালাল, বাড়ি জয়পুরে। আগে তার স্বভাব ভালোই ছিল, সৎপথে থেকে মূর্তি গড়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার করত। তারপর কুসংসর্গে মিশে সে গোল্লায় যায়। দু-বার জেল খাটে—একবার চুরি করে, আর একবার ছোরা মেরে। নেতাজির মূর্তিগুলো কেন যে ভাঙল এখনও তা জানা যায়নি; কারণ হিরালাল ও সম্বন্ধে কোনও কথাই বলতে নারাজ। কিন্তু আমরা সন্ধান নিয়ে এইটুকু জানতে পেরেছি যে, মূর্তিগুলো তার নিজের হাতেই গড়া; সুন্দরবাবু নিজের মনের কথা বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জয়ন্ত বোধ হয় মন দিয়ে তার কথা শুনছিল না, থেকে থেকে সে যেন কান পেতে কী শোনে, মাঝে মাঝে উঠে জানলার ধারে যায় তারপর আবার আসনে এসে বসে পড়ে।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, তোমার আজ কী হয়েছে জয়ন্ত? তুমি এমন অন্যমনস্ক কেন?

—বোধ হয় আমার হিসেবে ভুল হয়েছে। এখন আপনার কাছে কেমন করে মুখ রক্ষা করব জানি না।

—এ আবার কী কথা?

—আজ এখানে আসবার জন্যে গেল কাল একজনকে টেলিগ্রাম করেছিলুম। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উতরে গেল, তিনি এলেন না।

—কে তিনি?

—শ্যামাপ্রসাদ সেন, থাকেন শ্রীরামপুরে।

—তাঁকে কী দরকার?

—খুনি কেন যে নেতাজির মূর্তিগুলো ভাঙত, হয়তো এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে তাঁর কাছেই।

—প্রশ্নের উৎপত্তি কলকাতায়, আর উত্তর আসবে শ্রীরামপুরে থেকে, অবাক!

জয়ন্ত সচমকে বললে, মানিক দরজার একখানা গাড়ি এসে থামল না? একবার দেখে এসো তো।

মানিক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল একটি প্রাচীন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর ডান হাতে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া একটা জিনিস।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, আপনিই কি শ্রীরামপুরের শ্যামাপ্রসাদবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু ঠিক সময়ে আসতে পারিনি বলে মাপ করবেন। আজকাল ট্রেনের ধরন-ধারণ জানেন তো?

—বসুন। নেতাজির মূর্তিটি এনেছেন তো?

—হ্যাঁ, এই যে আমার হাতে।

—উত্তম। তাহলে কাজের কথা হোক।

—জয়ন্তবাবু, আপনি কি সত্য-সত্যই মূর্তিটি তিনশো টাকা দিয়ে কিনতে চান?

—নিশ্চয়ই।

—কেমন করে জানলেন ওই মূর্তিটি আমার কাছে আছে?

—লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ম্যানেজার আমাকে বলেছেন।

—তাহলে একথাও শুনেছেন তো মূর্তিটি আমি কিনেছি কত টাকা দিয়ে?

—না।

—মশাই, আমি মস্ত ধনী নয় বটে, কিন্তু ঠক-জুয়াচোরও নই। আগে থাকতেই আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই, মূর্তিটির দাম দশ টাকা মাত্র।

—শ্যামাপ্রসাদবাবু, আপনার সততা দেখে খুশিও হচ্ছি, বিস্ময়ে হতবাকও হচ্ছি। মূর্তিটির আসল দাম যাই হোক, আমি তিনশো টাকা দিয়েই ওটি আপনার কাছ থেকে কিনতে চাই।

শ্যামাপ্রসাদ কাগজের মোড়ক খুলে মূর্তিটি টেবিলের উপরে রাখলেন।

পকেট থেকে তিনখানা একশো টাকার নোট বার করে জয়ন্ত বললে, শ্যামাপ্রসাদবাবু, টেবিলের উপরে কাগজ কলম আছে। এই দুইজন সাক্ষীর সামনে আপনি অনুগ্রহ করে লিখে দিন যে তিনশো টাকার বিনিময়ে মূর্তিটি আমার কাছে বিক্রয় করলেন, ওর উপরে ভবিষ্যতে আপনার কোনও দাবিদাওয়াই রহিল না।

জয়ন্তর কথামতো কাজ করে তিন শত টাকা নিয়ে প্রস্থান করলেন শ্যামাপ্রসাদবাবু।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, হুম, জয়ন্তর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, জেনে-শুনেও ঠকলে, আরে ছ্যাঃ।

জয়ন্ত মুখ টিপে, একটু হেসে উঠে দাঁড়াল। একখানা নূতন টেবিলক্লথ বিছিয়ে নেতাজির মূর্তিটা তার মাঝখানে স্থাপন করে বললে, সুন্দরবাবু এইবার আমি একটি অপকর্ম করব—মহা অপকর্ম!

—দশ টাকার মাল তিনশো টাকায় কিনেই তো অপকর্ম করেছ। তারও উপরে আবার কী অপকর্ম আছে?

একটা হাতুড়ি নিয়ে জয়ন্ত বললে, আজ আমিও বরেণ্য নেতাজির ওই প্রতিমূর্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করব!

—তুমি যে হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছ, সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। মানিক, তোমার বন্ধুটিকে সামলাও, সে যেন আমার মাথায় হাতুড়ির এক ঘা না দেয়।

জয়ন্ত মূর্তির উপরে হাতুড়ির দ্বারা আঘাত করলে এবং মূর্তিটি সশব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

জয়ন্ত সাগ্রহে টেবিলের উপরে হেঁট হয়ে পড়ল এবং একটা ভাঙা টুকরো তুলে সানন্দে বলে উঠল, দেখুন সুন্দরবাবু! দ্যাখো মানিক! আমার হাতে রয়েছে মমতাজ বেগমের বিখ্যাত কালো মুক্তা!

॥ সাত ॥

এক ঢিলে দুই পাখি......

জয়ন্ত বলতে লাগল—মমতাজ বেগমকে সম্রাট সাজাহান যে মহামূল্যবান কালো মুক্তা উপহার দিয়েছিলেন, তার খ্যাতি পৃথিবীর দেশে দেশে।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় এই মুক্তাটি কোথায় হারিয়ে যায় কেউ তা জানে না। অনেক কাল পরে মুক্তাটি কেমন করে মধ্য ভারতের প্রতাপপুরের মহারাজার হস্তগত হয়। তারপর সেদিন পর্যন্ত বংশানুক্রমে মুক্তার মালিক হতেন প্রতাপপুরের মহারাজারাই।

তারপর বর্তমান মহারানির শয়নগৃহ থেকে আবার মুক্তাটি হয় অদৃশ্য। তাই নিয়ে চারিদিকে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সুন্দরবাবুর সে কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। পুলিশ সে-মামলার কিনারা করতে পারেনি। মহারানির এক পরিচারিকা ছিল, সে জয়পুরের মেয়ে, নাম সুমিত্রা। তারই উপরে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুন্দরবাবু চমকে উঠলেন যে বড়ো? আপনার মুখেই তো শুনেছি, হারাধনবাবুর বাড়ির সামনে নিহত রাধাকিষণের এক ভগ্নী আছে নাম সুমিত্রা আর সে জয়পুরের মেয়ে।

—হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। এই দুই সুমিত্রা একই যে ব্যক্তি তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই!

পুরাতন খবরের কাগজের ফাইল ঘেঁটে আমি আর একটি তথ্য আবিষ্কার করেছি! কাকে ছোরা মেরে হিরালাল যেদিন ধরা পড়ে, প্রতাপপুরের মহারানির শয়নগৃহ থেকে কালো মুক্তাটি অদৃশ্য হয় ঠিক তারই চারদিন আগে। কল্পনায় ঘটনাগুলো পর পর এই ভাবে সাজানো যেতে পারে!

সুমিত্রা মুক্তাটি চুরি করে ভাই রাধাকিষণের কাছে গোপনে পাঠিয়ে দিল। হিরালাল হচ্ছে রাধাকিষণের দুষ্কর্মের সহকারী। সে হয় মুক্তাটি তার বন্ধুর কাছে থেকে চুরি করলে, কিংবা নিজে পুলিশের দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য রাধাকিষণরাই তার কাছে মুক্তাটি জিম্মা রাখল। তারপর হঠাৎ একজন লোককে ছোরা মেরে হিরালাল আগরওয়ালার কারখানায় পালিয়ে এল। তারপর সে যখন বসে বসে প্লাস্টারের মূর্তি গড়ছে সেই সময় সেখানে পুলিশের আবির্ভাব। সে বুঝলে পুলিশ তার কাপড় জামা তল্লাশি করবে। তার সামনে ছিল সবে-গড়া ভিজে প্লাস্টারের মূর্তি। সে তাড়াতাড়ি একটা মূর্তির মাথায় ছাঁদা করে মুক্তাটি ভিতরে নিক্ষেপ করে ছিদ্রটি আবার বন্ধ করে দিলে—দক্ষ কারিগরের পক্ষে এটা খুবই সহজ কাজ। তারপর সে এক বৎসর জেল খাটতে গেল। ইতিমধ্যে নেতাজির ছয়টি মূর্তি কারখানার বাইরে এখানে-ওখানে চলে গেল। তাদের কোনটির মধ্যে যে মুক্তা আছে বাহিরে থেকে দেখে কেউ তা বলতে পারে না। মূর্তি নাড়লেও মুক্তার অস্তিত্ব জানা যাবে না, কারণ কাঁচা প্লাস্টার শুকিয়ে গিয়ে মুক্তাটিকে কামড়ে ধরেছে। মূর্তি ভাঙা ছাড়া মুক্তা আবিষ্কারের আর কোনও উপায় রইল না।

তারপর হিরালালের মেয়াদ ফুরুল। কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে দস্তুরমতো মাথা খাটিয়ে ভিতরে ভিতরে খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারলে, কোন কোন মূর্তি কোন কোন ঠিকানায় গিয়েছে। তারপর আরম্ভ হল নেতাজির মূর্তির উপরে আক্রমণ। চতুর্থ মূর্তি চুরি করতে গিয়ে হারাধনবাবুর বাড়ির সামনে হিরালালের সঙ্গে দেখা হয় রাধাকিষণের। হিরালাল জেল থেকে বেরিয়েছে শুনে রাধাকিষণ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের ফল হল রাধাকিষণের পক্ষে মারাত্মক।

সুন্দরবাবু বললেন, হিরালাল যদি তার দুষ্কর্মের সহকারীই হয় তবে রাধাকিষণ তার ফটো নিয়ে বেড়াত কেন?

—খুব সম্ভব তৃতীয় ব্যক্তির কাছে হিরালালের খোঁজ নেবার সময়ে এই ফটো তার কাজে লাগত। যাক সে কথা। আমি বেশ আন্দাজ করলুম, খুনের পরে হিরালাল আরও তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করবে; কারণ পুলিশ তাকে খুঁজছে, এখন যথাসম্ভব শীঘ্র তার কলকাতা থেকে অদৃশ্য হওয়া উচিত।

হিরালাল যে মূর্তির ভিতরে কালো মুক্তা লুকিয়ে রেখেছে তখনও পর্যন্তও সন্দেহ আমার হয়নি। কিন্তু খালি বাড়ির সামনে ঠিক আলোর নীচে হিরালাল মূর্তিটা ভেঙেছিল বলে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল যে, ফাঁপা মূর্তিগুলোর মধ্যে এমন কোনও মূল্যবান জিনিস আছে, যার লোভে চোর এইসব কাণ্ড করে।

সন্ধান নিয়ে জানলুম, ছয়টার মধ্যে শেষ দুটো মূর্তি আছে যথাক্রমে প্রফেসর সুরেশচন্দ্র বসু আর শ্যামাপ্রসাদ সেনের কাছে। একজন থাকে শহরেই, আর একজন শ্রীরামপুরে। আন্দাজ করলুম শহরের মূর্তিটাকে চুরি না করে কলকাতার বাইরে যাওয়া হিরালালের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমার আন্দাজ ভুল হয়নি, তারপর সুরেশবাবুর বাড়িতে স্বচক্ষে দেখলুম হিরালাল কী যেন খুঁজছে মূর্তির ভাঙা টুকরোগুলোর মধ্যে। কিন্তু তখন পুরনো খবরের কাগজের ফাইল থেকে বিখ্যাত কালো মুক্তোর ইতিহাস আমি উদ্ধার করেছি আর রাধাকিষণের সঙ্গে এই মুক্তোর চুরির যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন সন্দেহও আমার মনে ঠাঁই পেয়েছে। এও জেনেছি যে রাধাকিষণ আর হিরালাল পরস্পরের পরিচিত আর একই দেশের লোক। মনে খটকা লাগল হিরালাল কি ফাঁপা মূর্তির ভিতর খুঁজছে কালো মুক্তাকেই?

কিন্তু এখনও পর্যন্ত হিরালালের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। আমার মন বললে তাহলে মুক্তা আছে ওই শেষ—বা ষষ্ঠ মূর্তির মধ্যেই। সুন্দরবাবু কপাল ঠুকে আপনার সামনেই তিনশো টাকা দিয়ে আমি ওই ষষ্ঠ মূর্তিটাকে কিনে ফেললুম দেখলেন তো?

সুন্দরবাবু তারিফ করে বললেন, ধন্যি ভায়া ধন্যি! একটি মাত্র ইষ্টক খণ্ড দিয়ে আজ একজোড়া পক্ষী বধ করেছ! একসঙ্গে দু-দুটো মামলার কিনারা করে ফেললে হে—ওদিকে মুক্তা চুরির আর এদিকে মূর্তি চুরির মামলা। হুম, হুম।

মানিক বললে, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবন হচ্ছে বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ। তাঁর প্রতিমূর্তিও বড়ো কম অ্যাডভেঞ্চারের সৃষ্টি করলে না—নেতাজির সব কিছুর সঙ্গেই আছে অসাধারণতার সম্পর্ক! 'জয় হিন্দ।'

কাচের কফিন

খুনের না মানুষ চুরির মামলা

—বোলো না, বোলো না, আজ আমাকে চা খেতে বোলো না! ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন সুন্দরবাবু।

মানিক সবিস্ময়ে শুধোলে, এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে।

—না আজ কিছুতেই আমি চা খাব না।

—একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ?

—হুম!

জয়ন্ত বললে, বেশ, চা না খান, খাবার খাবেন তো?

—কী খাবার?

—টিকিয়া খাবার।

—ও তাই নাকি।

—তারপর আছে ভেন্ডালু।

—হংস মাংস?

—হ্যাঁ, বনবাসী হংস।

সুন্দরবাবু ভাবতে লাগলেন।

—খাবেন তো?

সুন্দরবাবু ত্যাগ করলেন একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস। তারপর মাথা নেড়ে করুণ স্বরে বললেন, উহুম! আজ আ- ক হংস-মাংস ধ্বংস করতে বোলো না।

মানিক বললে, হালে আর পানি পাচ্ছি না। হংস-মাংসেও অরুচি! সুন্দরবাবু এইবারে বোধ হয় পরমহংস হয়ে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করবেন।

—মোটেই নয়, মোটেই নয়।

—তবে গেরস্তের ছেলে হয়েও এ-খাব না ও-খাব না বলছেন কেন?

—আজ আমার উদর দেশের বড়োই দুরবস্থা।

—অমন হৃষ্টপুষ্ট উদর, তবুও—

—আমার উদরাময় হয়েছে।

—তাই বলুন। তবে ওষুধ খান। আমি হোমিওপ্যাথি জানি! এক ডোজ মার্কসল ওযুধ দেব নাকি?

—থো করো তোমার হোমাপাথির কথা। আমি খাবার কি ওষুধ খেতে আসিনি। আমি এসেছি জরুরি কাজে।

—অসুস্থ দেহ, তবু কাজ থেকে ছুটি নেননি? কী টনটনে কর্তব্যজ্ঞান।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। স্বর্গবাসী ঢেঁকি ধান ভাঙে। পুলিশের আবার ছুটি কী হে?

জয়ন্ত শুধোলে, নতুন মামলা বুঝি?

—তা ছাড়া আর কী?

—কীসের মামলা?

—বলা শক্ত। খুনের মামলা কি মানুষ চুরির মামলা, ঠিক ধরতে পারছি না।

একটু একটু করে জাগ্রত হচ্ছিল জয়ন্তের আগ্রহ। সে সামনের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, সুন্দরবাবু ওই চেয়ারে বসুন। ব্যাপারটা খুলে বলুন।

আসন গ্রহণ করে সুন্দরবাবু বললেন, এটাকে আজব মামলা বলাও চলে। রহস্যময় হলেও অনেকটা অর্থহীন। নাটকের পাত্র-পাত্রী হচ্ছেন তিনজন। একজন নারী আর দুজন পুরুষ। ওঁদের মধ্যে একজন পুরুষ হচ্ছেন আসামি। কিন্তু তিনজনেই অদৃশ্য হয়েছে।

—অদৃশ্য হবার কারণ?

—শোনো! বছর দেড়েক আগে সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরি নামে এক ভদ্রলোক থানায় এসে অভিযোগ করেন, তাঁর পিতামহী সুশীলাসুন্দর দেবীর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। সুশীলা দেবী বিধবা। তিনি তাঁর স্বামীর বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী। তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার দরুন ডাক্তার মনোহর মিত্রের চিকিৎসাধীন ছিলেন। সুশীলা দেবী হঠাৎ একদিন একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনে মনোহর মিত্রের সঙ্গে বাড়ির বাইরে চলে যান, তারপর ফিরে আসেননি। খোঁজাখুঁজির পর প্রকাশ পায়, অদৃশ্য হবার দু-দিন আগে সুশীলা দেবী ব্যাংক থেকে নগদ পনেরো লক্ষ টাকা তুলে আনিয়েছিলেন। সে টাকাও উধাও হয়েছে।

—ডাক্তার মনোহর মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের খ্যাতি আমি শুনেছি। পদার্থশাস্ত্রে তাঁর নাকি অসাধারণ পাণ্ডিত্য।

—তিনিই ইনি। মনোহরবাবুকে তুমি কখনও চোখে দেখেছ?

—না।

—আমিও দেখিনি, তবে তাঁর চেহারার হুবহু বর্ণনা পেয়েছি।

—কী রকম?

—মনোহরবাবুর দীর্ঘতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির বেশি হবে না, কিন্তু তাঁর দেহ রীতিমতো চওড়া। তাঁর মাথায় আছে প্রায় কাঁধ-পর্যন্ত ঝুলে পড়া সাদা ধবধবে চুল, মুখেও লম্বা পাকা দাড়ি। তাঁর বয়সও ষাটের কম নয়। কিন্তু শরীর এখনও যুবকের মতো সবল। রোজ সকালে সূর্য ওঠবার আগে পদব্রজে অন্তত চার মাইল ভ্রমণ করে আসেন। তাঁর চোখ সর্বদাই ঢাকা থাকে কালো চশমায়। টিকলো নাক। শ্যামবর্ণ। সাদা পাঞ্জাবি, থান কাপড় আর সাদা ক্যাম্বিসের জুতো ছাড়া অন্য কিছু পরেন না। বর্মা চুরোটের অত্যন্ত ভক্ত। তাঁর মুখ সর্বক্ষণই গম্ভীর। ডান কপালের উপরে একটা এক ইঞ্চি লম্বা পুরানো কাটা দাগ আছে। হাতে থাকে একগাছা রুপাবাঁধানো মোটা মলাক্কা বেতের লাঠি।

জয়ন্ত বললে, আরে মশাই, এ বর্ণনার কাছে যে আলোকচিত্রও হার মানে। এর পর

বিপুল জনতার ভিতর থেকেও মনোহরবাবুকে আবিষ্কার করতে পারব।

সুন্দরবাবু দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, আমি কিন্তু দেড় বৎসর চেষ্টা করেও তাঁর টিকিও আবিষ্কার করতে পারলুম না।

—কেন?

—তিনিও অদৃশ্য হয়েছেন!

—তাঁর বাড়ি কোথায়?

—বালিগঞ্জে নিজের বাড়ি। সেখানে গিয়েছিলুম। কিন্তু বাড়ি একেবারে খালি।

—মনোহরবাবুর পরিবারবর্গ?

—মাথা নেই, তার মাথাব্যথা। তিনি বিবাহই করেননি।

—অন্য কোনও আত্মীয়-স্বজন?

—কারুর পাত্তা পাইনি। পাড়ার লোকের মুখে শুনলাম মনোহরবাবু জনচারেক পুরাতন আর বিশ্বস্ত ভৃত্য নিয়ে ওই বাড়িতে বাস করতেন বটে, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকলকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছেন।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে আপনি বললেন, সুশীলা দেবী ট্যাক্সিতে চড়ে মনোহরবাবুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কি নিজের মোটর নেই?

—আছে বই কি! একখানা নয়, তিনখানা।

—তাহলে মেনে নিতে হয়, সুশীলা দেবীর নিজেরও ইচ্ছা ছিল, তিনি কোথায় যাচ্ছেন কেউ জানতে না পারে।

—হয় তোমার অনুমান সত্য, নয় তিনি ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন মনোহরবাবুর পরামর্শেই!

—আপনি ট্যাক্সিখানার সন্ধান নিয়েছেন?

—নিয়েছি বই কি! ট্যাক্সি চালককে খুঁজে বের করেছি। সে আরোহীদের হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। আর কিছুই সে জানে না।

—তা হলে মনোহরবাবুর সঙ্গে সুশীলা দেবী বোধ হয় কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছেন। কিন্তু কলকাতার বাইরে—কোথায়?

—হুম, আমিও মনে মনে এই প্রশ্ন বার বার করেছি। কোথায়, কোথায়, কোথায়? কিন্তু প্রতিধ্বনি বার বার উত্তর দিয়েছে—কোথায়, কোথায়, কোথায়?

—খালি ওই প্রশ্ন নয় সুন্দরবাবু, আরও সব প্রশ্ন আছে। পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পনেরো লক্ষ টাকা নিয়ে সুশীলা দেবী রুগ্ন দেহে এমন লুকিয়ে মনোহরবাবুর সঙ্গে চলে গেলেন কেন? তিনি বেঁচে আছেন কি নেই? মনোহরবাবু বিখ্যাত পদার্থবিদ হলেও মানুষ হিসাবে কি সাধু ব্যক্তি নন?

সুন্দরবাবু বললেন, আমার কথা এখনও ফুরোয়নি। সবটা শুনলে প্রশ্ন সাগরে তোমাকে তলিয়ে যেতে হবে।

—আমার আগ্রহ যে জ্বলন্ত হয়ে উঠল। বলুন, সুন্দরবাবু বলুন।

॥ দুই ॥
মানুষ না দেখে প্রতিকৃতি আঁকা

সুন্দরবাবু বললেন, যে-মাসে সুশীলা দেবী অন্তর্হিতা হন, সেই মাসেই আর একটা মানুষ নিরুদ্দেশ হওয়ার মামলা আমার হাতে আসে। দুটো মামলাই কতকটা একরকম। গোবিন্দলাল রায় একজন বড়ো জমিদার। বয়স সত্তরের কম নয়। তিনি বিপত্নীক হলেও সংসার তাঁর বৃহৎ। পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, পৌত্র-পৌত্রীও আছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন গোপনে ব্যাংক থেকে নগদ বারো লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে তিনিও গিয়েছেন অজ্ঞাতবাসে। তবে গোবিন্দবাবু যাবার সময়ে একখানা চিঠি রেখে গিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল—আমি বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছি। ফিরতে বিলম্ব হবে। তোমরা আমরা জন্য চিন্তিত হয়ো না।' তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজখবর নেই। তিন মাসের মধ্যেও বৃদ্ধ পিতার কাছ থেকে একখানা পত্র পর্যন্ত না পেয়ে তাঁর পুত্ররা আমার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমি গোবিন্দবাবুর নাগাল ধরতে পারিনি।

জয়ন্ত শুধোলে, আপনি কি মনে করেন, আগেকার মামলার সঙ্গে এ মামলাটারও কোনও সম্পর্ক আছে!

—অল্পবিস্তর মিল কি নেই জয়ন্ত? একজন অতি বৃদ্ধা নারী আর একজন অতি বৃদ্ধ পুরুষ, দুজনেই গোপনে অজ্ঞাতবাসে গমন করেছেন, আর দুজনেই যাবার ঠিক আগেই ব্যাংক থেকে বহু লক্ষ টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছেন, দুজনেই আত্মগোপন করবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদের কোনও প্রমাণই দেননি।

—কিন্তু গোবিন্দবাবুর সঙ্গে কি মনোহরবাবুর পরিচয় ছিল?

—গোবিন্দবাবুর বাড়ির কোনও লোকই মনোহরবাবুর নাম পর্যন্ত শোনেনি।

—তাহলে আপনি কী বলতে চান?

—মাসখানেক আগে গোবিন্দবাবুর বড়ো ছেলে আমার হাতে একখানা পত্র দিয়ে বলে গিয়েছেন—একখানা বইয়ের ভিতর থেকে এই চিঠিখানা পেয়েছি। চিঠিখানা পড়বার পর বাবা নিশ্চয়ই ওই বইয়ের ভিতর গুঁজে রেখেছিলেন।— জয়ন্ত এই নাও, চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো।

জয়ন্ত খামের ভিতর থেকে পত্র বার করে নিয়ে পাঠ করলে—

প্রিয় গোবিন্দবাবু,

এতদিন পরে আমার প্রস্তাবে আপনি সম্মত হয়েছেন শুনে অত্যন্ত আনন্দলাভ করলুম। বেশ, আগস্ট মাসের চার তারিখে পাঁচটার সময়ে আমার লোক হাওড়া স্টেশনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমে আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনাকে সঙ্গে করে আনতে হবে অন্তত নগদ বারো লক্ষ টাকা। যতদিন না আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন

আমরা এইখানে বাস করব। আমার উপরে বিশ্বাস রাখুন। আপনার কোনও আশঙ্কা নেই। পত্রের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।

ইতি—

ভবদীয়

শ্রীমনোহর মিত্র

সুন্দরবাবু বললেন, পড়লে?

জয়ন্ত উত্তর দিলে, হুম, চিঠির কাগজে কোনও ঠিকানা নেই? কিন্তু খামের উপরে ডাকঘরের নাম রয়েছে, সুলতানপুর।

—সুলতানপুর হচ্ছে একটি ছোটোখাটো শহর! সেখানে আমি গিয়েছিলুম। কিন্তু ডাক্তার মনোহর মিত্রের নাম পর্যন্ত কেউ সেখানে শোনেনি।

—সুলতানপুর ডাকঘর থেকে কোন কোন গ্রামের চিঠি বিলি হয় সে খোঁজ নিয়েছিলেন তো?

—তা আবার নিইনি? শুধু খোঁজ নেওয়া কী হে সব জায়গাতেই নিজে গিয়ে ঢুঁ মারতেও ছাড়িনি। কিন্তু লাভ হয়েছে প্রকাণ্ড অশ্বডিম্ব।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল নীরবে।

সুন্দরবাবু বললেন, আমার কী সন্দেহ হচ্ছে জানো? মনোহর নাম ভাঁড়িয়ে কিছুদিন ও অঞ্চলের কোথাও বাস করেছিল। তারপর সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবুকে হাতে পেয়ে হত্যা করে তাঁদের টাকাগুলো হাতিয়ে আবার সরে পড়েছে কোনও অজানা দেশে!

জয়ন্ত সেন নিজের মনেই বললে, চিঠি পড়ে জানা গেল, মনোহরবাবুর কোনও প্রস্তাবে গোবিন্দবাবু প্রথমে রাজি হননি, কিন্তু পরে রাজি হয়েছিলেন। খুব সম্ভব সেই প্রস্তাবটাই কার্যে পরিণত করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন বারো লক্ষ টাকা।

—হুম, কে বলতে পারে সুশীলা দেবীর কাছেও মনোহর ঠিক এই রকম প্রস্তাব করেনি?

—কিন্তু কী এই প্রস্তাব, যার জন্যে লোকে এমন লক্ষ টাকা খরচ করতে রাজি হয়?

—কেবলই কি টাকা খরচ করতে রাজি হয়, ধাপ্পায় ভুলে সংসার-পুত্র-কন্যা-আত্মীয় ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে যেতেও কুণ্ঠিত হয় না।

—সুন্দরবাবু, প্রস্তাবটা যে অতিশয় অসাধারণ সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই!

সুন্দরবাবু বললেন, জয়ন্ত, মনোহরের প্রস্তাব নিয়ে বেশি মস্তিষ্কচালনা করে কোনোই লাভ নেই।

—লাভ আছে বই কি! প্রস্তাবটা কী জানতে পারলে আমাদের আর অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হয় না।

—কিন্তু যখন তা আর জানবার উপায় নেই তখন আমাদের অন্ধকারেই ঢিল ছুড়তে হবে বই কি!

—অন্ধকারে বহু ঢিল তো ছুড়েছেন, একটা ঢিলও লক্ষে গিয়ে লাগল কি!

—তুমি আমাকে আর কী করতে বলো?

—আপনি তো সর্বাগ্রে মনোহরবাবুকে আবিষ্কার করতে চান?

—নিশ্চয়ই!

—তাহলে আমাদের সঙ্গে আর একবার সুলতানপুর চলুন।

—সেটা হবে ডাহা পণ্ডশ্রম। কারণ সে-অঞ্চলের কোনও পাথরই আমি ওলটাতে বাকি রাখিনি।

—না, একখানা পাথর ওলটাতে আপনি ভুলে গিয়েছেন।

—কোনখানা শুনি?

—যথাসময়ে প্রকাশ পাবে।

সুন্দরবাবু একটু নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, বেশ তাই সই।

—মানিক সব শুনলে।

—এখানে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—ফরমাজ করো।

—তোমার ছবি আঁকার হাত খুব পাকা!

—তুমি ছাড়া আর কেউ ওকথা বলে না!

—এখন আমায় কী করতে হবে তাই বলো।

—মনোহরবাবুর আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি আগে তুমি সুন্দরবাবুর কাছ থেকে ভালো করে আর-একবার শুনে নাও। তারপর এমন একটি মনুষ্য মূর্তি আঁকো, যার মধ্যে থাকবে ওই বিশেষত্বগুলি।

সুন্দরবাবু কৌতূহলী হয়ে বললেন, ও-রকম ছবি এঁকে কী লাভ হবে?

—ওই ছবির সাহায্যে হয়তো আসামিকে শনাক্ত করা যাবে।

—জয়ন্ত কী যে বকে তার ঠিক নেই। মনোহরকে আমিও দেখিনি, মানিকও দেখেনি। আমি খেয়েছি পরের মুখে ঝাল! সাত সকালে আমল খাস্তা! মানিক শিব গড়তে বানর গড়ে বসবে। ছবি দেখে মনোহরকে চেনাই যাবে না।

—ফলেন পরিচিয়তে সুন্দরবাবু, ফলেন পরিচিয়তে! অর্থাৎ ফলের দ্বারা চেনা যায় বৃক্ষকে। আসল তাৎপর্য হচ্ছে, আকৃতির দ্বারা মানুষকে না চিনলেও তার ব্যবহারের দ্বারা তাকে চেনা যায় অনায়াসেই। বহু অভিজ্ঞতার ফলেই এরকম এক একটি প্রবাদ বাক্য রচিত হয় বুঝলেন মশাই।

তবু সুন্দরবাবুর মন মানল না, তিনি বললেন, তুমি কেবল নিজের মনগড়া কথাই বলছ, একটা প্রমাণও তো দিতে পারলে না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলল, একটা কেন, অনেক প্রমাণই দিতে পারি।

—তাই নাকি? এ দেশের কোনও গোয়েন্দা যে এমন বর্ণনা শুনে প্রতিকৃতি এঁকে অপরাধী গ্রেপ্তার করেছে আমি তো কখনও তা শুনিনি।

—এদেশের কথা শিকেয় তুলে রাখুন সুন্দরবাবু এদেশের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের গোয়েন্দারা অনেক বারই এমনি বর্ণনা শুনে আঁকা প্রতিকৃতির সাহায্যে আসল অপরাধীকে বন্দি করতে পেরেছে।

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, বটে, বটে? আমি তো জানতুম না।

মানিক বললে, সুন্দরবাবু, আপনি অনেক কিছুই আগে জানতেন না। এখনও জানেন না, আবার না জানালে ভবিষ্যতেও জানতে পারতেন না। তবু জানতে গেলেও এত বেশি তর্ক করেন কেন বলুন দেখি?

সুন্দরবাবু দীপ্ত নেত্রে কেবল বললেন, হুম!

জয়ন্ত বললে, জানাজানি নিয়ে হানাহানি ছেড়ে দাও মানিক। এখন বর্ণনা শুনে মনোহরের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করো। কালই আমরা সুলতানপুরে যাত্রা করব।

॥ তিন ॥

সিদ্ধেশ্বরবাবুর চিঠি

সুলতানপুর ছোটো শহর হলেও তিনটি রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত বলে এখানে লোকজনের সংখ্যা বড়ো অল্প নয়।

শহরের ভিতর দাঁড়িয়ে দেখা যায় সুলতানপুরের বাইরের চারি দিকে প্রকৃতি যেন নিজে ভাণ্ডার উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে অজস্র সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য।

মানিক বললে, জয়ন্ত, এমনি সব জায়গাতেই জন্মলাভ করে কবির কল্পনা!

জয়ন্ত বলল, কিন্তু আমরা কবি নই।

সুন্দরবাবু বললে, আমরা ঠিক তার উলটো। আমরা এখানে কাল্পনিক মিথ্যার সঙ্গে মিতালি করতে আসিনি, আমরা এসেছি বাস্তব সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

ফাঁক পেলে মানিক ছাড়ে না। বললে, সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে? সে কী সুন্দরবাবু সত্য কি আপনার শত্রু?

সুন্দরবাবুর বদনমণ্ডলে ঘনিয়ে উঠেছিল অন্ধকার, কিন্তু জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে বললে, না মানিক, সুন্দরবাবু বোধ করি বলতে চান, উনি এসেছেন সত্যের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

সুন্দরবাবুর মুখ তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি বললেন, জয়ন্ত ঠিক ধরেছে। আমি তো ওই কথাই বলতে চাই।

—পোস্ট অফিস। যাবে নাকি?

—পরে বিবেচনা করব। কলকাতার বিখ্যাত চৌধুরি ব্যাংকের একটা শাখা এখানে আছে না?

—হ্যাঁ। সেটি এখানকার প্রধান ব্যাংক।

—একবার সেই ব্যাংকে যেতে চাই।

—কেন বলো দেখি?

—সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন।

চৌধুরি ব্যাংক। দোতলায় উঠে দেখা গেল, একটি বিলাতি পোশাক পরা যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রবল বাতাসে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

তাকে দেখেই মানিক বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, একী করুণা!

—আরে মানিক নাকি? এখানে যে?

—এই ব্যাংকের ম্যানেজারকে একটু দরকার।

—আমিই এখানকার ম্যানেজার।

—সে কী হে, কবে থেকে?

—বছর তিনেক তুমি তো আমাদের পাড়া আর মাড়াও না, জানবে কেমন করে? এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।

—ইনি হচ্ছেন সুন্দরবাবু—ডাকসাইটে পুলিশ কর্মচারী। ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু জয়ন্ত, আমার মুখে এর কথা নিশ্চয় তুমি অনেকবার শুনেছ। আর জয়ন্ত এটি হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু করুণা ভট্টাচার্য, আমার মামার বাড়ির পাশেই এদের বাড়ি।

করুণা বললে, আপনাদের মতো মহাবিখ্যাতরা এই ধারধারা গোবিন্দপুরে কেন? আচ্ছা, সে কথা পরে হবে, আগে আমার ঘরে এসে বসুন।

পাশেই ম্যানেজারের ঘর। সকলে আসন গ্রহণ করলে পর নিজেও টেবিলের সামনে গিয়ে বসে করুণা বললে এইবার আপনাদের জন্যে কী করতে পারি আদেশ করুন।

জয়ন্ত সহাস্যে বললে, আদেশ-ফাদেশ কিছুই নয়। প্রথমেই একটি বিনীত নিবেদন আছে। বলতে পারেন, সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ধনী বাঙালি এমন কে আছেন যিনি আপনাদের মক্কেল।

করুণা বললে, বিচিত্র প্রশ্ন। সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকায় কিছু কিছু বাঙালি আছেন বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই সম্পন্ন গৃহস্থ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক।

—সেই একজন কি খুব ধনী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকে ধনকুবের বলাও চলে হয়তো।

—তিনি কি আপনাদের মক্কেল?

—আমাদের একজন প্রধান মক্কেল।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—এখান থেকে তিন মাইল দূরে আছে বেগমপুরা নামে একটি জায়গা। সেখান থেকেও মাইল দুয়েক তফাতে দস্তুরমতো গহন বনের ভিতরে তাঁর বাংলোর ধরনে তৈরি মস্ত বাড়ি।

—অতবড়ো ধনী এমন নির্জন জায়গায় থাকেন কেন?

—শুনতে পাই তিনি ভারী খেয়ালি লোক।

—তাঁর নাম কি ডাক্তার মনোহর মিত্র?

—আজ্ঞে না, তাঁর নাম সিদ্ধেশ্বর সেন।

জয়ন্ত চুপ করে রইল গম্ভীর মুখে।

সুন্দরবাবু মুরব্বিয়ানা চালে ঘাড় নাড়তে নাড়তে গাল ভরা হাসি হেসে বললেন, তুমি আমায় টেক্কা মারবে বলে এখানে এসেছ। কিন্তু দেখছ তো ভায়া, আমি কোনও পাথর ওলটাতেই বাকি রাখিনি।

জয়ন্ত নিরুত্তর মুখে পকেট থেকে মানিকের আঁকা সেই ছবিখানা বার করে ধীরে ধীরে বললে, করুণাবাবু, এই ছবির মানুষটিকে কোনও দিন কি আপনি স্বচক্ষে দর্শন করেছেন?

করুণা ছবির উপর ঝুঁকে পড়ল। এবং তারপরেই বিনা দ্বিধায় বলে উঠল, এই ছবির সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মুখ ঠিক ঠিক মিলছে না বটে, তবে এ খানা যে সিদ্ধেশ্বরবাবুর প্রতিকৃতি সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই।

জয়ন্ত অপাঙ্গে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হেঁট করে ফেললেন সুন্দরবাবু।

॥ চার ॥

কাচের কফিন

—করুণাবাবু, আপনাদের এই সিদ্ধেশ্বরবাবুর কথা আরও কিছু বলতে পারেন? জিজ্ঞাসা করলে জয়ন্ত।

—একে আপনি মানিকের প্রাণের বন্ধু; তার উপরে আপনার মতো লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করবার সুযোগ পাওয়াও পরম সৌভাগ্য, আপনি কী জানতে চান বলুন?

—সিদ্ধেশ্বরবাবু কবে কত দফায় আপনাদের ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছেন?

করুণা স্তব্ধ হয়ে রইল অল্পক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বললে, দেখুন এরকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে উচিত নয়, কারণ সিদ্ধেশ্বরবাবু হচ্ছেন আমাদের একজন প্রধান মক্কেল। কিন্তু আপনাদের কথা স্বতন্ত্র, বিশেষত সুন্দরবাবু হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী। এক্ষেত্রে আমরা আদেশ পালন করতে বাধ্য। আপাতত আমার স্মৃতি থেকেই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করব। দরকার হলে পরে খাতাপত্র দেখে সঠিক তাঁর টাকার পরিমাণ আপনাকে জানাতে পারি। শুনুন, সিদ্ধেশ্বরবাবু তাঁর বাংলো-বাড়ি তৈরি হবার পর এ অঞ্চলে প্রথম আসেন প্রায় দুই বছর আগে। সেই সময় আমাদের ব্যাংকে জমা রাখেন ছয় লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বারে প্রায় বছর দেড়েক আগে তিনি এই ব্যাংকে জমা রাখেন ছয় লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় বারে প্রায় বছর দেড়েক আগে তিনি এই ব্যাংকে

পনেরো লক্ষ টাকা জমা দেন। তৃতীয় বারে সেও বোধহয় দেড় বছরের কাছাকাছি, সিদ্ধেশ্বরবাবুর কাছ থেকে আবার আমরা বারো লক্ষ টাকা পাই। অর্থাৎ মোট তেত্রিশ লক্ষ টাকা।

জয়ন্ত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে খুব মৃদু স্বরে বললে, শুনছেন? দ্বিতীয় আর তৃতীয় বারে সিদ্ধেশ্বরবাবু এখানে জমা দিয়েছেন যথাক্রমে পনেরো আর বারো লক্ষ টাকা? সুশীলাদেবী আর গোবিন্দবাবুও কি যথাক্রমে পনেরো আর বারো লক্ষ টাকা নিয়েই নিরুদ্দেশ হয়নি?

সুন্দরবাবুও মৃদুস্বরে জয়ন্তের কানে কানে বললেন, কিন্তু প্রথম দফায় ছয় লক্ষ টাকা কোথা থেকে এল।

—জোর করে কিছু বলতে চাই না। খুব সম্ভব ওটা হচ্ছে সিদ্ধেশ্বরবাবুর নিজের টাকা।

করুণা বললে, আপনারা আর কিছু জানতে চান?

—সিদ্ধেশ্বরবাবুর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানেন?

—বিশেষ কিছুই জানি না!

মানিক শুধালে, আচ্ছা করুণা, বছর দেড়েক আগে কোনও প্রাচীন মহিলা কি সিদ্ধেশ্বরবাবুর অতিথি হয়েছিলেন?

করুণা একটু ভেবে বললে, দ্যাখো মানিক, বছর দেড়েক আগেকার কথা আমি ঠিকঠাক জানি না। তবে একথা শুনেছি বটে, বছর দেড়েক আগে সিদ্ধেশ্বরবাবু একটি অতি বৃদ্ধাকে নিয়ে সুলতানপুর স্টেশনে এসে নেমেছিলেন।

—তারই কিছুদিন পরে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকও ওখানে এসেছিলেন।

এও আমার শোনা কথা মানিক। শুনেছি, সে ভদ্রলোকও গিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়িতে। কিন্তু—

—থামলে কেন, কিন্তু কী?

কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে করুণা বললে, ভাই মানিক সিদ্ধেশ্বরবাবুর সম্বন্ধে অনেক কানাঘুষাই শুনতে পাই। কিন্তু শোনা কথা পরের কাছে প্রকাশ করতে ভয় হয়।

করুণার পৃষ্ঠদেশে একটি সাদর চপেটাঘাত করে মানিক অভিযোগ ভরা কণ্ঠে বললে, করুণা আমিও কিন্তু তোমার পর। কোনও ভয় নেই, তোমার শোনা কথাই প্রকাশ করো।

করুণা বললে, শুনেছি সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাংলোয় একটি বৃদ্ধা নারী আর একটি বৃদ্ধ পুরুষ প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাঁদের প্রস্থান করতে দেখেনি! কেবল তাই নয় তাঁরা যে এখনও ওই বাংলোর ভিতরে আছেন, এমন কোনও প্রমাণও নেই।

—এ যে অসম্ভব কথা?

করুণা প্রায় আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠেই বললে, তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তুমি জিজ্ঞাসা করছ বলেই বলছি, সিদ্ধেশ্বরবাবুর ওই রহস্যময় বাংলো সম্বন্ধে আরও যেসব কানাকানি শুনতে পাই তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।

—লোকে বলে, ও বাংলো হচ্ছে ভূতুড়ে।

—কেন?

—ওখানে নাকি কাচের দুটো কফিনের মধ্যে—

—কাচের কফিন!

—হ্যাঁ! ওখানে নাকি কাচের দুটো কফিনের মধ্যে একটি পুরুষ আর একটি নারীর মৃতদেহ।

সুন্দরবাবু চমকে উঠে প্রায় গর্জন করে বললে, হুম! হুম!

ঠিক সেই সময় ঘরের ভিতরে ঢুকল একজন ভৃত্য। সে বললে, সিদ্ধেশ্বরবাবু দেখা করতে এসেছেন।

সচমকে সকলে করলে দৃষ্টি বিনিময়।

করুণা বললে, বেশ তাঁকে নিয়ে এসো।

মিনিট-দুয়েক পরেই ঘরের দরজার কাছে সিদ্ধেশ্বরবাবুর আবির্ভাব। মানিকের আঁকা ছবির বারো-আনাই মিলে যায় তাঁর চেহারার সঙ্গে। ব্যস্তভাবে সকলের মুখের উপরে একবার বিদ্যুৎবেগে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, করুণাবাবু, আপনার ঘরে আজ অনেক অতিথি দেখছি। আমি জানতুম না, মাপ করবেন, আর-একদিন আসব! বলতে বলতে সিদ্ধেশ্বরের অন্তর্ধান।

সুন্দরবাবু তাঁর দোদুল্যমান ভুঁড়িকে রীতিমতো কাহিল করে তড়াক করে এক সুদীর্ঘ লম্ফ মেরে সচিৎকারে বললেন, পাকড়াও, পাকড়াও মনোহর মিত্তির লম্বা দিচ্ছেন? ওকে গ্রেপ্তার করো। ওকে গুলি করে মারো।

জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে সুন্দরবাবুর কাঁধ চেপে ধরে কঠোর কণ্ঠে বললে, শান্ত হোন সুন্দরবাবুর শান্ত হোন! লম্ফঝম্প আর চিৎকার করে ভাঁড়ামি করবেন না। আসুন, দেখা যাক মনোহরবাবু এর পরে কী করেন!

তারপর ব্যাংকের বারান্দায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তায় মনোহরবাবু তাঁর মোটরবাইক চালিয়ে দিয়েছেন সবেগে।

সুন্দরবাবু বললেন, এখন আমরা কী করব? নীচে নেমে গিয়ে মোটরে চড়ে মনোহরের পশ্চাদ্ধাবন করতে পারি বটে, কিন্তু ততক্ষণে আসামি আমাদের নাগালের বাইরে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

করুণার দিকে ফিরে জয়ন্ত বলল, আপনি তো মনোহরবাবুর বাংলোয় যাবার রাস্তা জানেন?

—জানি।

—তাহলে কালবিলম্ব না করে আমাদের সঙ্গে আসুন। মনোহরবাবু তো বাংলোখানা তার কফিন দুটো কাঁধে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। আগে দেখা যাক তাঁর বিরুদ্ধে

কী কী প্রমাণ আছে, তারপর, তাঁকে পুনরাবিষ্কার করতে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।

সকলে পুলিশজিপের উপর চড়ে বসল এবং সঙ্গে সঙ্গে চলল কয়েকজন সামরিক পুলিশ।

খানিকক্ষণ পরেই পিছনে পড়ে রইল সুলতানপুর এবং সামনে এগিয়ে এল ভূ-স্বর্গের বর্ণোজ্জ্বল দৃশ্য।

কিছুক্ষণের মধ্যে বেগমপুরাও পিছনে গিয়ে পড়ল। সামনে এবার দুরারোহ পর্বতমালার তলায় মাথা তুলে দাঁড়ানো দুর্গম অরণ্য এবং তারই বক্ষ ভেদ করে অগ্রসর হয়েছে সর্পিল গতিতে একটি নাতিবৃহৎ পথ। সেই জনহীন পথে নীরবতা তন্দ্রাভঙ্গ করে ছুটে চলল জিপ।

মানিক বললে, এমন জায়গাতেও মানুষ থাকে।

সুন্দরবাবু বললেন, মনোহর মানুষ নয়, সে অমানুষ! নিজের যোগ্য জায়গাই বেছে নিয়েছে। কিন্তু আমার খালি খালি এই কথাই মনে হচ্ছে, জয়ন্ত কেমন করে সন্দেহ করলে যে সুলতানপুর চৌধুরি ব্যাংকের সঙ্গে মনোহরের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে?

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, আন্দাজ সুন্দরবাবু, আন্দাজ। আমার বিশেষ অটুট কোনও যুক্তি নেই, আন্দাজেই ছুড়েছি অন্ধকারে ঢিল।

—হুম, আন্দাজটা কি শুনতে পারি না?

—গোড়া থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, মনোহরবাবু বাসা বেঁধেছেন সুলতানপুর ডাকঘরের এলাকার মধ্যেই। এতে ধরে নিলুম, যথাক্রমে পনেরো লক্ষ আর বারো লক্ষ টাকা নিয়ে সুশীলা আর গোবিন্দবাবু তাঁরই কাছে গিয়ে হয়েছেন নিরুদ্দেশ। সাতাশ লক্ষ টাকা হস্তগত করে নিশ্চয়ই তিনি নির্বোধের মতো বাড়ির ভিতরে রেখে দেবেন না। বাড়িতে চোর-ডাকাতের ভয়, ওদিকে ব্যাংকে রাখলে টাকা সুদে বাড়ে। তারপর ও-টাকার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। মনোহরবাবুর চিঠির একটা জায়গা স্মরণ করুন। গোবিন্দবাবুকে তিনি লিখেছিলেন—যতদিন-না আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ততদিন আমরা এখানেই বাস করব। কিন্তু মানুষের খাওয়া-পরার জন্যে দরকার হয় টাকার। টাকা আগাছার মতন আপনা-আপনি মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে ওঠে না। নিজের ভরণপোষণের জন্য মনোহরবাবু নিশ্চয়ই কিছু টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখবেন। সুতরাং কোনও না কোনও দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে যে ব্যাংকের সম্পর্ক আছে, এটা আমি আগে থাকতেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। অবশ্য আন্দাজ মাত্র।

সুন্দরবাবু তারিফ করে বললে, বা রে আন্দাজ! বলিহারি।

করুণা বললে, ওই সিদ্ধেশ্বর—অর্থাৎ মনোহরবাবুর বাংলো দেখা যাচ্ছে।

সুন্দরবাবুর বললেন, হুঁ মনোহরহীন মনোহরের বাংলোর ভিতরে আছে হয়তো এয়ার-টাইট কাচের কফিনের মধ্যে দুটো বুড়ো-বুড়ির কতদিনের বাসি শুকনো মড়া! বাবা, এ কী রকম বাংলো। চারদিকে জনজঙ্গল আর ঝোপঝাড়, উপর থেকে মাথার উপরে ঝাঁপ খাবে বলে হুমড়ি খেয়ে আছে প্রকাণ্ড কালো পাহাড়। এ যেন হানাবাড়ি। গা ছম ছম করে ওঠে! মনোহরটা বোধ হয় এখানে বসে শবসাধনা করত। সে মন্ত্র পড়ে দিলে মড়াদুটো জ্যান্ত হয়ে

উঠত। এত কাঠখড় পুড়িয়ে তান্ত্রিক খুনিটাকে ধরতে পারলুম না, আমার এ আফসোস রাখবার ঠাঁই নেই। কপাল!

গাড়ি ফণি-মনসার বেড়া দিয়ে ঘেরা একখানা সুদীর্ঘ একতলা বাড়ির সামনেকার খোলা জমির উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

॥ পাঁচ ॥

ষোড়শী ললিতা দেবী

সারি সারি ঘর। সামনে টানা চওড়া দালান। জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ঘুঘুর কান্নার সুর, তা ছাড়া আর কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই। এ যেন এক অপরিসীম বিজনতার রাজ্য। স্তব্ধতার মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে সত্যসত্যই।

স্বভাবত উচ্চকণ্ঠ সুন্দরবাবুও সেখানে চেঁচিয়ে কথা কইতে পারলেন না—সেখানে চিৎকার করাও কী যেন নিয়মবিরুদ্ধ। চুপিচুপি বললেন, মনোহরের লোকজনরাও কি আমাদের গাড়ির সাড়া পেয়ে চম্পট দিয়েছে?

—অসম্ভব নয়! দেখা যাক, এই বলে জয়ন্ত অগ্রসর হয়ে দালানে গিয়ে উঠল, তার পিছনে পিছনে চলল আর সকলে। নিজের পায়ের শব্দে তারা নিজেরাই উঠতে লাগল চমকে।

দালানের উপর দাঁড়িয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখলে জয়ন্ত! তারপর সামনের একটা ঘরের দিকে সোজা এগিয়ে গেল—

এবং সঙ্গে সঙ্গে সুগম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়,—এদিকে আসুন—আপনার বাঁ দিকের শেষ ঘর।

সচকিত প্রাণের নকলে ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুতের মতো।

সুন্দরবাবু এতক্ষণ দেখতে পাননি—বাঁ-দিকের শেষ ঘরের পর্দা দেওয়া দরজার দুই পাশে দাঁড় করানো রয়েছে দুটো সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নরকঙ্কাল।

আঁতকে উঠে অস্ফুটকণ্ঠে তিনি বললেন, আর নয়, এইবেলা সরে পড়ি এসো! মড়ার হাড় এখানে কথা কয়?

সেই কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, ভয় নেই! ও দুটো হচ্ছে রক্তমাংসহীন কঙ্কাল মাত্র! নির্ভয়ে ঘরের ভিতরে আসুন।

আকস্মিক কণ্ঠস্বর শুনে জয়ন্ত কেবল বিস্মিত হয়েছিল!

ঘরের ভিতর থেকে কে বললে, পর্দা ঠেলে প্রবেশ করুন।

দুই হাতে দুই দিকে পর্দা সরিয়ে জয়ন্ত ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। সামনেই একখানা ইজিচেয়ারের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় স্বয়ং ডাক্তার মনোহর মিত্র।

এ দৃশ্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত। হতভম্ব হয়ে গেল জয়ন্ত পর্যন্ত!

মনোহরের গম্ভীর মুখের ওষ্ঠাধরের উপরে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল যেন একটুখানি হাসির ঝিলিক! তিনি বললেন আমি পালাইনি দেখে অবাক হচ্ছেন? অবাক না হলেও চলবে। আপনারা শুভাগমন করবেন জেনেই আমি এখানে আপনাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছি। আপনারা দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, এখানে আসনের অভাব হবে না।

পিছন থেকে সুন্দরবাবু বলে উঠলে, হুম! ছদ্মনামের আড়ালে যে লোক তেত্রিশ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছে, তার বাড়িতে আসনের অভাব হবে না, আমি তা জানি!

মনোহরের একটুও ভাবান্তর হল না! খুব সহজ, স্থিরকণ্ঠে তিনি বললেন, নানা কারণে সময়ে আত্মগোপন করবার দরকার হয় অনেকেরই—এমন কি আপনাদেরও!

—আমরা মাঝে মাঝে আত্মগোপন অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করি অসাধুদের শাস্তি দেবার জন্য! কিন্তু তুমি?

কালো চশমার আড়ালে মনোহরের দুই-চক্ষু ক্রোধে দীপ্ত হয়ে উঠল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল অত্যন্ত কঠিন। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, আমি মহাশয়ের চেয়ে বয়সেও বড়ো, বিদ্যা-বুদ্ধি মান সম্ভ্রমেও বোধহয় ছোটো নই। আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করে ভদ্রতার অপমান না করলেই বাধিত হব। আপনারা অসাধুদের দণ্ড দেবার জন্যে ছদ্মবেশ ধারণ করেন, কেমন? তাহলে জানবেন, আমিও ছদ্মনাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি, মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্যে।

সুন্দরবাবু টিটকিরি দিয়ে বলে উঠলেন, ও হো-হো-হো! মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর অভিনব যিশুখ্রিস্ট। তাই তিনি সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবুকে হত্যা করে কাচের কফিনে পুরে রেখে দিয়েছেন। তাই তিনি ওই দুই হতভাগ্যের কাছ থেকে সাতাশ লক্ষ টাকা অপহরণ করে ধরা পড়বার ভয়ে ছদ্মনামের আশ্রয়ে ব্যাংকে জমা দিয়েছেন। এর পর কী করা উচিত বলুন দেখি? আপনাকে সাধুবাদ দেব, না হাতকড়া আনবার হুকুম দেব?

এতটুকুও বিচলিত না হয়ে স্থির কণ্ঠে মনোহর বললেন, লোকে আমাকে অপবাদ দেয়—আমি নাকি হাসতে জানি না। কিন্তু আপনার কথা শুনে আজ আমার প্রাণপণ অট্টহাস্য করবার ইচ্ছে হচ্ছে। আমি সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবুকে হত্যা করেছি? কোন প্রত্যক্ষদর্শী আপনার কানে এই অপূর্ব খবরটি দিয়ে গিয়েছে?

—দেখুন ধাপ্পা দিয়ে আপনি আমাকে গুলোবার চেষ্টা করবেন না। বলতে পারেন সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু আজ কোথায়?

—তাঁরা এই বাড়িতেই আছেন।

—হ্যাঁ, কাচের কফিনের ভিতর।

—বারবার কাচের কফিন বলে চিৎকার করবেন না। আমার বাড়িতে কফিন বলে কোনও জিনিসই নেই।

—বটে, বটে—হুম এখানে কাচের কফিন আছে, কি না আছে, সেটা খানাতল্লাশ করলেই জানতে পারা যাবে।

এতক্ষণ পরে মনোহর হঠাৎ সিধে হয়ে উঠে বসে বললেন, কাচের কফিনের কথা ছেড়ে দিন। আপনি আগে জীবন্ত অবস্থায় কাকে দেখতে চান? সুশীলা দেবীকে, না গোবিন্দবাবুকে?

সুন্দরবাবু প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর বাধো বাধো গলায় বললেন, কোথায় সুশীলা দেবী? আগে তাঁকেই দেখতে চাই।

উত্তম। বলেই মনোহর গলা চড়িয়ে ডাকলেন সুশীলা! সুশীলা।

বাড়ির ভিতর থেকে গানের মতন একটি আওয়াজ শোনা গেল।

—আজ্ঞে? কী বলছেন?

—তুমি একবার এই ঘরে এসো তো মা।

ঘরের ভিতরকার একটি দরজার পর্দা ঠেলে আত্মপ্রকাশ করল যে আশ্চর্য রূপবতী ও মহিমাময়ী মূর্তি, তাকে দেখবার জন্যে কেহই প্রস্তুত ছিল না। এ মূর্তি যে মাটির পৃথিবীর, স্বচক্ষে দেখেও কেউ তা বিশ্বাস করতে পারল না।

বিপুল বিস্ময়ে জয়ন্ত বলে উঠল, ইনিই কি সুশীলা দেবী?

মনোহর বললেন, হ্যাঁ? কিন্তু এখন থেকে ইনি নতুন নামে আত্মপরিচয় দেবেন।

—নতুন নাম?

—হ্যাঁ, ললিতা দেবী।

॥ ছয় ॥

মাতৃভাষার দৌড়

সুন্দরবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, হুম। ইনি ললিতা দেবী বা পলিতা দেবী হতে পারেন, কিন্তু ইনি সুশীলা দেবী নন!

—কেন বলুন দেখি?

—সুশীলা দেবীর বয়স পঁচাত্তর বৎসর।

—ঠিক। এখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর হলেও তিনি আর বৃদ্ধা নন।

—পাগলের মতন কী আবোল-তাবোল বকছেন।

—সুশীলা দেবী নবযৌবন লাভ করেছেন।

—শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করবেন না মনোহরবাবু।

—কেন প্রাচীনরা কি আবার নবীনা হতে পারে না?

—অসম্ভব! জরার পর মৃত্যু, জরার পর যৌবন নেই।

—বিজ্ঞানের মহিমায় সবই সম্ভবপর হয়। আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি বিজ্ঞান একদিন মানুষকে অমর করবে।

—আপনার ওই নির্বোধের স্বর্গে আমাদের টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। হয় কাজের কথা বলুন, নয়—

—নয়?

—নয় থানায় চলুন।

—বেশ, তবে কাজের কথাই শুনুন। মনোহর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন মা সুশীলা।

—বাবা!

সেকি মানুষের কণ্ঠস্বর, না বীণার ঝঙ্কার।

—তুমি এখন বাড়ির ভিতরে যাও। এই ভদ্রলোকদের জন্য একটু চা-টা পাঠিয়ে দাও।

সুন্দরবাবু ব্যস্তভাবে সভয়ে বলে উঠলেন, না, না এখানে আমরা চা-টা খেতে আসিনি!

—ভয় নেই, আপনাদের চায়ে কেউ বিষ মিশিয়ে দেবে না।

—বিষ থাক আর না থাক এখানে চা আর টা কিছুই খাওয়া চলতে পারে না।

—আপনাদের সকলেরই কি এক মত?

জয়ন্ত বললে, আমার অন্য মত। আমি চা-টা সব খাব। কী বলো মানিক?

—আমিও তোমার দলে।

—করুণাবাবু কী বলেন। পরমাসুন্দরী সুশীলা—ওঁকে কি ললিতা দেবী বলে ডাকব মনোহরবাবু?

—ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

আবার বাজল সেই অমৃতায়মান কণ্ঠস্বরের মোহনীয় বীণাবেণু! বাবার কাছে আমি সুশীলা! কিন্তু আপনারা তো বৃদ্ধা সুশীলাকে দেখেননি আপনারা আমাকে ললিতা বলেই ডাকুন।

জয়ন্ত বললে, বেশ! করুণাবাবু, এই পরমাসুন্দরী ললিতা দেবী যদি তাঁর সুন্দর হাত দিয়ে সুন্দর চা তৈরি করে দেন, তাহলে সুন্দরবাবুর মতো আপনি তা পান করবেন না?

—করব না, বলেন কী? আমি তো নির্বোধ নই।

—সুন্দরবাবু, আপনি কি এখনও মত বদলাবেন না? মনে রাখবেন চায়ের সঙ্গে আবার টা।

সুন্দরবাবু জুলজুল করে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—কী আর করি বলো! তোমরা সবাই যখন রাজি তখন আমারও আর একযাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন? আমিও রাজি।

ললিতা দেবীর গোলাপ-পেলব ওষ্ঠাধরে ফুটল যে মিষ্টি হাসিটুকু তাও যেন নীরব সংগীতের মতো সুন্দর। একটি নমস্কার করে পাশের ঘরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন জীবন্ত স্বপ্নপ্রতিমার মতো।

মনোহর গম্ভীর স্বরে বললেন, শুনুন মশাই। জরার কারণ কী মানুষ যে জানে না, এ কথা সত্য নয়। বরং এই কথাই সত্য যে জরার কারণ তার কাছে অজ্ঞাত নয়, এইটুকুই জানে না সে।

সুন্দরবাবু মুখভঙ্গি করে বললেন, বাবা এ যে হেঁয়ালি।

—এ সব সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আপনাদের যে কেমন করে বোঝাব বুঝতে পারছি না। Radioactive বস্তু কাকে বলে জানেন?

জয়ন্ত বললে, জানি। আমাকেও মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে হয়, যদিও তা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

সুন্দরবাবু বললেন, বিজ্ঞানে আমি একেবারে মা! বাংলায় বুঝিয়ে দিতে পারেন?

—ইংরেজি তো পদে আছে, বাংলায় শুনলে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

—তাও কখনও হয়? বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।

—আমাদের মাতৃভাষার অভিধানে Radioactive-এর অর্থ এই ভাবে বোঝানো হয়েছে; আংশুবিকিরণ দ্বারা বিদ্যুৎমাপক প্রভৃতির উপর ক্রিয়াকরণক্ষম; (রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, পলনিয়াম প্রভৃতি সম্পর্কে অপারদর্শকপদার্থ ভেদকারক ও বৈদ্যুতিক ক্রিয়াজনক এবং অদৃশ্য কিরণবিকরণক্ষম।) কী বুঝলেন বলুন।

সুন্দরবাবু বললেন, ব্যাপার বুঝব কী, আরও গুলিয়ে গেল। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে! এইজন্যেই কি কবি গান বেঁধেছেন—'আ মরি বাংলা ভাষা?'

—বাংলা ভাষার দোষ নেই সুন্দরবাবু, তবে বাংলা ভাষায় এখনও ভালো করে বিজ্ঞানকে পরিপাক করবার চেষ্টা হয়নি কারণ দেশ এতদিন স্বাধীন ছিল না, যাক ও-কথা। যতটা সংক্ষেপে পারি কিছু কিছু বোঝাবার চেষ্টা করি। অনেক পরীক্ষার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি যে, সারাজীবন ধরে আমাদের দেহের ভিতরে যে Radioactive বস্তু জমে ওঠে, অর্থাৎ যাকে বলে ক্রমিক radium জরার কারণ হচ্ছে তাই। সূর্যের দ্বারা পৃথিবীর উপরে প্রতিদিনই radium নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আমরা তা খাচ্ছি, আমরা তা পান করছি, নিশ্বাস দিয়ে বাতাস থেকে তা আকর্ষণ করছি। তারই ফলে প্রত্যেক জীব আর তরুলতাও ধীরে ধীরে জরাগ্রস্ত হয়। জরাব্যাধি নিবারণ করবার উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।

সুন্দরবাবু দুই চোখ ছানাবড়ার মতন করে বললেন, বলেন কী মশাই!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। Calcium থেকে দেহের হাড় তৈরি হয়। রসায়ন শাস্ত্রের দিক থেকে radium কাজ করে calcium-এরই মতো। গঠন কার্যে যেখানে calcium-এর পরমাণু দরকার হয়, সেখানে radium পরমাণু ব্যবহার করলে দেহের রক্তস্রোত তা না জেনেই গ্রহণ করে। Radium বিষের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাদের ভিতর থেকে ওই radium পরমাণুগুলিকে বিতাড়িত করা।

জয়ন্ত বললে, সেটা কি অসম্ভব ব্যাপার নয়?

—প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় বটে কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় মোটেই তা নয়। জরাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের হাড়ের ভিতর থেকে বিপজ্জনক radium পরমাণুগুলিকে বাইরে বার করে দেওয়া অসম্ভব নয় মোটেই। প্রথমে রোগীকে এমন 'ভিনিগার' ও অ্যাসিড জাতীয় পথ্য দিতে হবে, যাতে করে তার দেহের হাড়গুলো calcium থেকে মুক্ত হয়। এক হপ্তার পর রোগীকে আমি আবার এক হপ্তা ধরে স্বাভাবিক পথ্য দিই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এদিকেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখি যে খাদ্যের ভিতরে যে খাঁটি calcium থাকে, তার মধ্যে কিছুমাত্র Radio activity বর্তমান নেই। প্রথমে যে ভিনিগার ও অন্যান্য অ্যাসিডের পথ্য দেওয়া হয়, দেহের ক্ষতিসাধন করবার ক্ষমতা তাদের অপেক্ষাকৃত কম। ওই পথ্যের পরমাণু গ্রহণ

শক্তি বা valence আছে। তাই ওই পথ্যের আকর্ষণে আসল calcium-এর সঙ্গে দেহের ভিতর উড়ে এসে জুড়ে বসা radiumও ক্রমে ক্রমে বাইরে বেরিয়ে যায়। স্বাভাবিক পথ্যের পর দিই আবার অ্যাসিড জাতীয় পথ্য। তারপর আবার স্বাভাবিক পথ্য। এইভাবে চিকিৎসা চলে মাসের পর মাস।

জয়ন্ত চমৎকৃত হয়ে বললে, এই চিকিৎসার ফলেই জরাগ্রস্ত রোগী ফিরে পায় তার নবযৌবন?

—প্রায় তাই বললেও চলে। তবে উপসর্গ যে দেখা না যায় তা বলা চলে না। যেমন ওই কাচের কফিন ব্যাপারটা। সুন্দরবাবু কাচের কফিনের উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু সেটা যে কী পদার্থ আপনারা কেউ তা জানেন না, দেখতে চান তো আমার সঙ্গে আসুন।

॥ সাত ॥

মানুষ-গুটিপোকা

মনোহরের সঙ্গে সকলে এসে উপস্থিত হল প্রকাণ্ড একখানা হলঘরে। তার অধিকাংশ জুড়ে বিরাজ করছে নানানরকম যন্ত্রপাতি। যাঁরা কোনও কলেজের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার দেখেছেন, তাঁদের কাছে ওসব যন্ত্রের কয়েকটি পরিচিত বলে মনে হবে।

কোথাও একাধিক bunsen-এর অত্যন্ত তপ্ত উত্তাপসঞ্চালক প্রদীপবিশেষ। উপরে টগবগ করে ফুটছে still বা অধোযন্ত্রগুলো, কোথাও সারি সারি কিলক থেকে ঝুলছে condenser বা সংহতিযন্ত্র যা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে দেখা যায় না।

সুন্দরবাবু আবার হুম শব্দটি উচ্চারণ করে বললেন, মনোহরবাবু এতক্ষণ কানে যা শুনলুম তার একবর্ণও বুঝতে পারলুম না। এখন চোখে দেখছি তাও ভালো করে বুঝতে পারছি না। আপনি বোধ হয় আবার লেকচার শুরু করবেন? কিন্তু তার আগে আমার গোটাকয় সহজ প্রশ্নের জবাব দেবেন?

—আজ্ঞা করুন।

—আপনি এই সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তো কলকাতায় বসেই করতে পারতেন? মিথ্যে এত লুকোচুরি কেন!

—কলকাতার কৌতূহলী জনতা যদি ঘুণাক্ষরেও আমার পরীক্ষার ব্যাপার টের পেত, তাহলে আমার বাড়িটি পরিণত হত সরকারি বাগানে আর সেখানে উঁকিঝুঁকি মারতে আসত রাম-শ্যাম যদু-মধু সকলেই। তারপরেও আমি কি আর নির্বিঘ্নে পরীক্ষা চালাবার অবসর পেতুম?

—সে-কথা ঠিক। কিন্তু সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু কাউকে কিছু না জানিয়ে আপনার সঙ্গে অমন চোরের মতন পালিয়ে এসেছেন কেন?

—তারও প্রথম কারণ হচ্ছে মন্ত্রগুপ্তি। দ্বিতীয় কারণ গুরুতর।

—গুরুতর মানে?

—সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু নতুন দেহ লাভ করবার পর ইহজীবনে আর নিজের নিজের বাড়িতে ফিরবেন না বোধ হয়।

—সে কী মশাই?

—হ্যাঁ। সেই জন্যেই সুশীলা আজ ললিতা নাম ধারণ করেছেন।

—কিন্তু কেন, কেন, কেন?

—নতুন দেহ অতি প্রাচীনা সুশীলাকে কেউ কি চিনতে পারত?

—তা পারতই না—হুম!

—সুশীলার কথা কেউ বিশ্বাস করত?

—তা তো করতই না—ঠিক!

—তাকে নিয়ে আরও নানারকম গণ্ডগোল—এমনকি মামলা-মোকদ্দমা হবারও সম্ভাবনা ছিল না কি?

—তা তো ছিলই হ্যাঁ?

—আরও কত দিক দিয়ে সুশীলার জীবন হয়ে উঠত ভয়াবহ। সেইজন্যে স্থির করেছিল, আমার পরীক্ষা সফল হল নতুন দেহে নতুন নামে নতুন ভাবে জীবন যাপন করবে! গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধেও ওই কথা।

—সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু অত টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কেন? আর সে-সব টাকা আপনার নামেই বা জমা আছে কেন?

—নতুন দেশে নতুন নামে নতুন নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে হলে প্রথমেই দরকার টাকা। সে টাকা আসবে কোথা থেকে? নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যেই সুশীলা দেবী আর গোবিন্দবাবু উচিত মতো টাকা সঙ্গে করে এখানে এসেছেন। ওঁদের টাকা আমার ছদ্মনামে জমা রেখেছি কেন? আমি জানতুম পুলিশ ওঁদের খোঁজ করবে। ওঁদের নামে টাকা জমা রাখলে পুলিশ নিশ্চয় সন্ধান পেত। আর কোনও প্রশ্ন আছে?

—আর একটি প্রশ্ন। যদিও ললিতা দেবীই সুশীলা দেবী কি না সে খটকা আমার মন থেকে এখনও দূর হয়নি তবে ওটা আপাতত ধামাচাপাই থাক! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গোবিন্দবাবু কোথায়?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মনোহর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, জয়ন্তবাবু যে উপসর্গের কথা বলছিলুম, এইবার সেটা দেখবেন আসুন।

মনোহর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন একখানা খাটের পাশে। সেখানে শয্যার উপরে যে শায়িত মূর্তিটি ছিল তাকে দেখেই সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল পরম বিস্ময়ে।

একটি তরুণ, অপূর্ব সুন্দর মূর্তি—বালক বললেও চলে। সুগঠিত শুভ্র নগ্ন দেহ—যেন গ্রীক-ভাস্করের হাতে গড়া! কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সর্বাঙ্গ তার কাচ দিয়ে মোড়া এবং সেই কাচ তা কেউ গলিয়ে এমন ভাবে মূর্তির উপরে ঠেলে দিয়েছে যে সারা

দেহের সঙ্গে তা অচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে।

মনোহর বললেন, সুন্দরবাবু এই আপনার কাচের কফিন।

—হুম, কিন্তু কাচের কফিনের ভিতর ওটা কী রয়েছে? রঙিন মোমের পুতুল? না মৃতদেহ?

—আরও কাছে গিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।

—না, ওটা মোমের পুতুল নয়, মৃতদেহও নয়। ও যে জীবন্ত ওর সর্বাঙ্গে যে জীবনের রং জীবনের আভাস এমনকি দুই মুদিত চোখের পাতাও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

মনোহর বললেন ও এখনও ঘুমোচ্ছে, কিন্তু ওর ঘুম ভাঙতে আর বেশি দেরি নেই।

জয়ন্ত শুধোলে, আসল ব্যাপারটা কী মনোহরবাবু?

—আমি নিজেই জানি না। ওই কাচের আবরণী আমার সৃষ্ট নয়। পর্যাক্রমে calcium পথ্য দিয়ে, আবার তা বন্ধ করে বেশ কিছুকাল চিকিৎসা চালাবার পর রোগী হঠাৎ দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আর তার সর্বাঙ্গব্যাপী দেখা দেয় ওই কাচের আবরণ। কিছুকাল পরে রোগীর ঘুম ভাঙে, কাচের আবরণ ফেটে যায়, তারপর উঠে বসে তার জাগ্রত মূর্তি! এর অর্থ আমিও জানি না।

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতো বললেন, বাবা এ যে মানুষ গুটিপোকা!

মানিক শুধোলে, ও মূর্তিটি কার?

—গোবিন্দবাবুর।

—তাঁর বয়স তো সত্তর বৎসর?

সকলে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

সুশীলার প্রবেশ। সেই সুমধুর কণ্ঠে সে বললে, বাবা ও ঘরে খাবার দেওয়া হয়েছে।

মনোহর এতক্ষণ পরে একটু হেসে বললেন, চলুন! এই বিজন বনে আপনারা খাবারের মধ্যে কোনও বিশেষত্ব পাবেন না।

সুশীলা বললে, বাড়িতে যা ছিল তাই দিতে পেরেছি। স্যান্ডউইচ শিককাবাব, রুটি মাখন, চা আর মিষ্টান্ন।

মানিক বললে, ললিতা দেবী, চায়ের বৈঠক যে ভূরিভোজনের আসরে পরিণত হল। এই বিজন বনে শিককাবাব বানালেন কী দিয়ে? বাঘের মাংস দিয়ে নয় বোধ হয়।

—খেলেই বুঝতে পারবেন।

—আসুন সুন্দরবাবু।

—ভায়া আজ যা দেখলুম, আর শুনলুম, আমার পিলে অত্যন্ত চমকে গিয়েছে। খাওয়ার চিন্তা মোটেই জাগছে না!

—আপনার পিলে নির্বোধ নয়। একখানা স্যান্ডউইচ উদরসাৎ করলেই সে আবার অত্যন্ত শান্ত হয়ে পড়বে! আপনার ধাত জানতে আমার বাকি নেই? চলুন, মধুরেণ সমাপয়েৎ করে আসি।

সিরাজের বিজয়-অভিযান

'সিরাজের বিজয়-অভিযান' দেবসাহিত্য কুটীরের বার্ষিকী 'পরশমণি'তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

॥ এক ॥

এই অঞ্চলেই আগে ছিল প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ। তারপর তার নাম হয় মাকসুসাবাদ। তারপর মুর্শিদাবাদ।

মহানগরী মুর্শিদাবাদ।

স্বাধীন বাংলার শেষ রাজধানী। বিস্ময়বিমুগ্ধ ক্লাইভ যাকে দেখে লন্ডনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছিলেন।

আজ সেখানে গেলে দেখা যায়, ধুলায় ধূসর হয়েছে তার গর্বোদ্ধত শির। যে ধুলার বিছানায় পড়ে আছে কঙ্কালসার মুর্শিদাবাদের জরাজীর্ণ মৃতদেহ, সেই ধুলার সঙ্গে কিন্তু মিশিয়ে আছে সুদূর এবং নিকট অতীতের কত মানুষের স্মৃতি!

হিন্দুদের হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক, মহীপাল, রানি ভবানী ও মোহনলাল এবং মুসলমানদের হোসেন সা, মুর্শিদকুলি খাঁ, আলিবর্দি খাঁ, মিরমদন—

এবং সিরাজদ্দৌলা।

মিরজাফর ও মিরকাসিম বাংলায় নকল নবাবির অভিনয় করেছিলেন মাত্র। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হচ্ছেন সিরাজদ্দৌলা।

কয়দিনই বা তিনি সিংহাসনে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন! তাঁর মৃত্যু হয় মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে। কিন্তু এর মধ্যেই তাঁর নাম করেছে অমরত্ব অর্জন। কারণ? তিনি ছিলেন স্বাধীনতা-যজ্ঞের পুরোহিত।

বালক সিরাজের ছিল যথেষ্ট বালকতা, প্রচুর দুর্বলতা। সেজন্যে তাঁর নামে শোনা যায় অনেক কুৎসা। কিন্তু সেই নিন্দার খোলস থেকে মুক্ত করে নিলে আমরা যে সিরাজের দেখা পাই, তিনি হচ্ছেন সোনার বাংলার খাঁটি ছেলে। দেশ মাতৃকার পায়ে পরাবার জন্যে যখন ফিরিঙ্গি দস্যুরা শৃঙ্খল প্রস্তুত করছিল এবং যখন সেই অপকর্মে তাদের সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিল হিন্দু ও মুসলমান দেশদ্রোহীর দল, সিরাজ তখন তাদের বাধা দিয়েছিলেন প্রাণপণে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পণরক্ষা করতে পারলেন না, তাঁকে দিতে হল প্রাণ।

এই প্রাণদান, এই আত্মদানের জন্যেই সিরাজের নাম আজ মহনীয়, বরণীয় এবং স্মরণীয়। স্বদেশের জন্যে সিরাজ দিয়েছিলেন বুকের শেষ রক্তবিন্দু।

এই জন্যেই সিরাজের সব দোষ ভুলে লোকে আজও তাঁর জন্যে চোখের জল ফেলে পরমাত্মীয়ের মতো এবং এইজন্যেই সিরাজের মৃতদেহ আজও যেখানে ধুলার সঙ্গে ধুলা হয়ে মিশিয়ে আছে, একদিন আমি সেখানে ছুটে গিয়েছিলুম তীর্থযাত্রীর মতো।

সেখানে গিয়ে কানে শ্রবণ করলুম অতীতের গৌরববাহিনী বাণী, প্রাণে অনুভব করলুম স্মৃতির চিতাগ্নিজ্বালা, মানসচোখে দর্শন করলুম পলাশির রক্তাক্ত দুঃস্বপ্ন।

আগে সেই কথা বলব।

॥ দুই ॥

পনেরো বৎসর আগেকার কথা।

এক সাহিত্যিক বন্ধুর আমন্ত্রণে প্রথমে জিয়াগঞ্জে গিয়ে উঠলুম। জিয়াগঞ্জকে মুর্শিদাবাদের শহরতলি বলা যায়।

তারপর সেখান থেকে গঙ্গাজলে নৌকা ভাসিয়ে চললুম খোসবাগের দিকে, সেখানেই আছে সিরাজদ্দৌলার সমাধি। আমার সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক।

নৌকা ভাসছে গঙ্গানদীতে, না কোনও ছোটো খালের জলে? স্থানে স্থানে শিশুরাও পায়ে হেঁটে গঙ্গা পার হয়ে যায়, এ আমি স্বচক্ষে দেখলুম। স্রোতের নাম-গন্ধও নেই। এ গঙ্গার একটিমাত্র গুণ, কলকাতার মতো জল এখানে পঙ্কিল নয়। সমুদ্রনীল স্বচ্ছ জল, তলা পর্যন্ত দেখা যায়। স্পঞ্জের মতো দেখতে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যাওলা ভাসে। গঙ্গার তলদেশে বার বার দৃষ্টিচালনা করেও কোনও ছোটো-বড়ো জলচর জীব আবিষ্কার করতে পারলুম না। শুনলুম কেবল বর্ষাকালেই এখানকার গঙ্গা আবার হয়ে ওঠে বেগবতী স্রোতস্বতী।

গঙ্গাতীরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে ধ্বংসস্তূপ আর ধ্বংসস্তূপ আর ধ্বংসস্তূপ। কেবল তীরে নয়, নদীগর্ভেও ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় যেখানে সেখানে। বোঝা গেল, যেখান দিয়ে আমাদের নৌকা বয়ে যাচ্ছে, আগে সেখানেও ছিল মানুষের বসতি।

সঙ্গীরা দেখিয়ে দিলেন—ওই জগৎ শেঠের ভিটে!

জগৎ শেঠ? সারা ভারতে অদ্বিতীয় ধনকুবের বলে খ্যাতি যাঁর ছড়িয়ে পড়েছিল, টাকার দরকার হলে যাঁর কাছে হাত পাততেন নবাব-বাদশারাও, যাঁর প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল মুর্শিদাবাদের অন্যতম প্রধান গৌরব—সেই মহীয়ান জগৎ শেঠের বাস্তুভিটা?

কিন্তু কোনও প্রাসাদই চোখে পড়ল না। কেবল গঙ্গাতীরে এবং গঙ্গানীরে দেখা গেল একটা ভাঙা স্তূপের খানিক খানিক অংশ। এখানে একটা গোরু, ওখানে একটা কুকুর এবং এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে কী একটা পাখি।

দেশকে বিদেশিদের হাতে তুলে দেবার সময়ে হিন্দুদের মধ্যে প্রধান চক্রী ছিলেন এই জগৎ শেঠ। তিনি বার বার চক্রান্ত করেছিলেন বাংলার তিন নবাবের বিরুদ্ধে—সরফরাজ, সিরাজদ্দৌলা এবং মিরকাসিম। অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ তাঁকে মুঙ্গেরের

গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা হয়—সেটা হচ্ছে মানুষের প্রতিশোধ। তারপর এখানে তাঁর প্রাসাদও গঙ্গাগর্ভে লাভ করেছে সলিলসমাধি—এটা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ। জগৎ শেঠের নিঃস্ব বংশধররা আজ উদরান্নের জন্যে পরমুখাপেক্ষী, তাঁর বিপুল বিত্তের এক কপর্দকও আর বিদ্যমান নেই, কিন্তু ইতিহাসে অমর হয়ে আছে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্য কাহিনি।

আবার শুনলুম—ওই নবাব আলিবর্দির টাঁকশাল! ইতিহাসে লেখে, নবাবের টাঁকশালের অস্তিত্ব ছিল জগৎ শেঠের প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যেই। সেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছে দু-তিনটে জীর্ণ দেওয়াল—তাদের উপরে নেই ছাদের আবরণ।

আবার শোনা গেল—ওই সিরাজদ্দৌলার প্রমোদশালা! সিরাজদ্দৌলা ছিলেন বৃদ্ধ আলিবর্দির নয়নের মণি। দাদুর কাছে আবদার ধরে রাশি রাশি টাকা ফেলে তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে যে রম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, হিরা ঝিলের স্বচ্ছ জলে সে দেখত তার নিজের প্রতিচ্ছবি। সিরাজের পতনের পরে ক্লাইভের সঙ্গে মিরজাফর এসে এই প্রাসাদের মধ্যেই বাংলার মসনদে আরোহণ করেছিলেন।

কিন্তু আজ বুজে গিয়েছে সে হিরা ঝিল। বাংলার শূন্য মসনদ স্থানান্তরিত। প্রমোদশালার বদলে দেখলুম পুঞ্জীভূত রাবিশ!

যদুপতির সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে মথুরাপুরী এবং শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে অযোধ্যা ধাম। এখানেও হয়েছে সেই মহাকাল নাটকের পুনরাভিনয়।

॥ তিন ॥

নৌকা ভিড়ল কূলে। সূর্য তখন অস্তগত। শেষ-বেলার আলো করছে পালাই পালাই।

অন্তরের মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতাকে অনুভব করতে করতে অগ্রসর হলুম খোসবাগের সমাধিমন্দিরের দিকে।

নদীর বালুকাশয্যার পরেই বনজঙ্গল। তার মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে এলোমেলো এবড়ো-খেবড়ো ধুলোয় ধুলোয় ধূলিময় সংকীর্ণ পথ। চারিদিক নির্জন—জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সেদিন চতুর্দশী—এখনও চাঁদের উঁকি মারবার সময় হয়নি।

ভরসন্ধ্যাবেলায় বিজন আলো-আঁধারিতে মনের মধ্যে জমে উঠল কেমন এক আনন্দহীনতা। ভারাক্রান্ত প্রাণে উপস্থিত হলুম বাংলার শেষ নৃপতির শেষশয্যাগৃহের সামনে।

ছোটো একখানা বিশেষত্বহীন বাড়ি, নেই কোনও ঐশ্বর্যের জাঁকজমক। আগ্রায়, লক্ষ্ণৌয়ে এবং অন্যান্য স্থানে নবাব-বাদশা—এমনকি উজির ও রাজকর্মচারীদেরও সমাধি-মন্দিরের

সমৃদ্ধির তুলনায় এ বাড়িখানিকে নগণ্য বলেই মনে হয়। এখানে যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে একটা করুণ থমথমে ভাব। সিরাজের রক্তাক্ত অন্তিম মুহূর্তের কথা স্মরণ হয়, থেকে থেকে শিউরে ওঠে মন।

চারিদিকে মৃত্যুর স্তব্ধতা। পাখিরাও নীড়ে ফিরে বোবা হয়ে আছে অন্ধকারের ভয়ে। সন্ধ্যার কালিমা ঘন হয়ে উঠলে কোনও পথিকও বোধ করি এই শবস্থানের ত্রিসীমানায় পদার্পণ করে না। এমনকি বার বার ডাকাডাকি করেও এখানকার প্রহরীরও সাড়া পাওয়া গেল না। সে-ও রাত হবার আগে এখান থেকে সরে পড়ে নাকি! এখান থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় পৃথিবীর জীবনের স্পন্দন! কেবল চিরন্তন ঝিল্লির ঝিমঝিম শব্দে ধ্বনিত হয়ে ওঠে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি শোকার্ত দিনের ভগ্ন কণ্ঠস্বর!

ফটকে ধাক্কা মারতেই নিস্তব্ধতাকে সহসা মুখর করে তুলে খুলে গেল দরজাটা এবং আমরা প্রবেশ করলুম সেই অরক্ষিত সমাধিমন্দিরের ভিতরে।

এধারে ওধারে ফুলগাছদের ভিড়, তারই মাঝখান দিয়ে পথ। অত্যন্ত সুলভ ও সাধারণ সব ফুলগাছ, আভিজাত্য নেই বলে যারা ধনীদের বাগানে ঠাঁই পায় না। হোক তারা সুলভ ও সাধারণ, তবু আমি তাদের অভিনন্দন দি। কারণ এখনও তারাই এখানে জাগিয়ে রেখেছে বিগত নবাবি বর্ণবাহারের রঙ্গিলা স্মৃতিটুকু। এই বিশ্বাসঘাতকতার দেশে অমূল্য তাদের কর্তব্যপরায়ণতা।

নবাববংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিদেরও দেহ এখানে শায়িত আছে ধরাশয্যায়। তাঁদের সমাধি দেখলুম মুক্ত আকাশের তলায়।

বাইরে তখন ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া। প্রধান সমাধিগৃহের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলুম নীরন্ধ্র অন্ধকার।

এতটা আশা করিনি। শুনেছি সিরাজের সাধ্বী সহধর্মিণী লুৎফউন্নিসা যত দিন বেঁচেছিলেন, প্রতিদিন নিজে এসে স্বামীর সমাধিকক্ষে স্বহস্তে জ্বেলে দিয়ে যেতেন সোনার সন্ধ্যাপ্রদীপ। বাংলা দেশের কোটি কোটি মানুষের বিপুল জনতার মধ্যে একমাত্র তাঁরই আত্মা সিরাজকে স্মরণ করত একান্ত শ্রদ্ধাভরে।

লুৎফউন্নিসার পরলোকগমনের পরেও বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার সমাধি যাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে না থাকে, সেইজন্যে পরম করুণাময় ইংরেজ সরকার প্রভূত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেছিলেন। রাত্রে আলো জ্বালবার জন্যে বরাদ্দ হয়েছিল মাসিক চারি আনা তাম্রখণ্ড!

আমরা কিন্তু সেটুকু উদারতারও প্রমাণ পেলুম না। সমাধিঘরের মধ্যে নেই একটিমাত্র মাটির পিদিমেরও টিমটিমে আলোর শিখা! ঘুটঘুটে আঁধার রাতে এই অশরীরী আত্মার স্মৃতিসৌধে একলা এসে দাঁড়ালে আমার মন হয়তো হত আতঙ্কগ্রস্ত, হয়তো সাহস সঞ্চয়

করে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতেই পারতুম না, হয়তো বাহির থেকেই সিরাজের উদ্দেশে কুর্নিশ জানিয়ে এখান থেকে সরে পড়তুম তাড়াতাড়ি।

কিন্তু দলে আমরা হালকা ছিলুম না। এবং আমাদের কারুর কারুর পকেটে ছিল দিয়াশলাইয়ের বাক্স। কাঠির পর কাঠি জ্বেলে অন্ধকারকে আংশিকভাবে তাড়িয়ে যতটা সম্ভব চারিদিক দেখে নিলুম।

একদিকে কতকটা উচ্চস্থানে রয়েছে দৌহিত্রপ্রেমিক মাতামহ নবাব আলিবর্দির অপেক্ষাকৃত মর্যাদাজনক ও মর্মরখচিত সমাধিবেদি।

তারই তলায় প্রায় সমতল জায়গায় দেখা গেল, বিলাতি মাটি দিয়ে বাঁধানো একটি দীন সমাধি—যা যে-কোনও গরিব মুসলমানের যোগ্য হতে পারে। তার একদিকে উর্দু ভাষায় কার পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু শুনলুম সেইটিই হচ্ছে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধীশ্বর সিরাজদ্দৌলার অনন্ত নিদ্রার স্থান! সমাধিটি এত ছোটো যে, তার মধ্যে বোধ করি কোনও প্রমাণ মনুষ্যদেহেরও স্থান সংকুলান হয় না। তারপরই মনে হল, এখানে সমাধিস্থ হয়েছে নিহত সিরাজের খণ্ডবিখণ্ড দেহাবশেষ।

সিরাজের পদতলে পতিব্রতা লুৎফউন্নিসার ও পার্শ্বদেশে আছে সিরাজের কনিষ্ঠ সহোদর মীর্জা মাদির সমাধি—নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্যভোগ করবার জন্যে পাষণ্ড মিরন সিরাজের সঙ্গে হত্যা করেছিল তাঁর সহোদরকেও।

কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর উদাসীনতা ও স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা একদা প্রবল পরাক্রান্ত বঙ্গেশ্বরের শোচনীয় অপমৃত্যুর পরেও বিলুপ্ত হয়নি, প্রায় দুই শতাব্দীর কাছাকাছি এসেও তা সমান জাগ্রত থেকে ধুলা-জঞ্জাল ও অন্ধকারের মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুর মতো ফেলে রেখেছে তাঁর পবিত্র সমাধিকেও। যিনি ছিলেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ প্রতীক, আধুনিক যুগ যেন তাঁকে একেবারে ভুলে যেতে চায়!

আধুনিক মানুষ ভুলতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি ভোলে না। আকাশের চাঁদ আধুনিক নয় বলেই হয়তো মনে করে রেখেছে অতীত গরিমার কথা।

সঙ্গীদের একজন সহসা সমাধিগৃহের দরজাটা টেনে ভালো করে খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন হারানিধির সন্ধান পেয়ে ঘরের ভিতরে ছুটে এসে অন্ধকারকে লুপ্ত করে ঠিক সিরাজের সমাধির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল চতুর্দশীর প্রায়-পরিপূর্ণ চন্দ্রকরলেখা! রোমাঞ্চ জেগে উঠল আমার সর্বাঙ্গে। মানুষ ভোলে, প্রকৃতি ভোলে না।

বাইরের বাগান থেকে অঞ্জলি ভরে ফুল তুলে এনেছিলুম। আলোকের আশীর্বাদে সমুজ্জ্বল সিরাজের সমাধির উপরে শ্রদ্ধাভরে ছড়িয়ে দিলুম সেই ফুলগুলি।

॥ চার ॥

পরদিন পলাশির প্রান্তর দিয়ে রেলগাড়ি যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে, কামরার জানলার কাছে বসে মানসনেত্রে দেখলুম এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য....

ধু ধু করছে পলাশির প্রান্তর। প্রভাতসূর্য করছে কিরণ বিকিরণ। গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছলিত হয়ে উঠছে স্বর্ণাভ রৌদ্র। আম্রকানন এক লক্ষ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। তারই সামনে ইংরেজদের সেনাদল। দলে তারা ভারী নয়—সংখ্যায় তিন হাজার দুই শত জন মাত্র।

পলাশি গ্রামের সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ছাউনির ভিতর থেকে কাতারে কাতারে বাংলার সৈন্য প্রান্তরের উপরে বেরিয়ে আসতে লাগল—সংখ্যায় তারা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। প্রান্তরের দুই মাইল ব্যাপী স্থান আচ্ছন্ন করে নবাবি সৈন্যরা রচনা করলে অর্ধচন্দ্র ব্যূহ। সেই ব্যূহ অগ্রসর হয়ে ইংরেজদের ফৌজকে ঘিরে ফেলতে পারে অনায়াসেই, তখন গঙ্গাজলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় থাকবে না। ইংরেজদের পক্ষে বাধা দেওয়া অসম্ভব—পঞ্চাশ হাজারের বিরুদ্ধে তিন হাজার!

ঘোর নির্ঘোষে বেজে উঠল কাড়া-নাকাড়া, সদর্পে উড়তে লাগল বাংলার পতাকা, আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে গেল বাঙালি বীরদের বিজয়হুঙ্কারে।

চোখের সামনে জেগে উঠল দুই নায়কের অশ্বারোহী ও অস্ত্রধারী দৃপ্ত মূর্তি—মিরমদন ও মোহনলাল।

দেখলুম তরুণ সিরাজকে। মিরজাফরকে তিনি মিনতি করছেন এবং বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর তাঁকে দিচ্ছেন শূন্যগর্ভ মৌখিক আশ্বাস।

আম্রকাননের সামনে দেখলুম মসীজীবী অসিধারী জালিয়াত ক্লাইভকেও। নবাবের বৃহতী বাহিনীর রণহুঙ্কার শ্রবণ করে বক্ষ তাঁর কেঁপে কেঁপে উঠছে মুহুর্মুহুঃ। বিপক্ষ সৈন্যসাগরে তাঁর নগণ্য ফৌজ তলিয়ে যাবে ক্ষুদ্র তটিনীর মতো। তাঁর একমাত্র আশা বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের নিশ্চেষ্টতা। মিরজাফর যদি সিরাজকে সাহায্য করেন, তাহলে তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

বাংলার গোলন্দাজরা কামানের পর কামান দাগতে শুরু করলে—ঘন ঘন বজ্রনাদ, হু হু করে ছুটে আসে নিরেট অগ্নিপিণ্ড, লুটিয়ে পড়ে মরণাহত ইংরেজ সৈন্য। আধ ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশজন ইংরেজ সৈন্য নিহত ও আহত!

ক্লাইভ প্রমাদ গুণে [illegible]কার করে হুকুম দিলেন—'আর এ ফর্দা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা নয়! পিছিয়ে পড়ো—সবাই পিছিয়ে পড়ে আম্রকুঞ্জে আশ্রয় নাও!'

ইংরেজরা বেগে আমবাগানের ভিতরে পালিয়ে গেল—আত্মগোপন করলে বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ির আড়ালে।

তারপরেই আচম্বিতে আকাশ ভেঙে বজ্রপাত এবং ধারাপাত। ঘনবর্ষণে পলাশির মাঠ হয়ে উঠল বিশাল জলাভূমির মতো।

সমস্ত বারুদ ভিজে স্যাঁৎসেঁতে। নীরব হয়ে গেল সিরাজের অগ্নিহীন কামানগুলো!*

নিজেদের কামানগুলো অকর্মণ্য দেখে বীর মিরমদন কিছুমাত্র দমলেন না। তিনি ভাবলেন, বৃষ্টিপাতের ফলে তাঁদের মতো ইংরেজদেরও সমস্ত বারুদ ভিজে গিয়েছে। অতএব তাঁর আদেশে নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যদল মহাবিক্রমে ইংরেজদের আক্রমণ করবার জন্যে অগ্রসর হল।

কিন্তু না, ইংরেজদের বারুদ ভিজে যায়নি, তারা বুদ্ধিমানের মতো বারুদের স্তূপ ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। তাদের কামানের গোলাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণোদ্যত নবাব সৈন্যদের উপরে গিয়ে পড়তে লাগল। সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে সেনানায়ক মিরমদন বীরের মতো প্রাণ দিলেন সম্মুখসমরে।

তখনও ইংরেজরা আমবাগান ছেড়ে বাইরে মুখ বাড়াতে সাহস করলে না, কারণ তখনও ব্যাঘ্র-বিক্রমে যুদ্ধ করছে কাশ্মীরি হিন্দু মোহনলালের অধীনস্থ সৈন্যগণ এবং নবাবের বৈতনিক ফরাসি সৈনিকরা।

কিন্তু অবশেষে বেইমান মিরজাফর ও রায়দুর্লভ প্রমুখ শয়তানরাই করলে বাংলার সর্বনাশ। প্রায় আটত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এতক্ষণ তারা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অচল কাঠের পুতুলের মতো। এখন চুপিচুপি দূত পাঠিয়ে ক্লাইভকে আক্রমণ করবার পরামর্শ দিয়ে বিশ্বাসঘাতী মিরজাফর প্রভৃতি সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগলেন।

তারপর?

তারপর আমার মানসনেত্র হল অশ্রুবাষ্পাকুল, আর কিছু দেখতে পেলুম না। তারপরের কথা লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়, কিন্তু তা আর এখানে পড়ে শোনাবার দরকার নেই, কারণ আজ আমি বলতে বসেছি সেই বালক-বীর বিজেতা সিরাজের কাহিনি, যিনি বিজাতীয় ফিরিঙ্গি বণিকদের স্পর্ধা সহ্য করেননি, তাদের কলকাতা থেকে দূর করে দিয়ে তবে ছেড়েছিলেন।

---

*অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছিল ইউরোপের ওয়াটার্লু যুদ্ধক্ষেত্রে—যেখানে ফরাসি নেপোলিয়ন হারেন, ইংরেজ ওয়েলিংটন জেতেন। ভিক্টর হিউগো বলেন—'ফরাসিরা হেরে গিয়েছিল খালি কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্যে। হঠাৎ বর্ষা নেমে যদি ফরাসিদের বারুদের গাদা ভিজে না যেত, তবে জার্মান সেনাপতি ব্লুচার নূতন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হবার অনেক আগেই ওয়েলিংটন হেরে ভূত হয়ে যেতেন।' নেপোলিয়নের প্রচণ্ড আক্রমণে কাবু হয়ে প্রায় হাল ছেড়ে ওয়েলিংটন আকুলভাবে বলে উঠেছিলেন—'হয় রাত্রি আসুক, নয় আসুক ব্লুচার, হে ভগবান!' এবং ব্লুচার এসে ইংরেজদের মান ও প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। ক্লাইভও পালিয়ে গিয়ে আমবাগানে লুকিয়ে রাত্রি কিংবা মিরজাফরের সাহায্যের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন। পলাশিতেও বৃষ্টি এসে সিরাজের বারুদের গাদা ভিজিয়ে না দিলে এবং মিরজাফর বিশ্বাসহন্তা না হলে ইংরেজদের জয়লাভের কোনও আশাই ছিল না।

॥ পাঁচ ॥

যেমন অনেক দাগি অপরাধী পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে বাইরে নিরীহ দোকানি সেজে দোকান চালায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে করে চুরি ও রাহাজানি, এদেশে এসে ইংরেজরাও সেই নীতিই অবলম্বন করেছিল।

বাইরে তারা নির্বিরোধী বণিক ছাড়া যেন আর কিছুই নয়। বাজারে নিজেদের মাল বেচে কিছু লাভের সাত সাগরে পাড়ি দিয়ে তারা এ দেশে আসে এবং ধরনধারণে জাহির করে, যেন তারা নবাব-বাদশার দাসানুদাস।

কিন্তু তলে তলে তাদের আসল ফন্দি ছিল—'ছুঁচ হয়ে ঢুকব, ফাল হয়ে বেরুব।'

একটি বিখ্যাত গল্প আছে। আরব দেশের মরুভূমিতে তাঁবু খাটিয়ে বাস করত এক বেদুইন।

দুপুরের ঝাঁঝালো রোদে পুড়ে মরুবালু আগুন হয়ে উঠেছে। এমন সময়ে একটা উট ধুঁকতে ধুঁকতে এসে বললে, 'মহাশয়, রোদের তাপে প্রাণ যায়। আপনার এই তাঁবুর ছায়ায় মাথাটা একটু গলিয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেব কি?'

বেদুইন দয়াপরবশ হয়ে বললে, 'আচ্ছা।'

অল্পক্ষণ পরে উট বললে, 'মহাশয়, মাথা তো বাঁচল, কিন্তু বুক যে জ্বলে যায়! তাঁবুর ভিতরে বুক পর্যন্ত রাখতে পারব কি?'

বেদুইন বললে, 'আচ্ছা।'

খানিক বাদে উট বললে, 'মহাশয়, মাথা আর বুক তো ঠান্ডা হল, কিন্তু দেহের বাকি অংশ যে ঝলসে যাচ্ছে। ওটুকুকে আর বাইরে রাখি কেন?'

বেদুইন বললে, 'আচ্ছা ভিতরে এসো।'

উট নিজের গোটা দেহ নিয়ে তাঁবুর ভিতরে ঢুকল। ছোট্ট তাঁবু, একসঙ্গে উট আর বেদুইনের ঠাঁই হল না। অতএব উটকে ভিতরে রেখে বেদুইনকেই বেরিয়ে যেতে হল তাঁবুর বাইরে।

এ দেশে এসে ফিরিঙ্গি বণিকরাও অবলম্বন করেছিল তথাকথিত উষ্ট্রনীতি।

প্রথমে তারা বিবিধ পণ্য নিয়ে এখানে পদার্পণ করে। কিছু কিছু জমি ইজারা নেয়। মাথা রাখবার জন্যে ঘরবাড়ি বানায়। তারপর নানা অছিলায় দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করতে থাকে। তারপর ক্রমে ক্রমে ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে।

কিন্তু ধূর্ত ফিরিঙ্গি বণিকরা নবাব-বাদশাদের চোখে ধুলো দিতে পারেনি।

পর্তুগিজরা যখন হুগলিতে অন্যায় রূপে প্রবল হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছিল, তখন ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট সাজাহান সৈন্য পাঠিয়ে দেন তাদের উৎখাত করবার জন্যে। মোগল

সাম্রাজ্যের সেই পূর্ণগৌরবের যুগেও পর্তুগিজরা সহজে বাগ মানেনি। জলপথে ও স্থলপথে মোগলদের তারা প্রাণপণে বাধা দেয়। প্রায় তিন মাস ধরে লড়াই করে মোগলদের ঠেকিয়ে রেখে অবশেষে পর্তুগিজরা পরাজয় স্বীকার করে। তাদের বন্দি করে আগ্রায় সাজাহানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বন্দিদের কেউ কেউ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে মুক্তি পায়, কিন্তু অধিকাংশই ভোগ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এই ব্যাপারের পর থেকে বাংলা দেশে শক্তি হিসাবে পর্তুগিজদের বিষদাঁত একেবারে ভেঙে যায়।

পর্তুগিজদের পর ইংরেজদের পালা। কিন্তু অনেক আগেও ইংরেজরা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির অনুসরণ করতে ছাড়েনি। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দেও শায়েস্তা খাঁর আমলে ইংরেজরা একবার হিজলি নামক স্থানে মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। তারপর ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে নানা গোলযোগের সুযোগে তারা কলকাতায় পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করে। তারপর নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের আর কোনও নূতন দুর্গ নির্মাণ করতে নিষেধ করে দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইংরেজরা বাংলা দেশে প্রধান হয়ে ওঠবার চেষ্টা করে। মোগল বাদশাহের রাজশক্তি তখন যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে দেখে ইংরেজরা সাহস পেয়ে বাংলা দেশে আবার কেল্লা তৈরি ও ফৌজ গঠন করতে চায়।

কিন্তু নবাব আলিবর্দিও নির্বোধ নন। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি দেখেছিলেন, ফরাসি ফিরিঙ্গি দুপ্লে ঠিক ওই উপায়েই দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসকদেরও চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। ইংরেজদের ডেকে তিনি বলেন, 'তোমরা হচ্ছ সওদাগর, তোমাদের আবার কেল্লার দরকার কী? আমিই যখন তোমাদের রক্ষা করবার ভার নিয়েছি, তখন আর কোনও শত্রুকেই তোমাদের ভয় করবার দরকার নেই।'

আলিবর্দির জীবদ্দশাতেই সিরাজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। অল্পবয়সেই তিনি রাজ্যচালনার কূটকৌশল কিছু কিছু আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন এবং মাতামহের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন একাধিক রণক্ষেত্রে। রীতিমতো বালকবয়সেই সিরাজ পেয়েছিলেন সেনাচালনার ভার। মুতাক্ষেরীন পাঠে বোঝা যায়, রণক্ষেত্রে শত্রুর সামনে নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে সিরাজ যাতে সৈন্যচালনায় দক্ষ হতে পারেন, সেই উদ্দেশেই আলিবর্দি তাঁর উত্তরাধিকারী দৌহিত্রকে দিয়েছিলেন উপযোগী শিক্ষালাভের সুযোগ।

হলওয়েল বলেন, আলিবর্দি তাঁর মৃত্যুশয্যায় নাকি সিরাজকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, বাংলাদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে। আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন, এ উক্তির কোনও প্রমাণ নেই। প্রমাণ থাক আর না থাক, আলিবর্দি যে ইংরেজদের সুনজরে দেখতেন না, এটা সিরাজের অবিদিত থাকবার কথা নয়। তার উপরে বাল্যকাল থেকেই ফিরিঙ্গিরা ছিল তাঁর চোখের বালি। তিনি বলতেন, 'ফিরিঙ্গিদের শাসন করবার জন্যে দরকার কেবল একজোড়া চটিজুতো।'

এই সিরাজ সিংহাসনের অধিকারী হয়েছেন বলে কলকাতার ইংরেজরা দস্তুরমতো তটস্থ হয়ে উঠল।

॥ ছয় ॥

সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের ঝগড়া বাধল কেন? এর উত্তরে দেখানো যায় একাধিক কারণ।

রাজা রাজবল্লভ ছিলেন ঢাকার একজন পদস্থ রাজকর্মচারী। তহবিল তছরুপাতের অভিযোগে তিনি কারারুদ্ধ হন। সেই খবর পেয়ে তাঁর পুত্র কৃষ্ণবল্লভ পিতার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে গোপনে কলকাতায় পালিয়ে যান এবং ইংরেজরাও তাঁকে আশ্রয় দিয়ে করে অন্যায়কে সমর্থন।

এই বে-আইনি কার্যের প্রতিবাদ করে সিরাজ কলকাতায় ইংরেজদের কাছে দূত প্রেরণ করেন। উদ্ধত ইংরেজরা দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়।

দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে অতিশয় গুরুতর। আলিবর্দির নির্দেশ ছিল, ইংরেজরা আর কোনও নূতন কেল্লা তৈরি করতে পারবে না এবং ইংরেজরাও মেনে নিয়ে ছিল এই নির্দেশ।

কিন্তু গুপ্তচরের মুখে সিরাজ খবর পেলেন, ইংরেজরা কেবল কলকাতার পুরাতন দুর্গেরই সংস্কার করছে না, বাগবাজারের খালের ধারে একটি নূতন উপদুর্গও নির্মাণ করেছে। শর্ত অনুযায়ী ইংরেজরা এ কাজ করতে পারে না এবং এটা হচ্ছে নবাবের তাঁবেদার হয়েও তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা। কোনও স্বাধীন নৃপতিই এমন অপমান সহ্য করতে পারেন না।

সে-সময়ে সিরাজের হাত ছিল জোড়া। তাঁর আত্মীয় পূর্ণিয়ার নবাব সওকত জং তখন বিদ্রোহী হয়েছেন, নিজেকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধীশ্বর বলে ঘোষণা করেছেন। আগে এই বিদ্রোহ দমন করা দরকার। অতএব শর্তভঙ্গ করার জন্যে প্রতিবাদ করে ইংরেজদের কাছে এক দূত পাঠিয়ে সিরাজ মুর্শিদাবাদ থেকে সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন সওকতের নবাবির স্বপ্ন পণ্ড করে দেবার জন্যে।

যথাসময়ে কলকাতায় গিয়ে উপস্থিত হল সিরাজের দূত। ড্রেক ছিলেন তখন কলকাতার গভর্নর। নির্বোধের মতো তিনি দেখালেন মেজাজ। নবাবের অধীন হয়েও ব্যবহার করলেন স্বাধীন রাজার মতো। তিনি পিয়নদের হুকুম দিলেন 'নবাবের দূতকে কলকাতা থেকে দূর করে দাও।' তাই হল।

সিরাজ তখন যুদ্ধযাত্রা করে রাজমহলের পথ ধরেছেন। দূত যে কলকাতা থেকে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে, তাঁর কানে উঠল এ খবর।

সিরাজের ক্রোধের আর সীমা রইল না। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় একদল বিদেশি সওদাগর পদে পদে যদি নবাবের আদেশ লঙঘন ও তাঁকে অপমান করতে সাহস পায়, তবে তাঁর মান-মর্যাদা থাকে কোথায়?

সওকত জং দেখুক আরও দু-দিন নবাবির স্বপ্ন, আগে ফিরিঙ্গিদের দর্পচূর্ণ করে তবে অন্য কাজ।

সিরাজ সেনানীদের হুকুম দিলেন, 'আপাতত ফৌজের মুখ ফেরাও। কলকাতায় চলো, আগে কলকাতায় চলো!'

কলকাতার পথে পড়ে কাশিমবাজার। সেখানে আছে ইংরেজদের কুঠি ও কেল্লা। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে জুন তারিখে সেইখানে সিরাজের প্রথম সংঘর্ষ হয় ইংরেজদের সঙ্গে। কিন্তু সে সংঘর্ষ নামমাত্র। নবাবের সৈন্যরা অবলীলাক্রমে কেল্লা দখল করে ফেললে। কুঠি হল লুণ্ঠিত। বেশির ভাগ ইংরেজ হল গ্রেপ্তার। কেউ কেউ দিলে পিঠটান—তাদের মধ্যে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংশ।

কাশিমবাজারে ছিলেন কান্তবাবু। লোকে তাঁকে 'কান্তমুদি' বলেও ডাকত, কারণ তাঁর একখানি মুদির দোকান ছিল। হেস্টিংস চম্পট দিয়ে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, তিনিও তাঁকে নিজের বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন। হেস্টিংস এ উপকার ভোলেননি। পরে তিনি যখন হন এ দেশে ইংরেজদের সর্বেসর্বা, কান্তবাবুকে বহু সম্পত্তি দিয়ে রাজ-উপাধিতে ভূষিত করেন। কাশিমবাজারের মহারাজারা কান্তবাবুরই বংশধর।

সিরাজ যে রণনীতিতে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, এইবারে তারও পরিচয় পাওয়া গেল।

তিনি বুঝলেন, সংঘর্ষ যখন বেধেছে, তখন শত্রুদের আর হাঁপ ছাড়তে দেওয়া উচিত নয়। কারণ অবসর পেলেই তারা আটঘাট বেঁধে প্রস্তুত হয়ে উঠবে। তখন তাদের দমন করতে গেলে রীতিমতো বেগ পেতে হবে।

কাশিমবাজার দখল করবার পর বারো দিনের ভিতরেই সমস্ত তোড়জোড় ঠিক করে ফেলে সিরাজ দ্রুতবেগে ধাবমান হলেন কলকাতার দিকে।

সেখান থেকে কলকাতা হচ্ছে একশো ষাট মাইল। তখন রেলগাড়িও ছিল না, মোটরও ছিল না। কিন্তু বৃহৎ এক সেনাবাহিনী এবং আনুষঙ্গিক লোকজন ও প্রচুর লটবহর নিয়ে সিরাজ ঠিক এগারো দিনের মধ্যেই সেই একশো ষাট মাইল পথ পার হয়ে উপস্থিত হলেন কলকাতার উপকণ্ঠে।

ইংরেজদের বুক কেঁপে উঠল। সিরাজের এমন সংহার মূর্তি, এমন ঝড়ের গতি তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি।

কলকাতায় সাজ সাজ রব উঠল।

কিন্তু শিয়রে শত্রু, সাজবার ফুরসত কোথায়?

নবাব বলতে বুঝায় তো মূর্তিমান বিলাসিতা—কাজকর্মে জড়ভরত। নবাব যে এমন দেখবার-বোঝবার আগে চিলের মতো হুস করে কলকাতার উপরে ছোঁ মারবেন, কারুর হিসাবে এটা আসেনি। ইংরেজরা ভেবেছিলেন, চোখ রাঙিয়ে আর বাক্যবীরত্ব দেখিয়েই সিরাজকে একেবারে দমিয়ে দেবেন—কিন্তু এখন এ যে উলটা বুঝিলি রাম!

ইংরেজদের সৈন্যসংখ্যা মোট চারি শত ত্রিশজন—তার মধ্যে খালি ইংরেজ নয়, পর্তুগিজ, আর্মেনিয়ান ও ইউরেসিয়ান বা ট্যাস-ফিরিঙ্গিরাও আছে। মতান্তরে ইংরেজদের দলে ছিল পাঁচশো পনেরো জন লোক।

ইংরেজদের তখন ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দারের মতো অবস্থা। পুরাতন দুর্গের প্রাচীর নড়বড়ে, তারই উপরে বসানো আছে কতকগুলো সেকেলে মরচে ধরা কামান। বারুদ স্যাঁৎসেঁতে ও অকেজো।

১৬ই জুন তারিখে নবাবসৈন্যরা বাগবাজারে খালের ধারে নূতন উপদুর্গ আক্রমণ করলে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারলে না, তবে অনেক সেপাই নানা জায়গায় খাল পার হয়ে শহরের ভিতরের এসে পড়ল।

ইংরেজরা স্থির করলে তারা খালি সাহেবপাড়ায় (লালদিঘির পূর্ব ও দক্ষিণ দিক) থেকে নবাবসৈন্যদের বাধা দেবে। তারা আগুন ধরিয়ে দিলে দেশিপাড়ায়, সে আগুন নিবতে লেগেছিল অনেকক্ষণ। ইউরোপিয়ানদের স্ত্রী-পুত্র ও কন্যা প্রভৃতিও দুর্গের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে।

সব চেয়ে কাহিল অবস্থা হল ইউরেশীয়ান বা ট্যাস-ফিরিঙ্গিদের। ইংরেজরা তাদের আমল দেয় না এবং ভারতীয়দের দলেও তারা ভিড়তে পায় না। কাজেই তাদের হাল হল অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মতো।

অবশেষে নবাবি সেপাইদের ভয়ে দলে দলে ইউরেশীয় স্ত্রী-পুরুষ দুর্গদ্বারে গিয়ে ধরনা দিতে বাধ্য হল। ইংরেজরা দুর্গদ্বার খুলে তাদের আশ্রয় নিতে নারাজ। কিন্তু তাদের কাতর ক্রন্দন এমন গগনভেদী হয়ে উঠল যে, অবশেষে তাদের জন্যেও দুর্গদ্বার খুলে দিতে হল।

ইতিমধ্যে সিরাজও কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। সিমলা অঞ্চলে ছিল আমিরচাঁদের বাগান, তাঁর আস্তানা হল সেইখানেই।

মেটেবুরুজেও ইংরেজদের থানা ফোর্ট নামে এক দুর্গ ছিল। ইংরেজদের তাড়িয়ে নবাবি ফৌজ সেই দুর্গ কেড়ে নিলে।

১৮ই তারিখে কলকাতার উপর প্রধান আক্রমণ শুরু হল। নবাবি ফৌজ এল দুই দিক

থেকে—শিয়ালদা ও পূর্ব এসপ্লানেড। তারা ইংরেজদের দ্বারা পরিত্যক্ত বাড়িগুলো দখল করে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের উপরে এমন প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টি শুরু করলে যে, ইংরেজদের কামানগুলো হল নীরব—তারা কামানের মায়া ছেড়ে পাততাড়ি গুটিয়ে একেবারে দুর্গের অন্দরমহলে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

সেই রাত্রেই অধিকাংশ নারীকে জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দুর্গরক্ষীদের অবস্থা শোচনীয়, তাদের দেহ শ্রান্ত উপবাসক্লিষ্ট—কারণ পাচকরা পলায়ন করেছে, খাবার রাঁধবার জন্যে কেউ নেই। তার উপরে গোলা-গুলি-বারুদও ফুরিয়ে এসেছে। যে গভর্নর ড্রেকের জন্যে এই বিপদ, তিনি তল্পিতল্পা গুটিয়ে লম্বা দিতে চাইলেন।

পরদিনের (১৯শে জুন) অবস্থা আরও সঙ্গীন। আর্মেনিয়ান ও ইউরেশীয়ান সৈন্যরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আর লড়াই করতে চাইলে না। ইউরোপীয় সৈন্যদেরও প্রায় সেই অবস্থা, তারা অস্ত্রধারণ করে রইল অত্যন্ত নাচার ভাবেই। অনেকেই দিশেহারা হয়ে কেল্লা ছেড়ে জাহাজে গিয়ে উঠে বসল। গভর্নর ড্রেক ও সেনাধ্যক্ষ মিঞ্চিনও প্রমাদ গুণে 'যঃ পলায়তি স জীবতি' ভেবে চটপট চম্পট দিলেন জাহাজের উদ্দেশে।

আর্মেনিয়ান ও ইউরেশীয়ানদের বাদ দিলেও দুর্গের মধ্যে তখনও সক্ষম শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধা ছিল একশো সত্তর জন। গভর্নর ও সেনাপতির কাপুরুষতা দেখে তারা খাপ্পা হয়ে উঠল। সকলে মিলে তাঁদের পদচ্যুত করে গভর্নর ও সেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করলে হলওয়েলকে।

হলওয়েল শত্রুদের বাধা দেবার শেষ চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু সফল হলেন না। নবাবের সেপাইদের অত্যুগ্র অগ্নিবৃষ্টির সামনে দুর্গপ্রাকারে তিষ্ঠানোই অসম্ভব, শ্বেতাঙ্গরা দলে দলে হল পপাত ধরণীতলে।

সেই রাত্রে দুর্গের চারিদিককার বাড়িঘর দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। ইংরেজ সৈন্যরাও তখন আর সেনানীদের হুকুম মানতে রাজি হল না, তারা মদের ভাণ্ডার লুটে বেহেড মাতাল হয়ে হই হই করে বেড়াতে লাগল। অনেক ইউরোপীয় সৈন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়ে সিরাজের পক্ষে যোগদান করলে।

পরদিন ২০শে জুন রবিবার। হলওয়েলও হাল ছাড়তে বাধ্য হলেন। গঙ্গার বুকে তখনও জাহাজের উপরে গভর্নর ড্রেক প্রভৃতি পলাতক ইংরেজরা বিরাজ করছিলেন। হলওয়েল সঙ্কেত করে তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ড্রেক ইচ্ছা করলেই নৌকা পাঠিয়ে হলওয়েল প্রভৃতিকে উদ্ধার করতে পারতেন। কিন্তু তখন তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছে, আবার এই বিপজ্জনক স্থানে এসে নবাবি গুলি হজম করবার সাহস তাঁর হল না। তারপর বীরবর বোধকরি 'চাচা আপন বাঁচা' প্রবাদেরই কথা স্মরণ করে জাহাজ নিয়ে সরে পড়লেন পলতার বন্দরের দিকে।

বেলা চারটের সময়ে নবাবের সৈন্যরা চারিদিক থেকে পাঁচিল টপকে কেল্লার ভিতরে

লাফিয়ে পড়ল। যারা বাধা দেবার চেষ্টা করলে তারা হল কচু কাটা। হলওয়েল তখন আত্মসমর্পণ করলেন সদলবলে। কলকাতার পতন হল।

কলকাতার ও বাংলার অন্যান্য জায়গায় বিলাতি কুঠি সিরাজের হস্তগত হওয়ার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু কম এক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল। সাধারণ ব্যক্তিদেরও হারাতে হয়েছিল এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা। ওলন্দাজ ও ফরাসি বণিকরাও ভয়ে ভয়ে সিরাজের হাত তুলে দিয়েছিলেন যথাক্রমে সাড়ে চারি লক্ষ ও সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

তিন দিন পরে কলকাতা জয় ও ফিরিঙ্গি দলন করে সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে বিজয়োৎসবের আয়োজন করলেন মহাসমারোহে।*

॥ সাত ॥

পুত্রহীন আলিবর্দির তিন কন্যার সঙ্গে তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ হয়েছিল। মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহম্মদ পেয়েছিলেন পূর্ণিয়ায় নবাবি করবার ভার। তিনি পরলোক গমন করবার পর তাঁর ছেলে সওকত জং হলেন পূর্ণিয়ার নবাব (১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। সেই সময়েই সিরাজ করেন মাতামহের সিংহাসনে আরোহণ।

ছোটো মাসির ছেলে সিরাজ তাঁর চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ হয়েও হবেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার

---

*আমাদের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে—সিরাজের বিজয়-অভিযান। সুতরাং অন্ধকূপ-হত্যার প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। এবং ওই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা না করবার আর একটা কারণ হচ্ছে, ও ব্যাপারটা নিয়ে ঐতিহাসিকরা পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেন। অবরুদ্ধ কলকাতার গভর্নর হলওয়েল বলেন, ঘটনাটা ঘটেছিল—১৪৬ জন ইংরেজ কারারুদ্ধ হয়েছিল অন্ধকূপের মধ্যে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং আরও কেউ কেউ (যেমন মিঃ লিটল) প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনি একেবারেই অমূলক। এই মত অনুসারেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পর্যন্ত অবশেষে কলকাতার লালদিঘি থেকে অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকার এবং আরও কারুর কারুর মতানুসারে, অন্ধকূপ হত্যা-কাহিনি হয়তো একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু হলওয়েল অত্যুক্তি করেছেন, কারণ অন্ধকূপের ২৬৭ বর্গ ফুট আয়তনের মধ্যে ১৪৬ জন ইংরেজের স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব। খুব সম্ভব বন্দি ইংরেজদের সংখ্যা ষাটজনের বেশি ছিল না।

এখানে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। অন্ধকূপ বা 'ব্ল্যাক হোল' হচ্ছে ইংরেজদেরই দ্বারা নির্মিত কারাগার। সিরাজ কখনও তা চোখেও দেখেননি, তার আয়তনের কথাও জানতেন না। বন্দি ইংরেজ সৈনিকরা মাতাল হয়ে রক্ষীদের মারধর করতে থাকে। রক্ষীরা সিরাজের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে। সিরাজ জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে ফিরিঙ্গিদের কোনও কারাগার আছে?' তারা অন্ধকূপের নাম করে। সিরাজ হুকুম দেন, মাতাল ফিরিঙ্গিগুলোকে যেন তার ভিতরে আটক করে রাখা হয়। যে ডালে বসেছিল মাতলামি করে সেই ডাল কাটতে গিয়ে দুর্বৃত্ত ইংরেজদের ঝাঁপ দিতে হয়েছিল 'স্বখাত সলিলে'ই। অন্ধকূপ হত্যা আংশিকভাবে সত্য হলেও সিরাজের উপরে কোনোই দোষারোপ করা যায় না।

সর্বময় কর্তা, এটা সওকতের মোটেই ভালো লাগল না। তাঁর ধারণা হল আলিবর্দির সিংহাসনের উপরে তাঁরই দাবি সর্বাগ্রে। তার উপর বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর তখন থেকেই সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছিলেন। তিনি সওকতকে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করবার জন্যে গোপনে প্ররোচনা দিতে লাগলেন।

সওকতও টোপ গিলতে দেরি করলেন না। তিনি দিল্লির বাদশার উজির ইমাদ-উল-মুল্ককে এক কোটি টাকা উৎকোচ দিয়ে নিজের নামে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলে ফারমান আনিয়ে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন এবং সিরাজকে সোজাসুজি জানিয়ে দিতে কসুর করলেন না যে—'ভালোয় ভালোয় সুড়সুড় করে সিংহাসন থেকে নেমে পড়ো। ঢাকায় গিয়ে আমার তাঁবে থেকে চাকরি করো।'

সওকতের দম্ভ পূর্ণ করবার জন্যেই সিরাজ সসৈন্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ইংরেজরা নিজমূর্তি ধারণ করে বলে পিছনে শত্রু রেখে তিনি পূর্ণিয়ায় যেতে পারেননি। জুন মাসে কলকাতার পতন ও ইংরেজ বিতাড়িত হল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল বাদলের ঘনঘটা। তারপর বর্ষাকাল কাটিয়ে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে সিরাজ আবার বেরিয়ে পড়লেন সদলবলে।

সওকত ছিল একেবারেই অপদার্থ জীব। তাঁর হামবড়া ভাবের জন্যে কেহই তাঁকে পছন্দ করত না। সর্বদাই তিনি নেশায় চুর হয়ে ইয়ারদের সঙ্গে নর্তকীদের নাচগান নিয়ে মেতে থাকতেন।

সিরাজের সেনাপতি রাজা মোহনলাল সর্বাগ্রে নিজের ফৌজ নিয়ে পূর্ণিয়ায় প্রবেশ করলেন। মণিহারি নামক স্থানের কাছে সওকতও সসৈন্যে এগিয়ে এলেন সিরাজকে বাধা দেবার জন্যে।

সৈন্যবলে সিরাজ ছিলেন সওকতের চেয়ে অধিকতর বলীয়ান। কিন্তু পূর্ণিয়ার ফৌজের সামনে ছিল এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি, যা উত্তীর্ণ হওয়া সহজসাধ্য নয়। কাজেই সিরাজের গোলন্দাজরা জলাভূমির এপারে দাঁড়িয়েই কামান দাগতে লাগল। সওকতের গোলন্দাজদের সেনাপতির নাম শ্যামসুন্দর, জাতে বাঙালি কায়স্থ। তিনিও দাগতে লাগলেন নিজেদের কামান।

দুই পক্ষে কামানযুদ্ধ চলছে, এমন সময়ে সওকত নিজের অশ্বারোহী সেনাদলকে অগ্রসর হবার জন্যে হুকুম দিলেন।

প্রবীণ সেনাপতিরা নারাজ। বললেন, 'ওই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে দুর্গম জলাভূমির জল-কাদা পার হবার চেষ্টা করলে আমাদের সকলকেই মারা পড়তে হবে।'

কিন্তু সওকত হচ্ছেন মস্তবড়ো সবজান্তা—যুদ্ধ না করেও সেরা যোদ্ধা। তিনি মহা খাপ্পা হয়ে সেনাপতিদের যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি দিতে লাগলেন।

সে গালাগালি দীর্ঘকাল ধরে সহ্য করতে না পেরে সেনানীরা রাগের মাথায় অশ্বারোহী ফৌজ নিয়ে জলাভূমির ভিতর দিয়েই বাংলার সৈন্যদের আক্রমণ করতে চললেন।

হাবলা সওকত জানতেন না, কত ধানে হয় কত চাল! তিনি ভাবলেন, আমার ঘোড়-সওয়াররা যখন হামলা দিতে ছুটেছে, তখন লড়াই তো ফতে হয়ে গিয়েছেই! আমি আর এখানে দাঁড়িয়ে মিছে মাথা ঘামিয়ে মরি কেন?

নিজের তাঁবুর ভিতরে ঢুকে তিনি বললেন, 'লে আও ভাং। নাচো, গাও, ফুর্তি করো!'

তাঁবুর ভিতরে চলছে যখন নবাবি ফুর্তির হুল্লোড়, জলাভূমির উপরে তখন সিরাজের কামানগুলো ঘন ঘন হুমকি দিয়ে হু হু করে ছুটিয়ে দিয়েছে অগ্নিময় মৃত্যুঝড়! পূর্ণিয়ার অশ্বারোহীরা দলে দলে হতাহত হয়ে জলাভূমিকে করে তুললে রক্তরাঙা! অবশেষে তারা আর অসম্ভবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলে না, ছত্রভঙ্গ হয়ে দিকে দিকে পলায়ন করতে লাগল।

সেনাপতিরা তখন পলায়মান সৈনিকদের আবার উৎসাহিত করবার জন্যে তাঁবুর ভিতর থেকে সওকতকে বাইরে টেনে আনলেন। কিন্তু নবাব বাহাদুরের তখন শোচনীয় অবস্থা—নেশার চোটে আর দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। সকলে মিলে ধরাধরি করে তাঁকে হাতির উপরে তুলে দিলে। কিন্তু কাকে তিনি উৎসাহিত করবেন? রণক্ষেত্রে তখন উপস্থিত আছে মাত্র পনেরো-ষোলো জন পূর্ণিয়ার সৈনিক।

শত্রুপক্ষের এক গুলিতে সওকত ইহলোক ত্যাগ করলেন সেই বেহুঁস অবস্থাতেই। মাটির উপরে পড়ে গেল নবাবের রত্নখচিত উষ্ণীষ।

মণিহারির যুদ্ধে জয়ী হয়ে সিরাজ ব্যর্থ করে দিলেন মিরজাফরের প্রথম ষড়যন্ত্র।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে বিজয়ী সিরাজের জীবনে সবচেয়ে মহিমময়। ফিরিঙ্গিরা পলাতক, প্রতিদ্বন্দ্বী সওকত পরাজিত ও নিহত, বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের থোঁতা মুখ ভোঁতা—সিরাজদ্দৌলা হচ্ছেন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার একাধিপতি।